মোস্লেম বিক্রম

ও

বাঙ্গালায় মোসলমান রাজত্ব

"বঙ্গীয় মোস্লেম মহিলা সঙ্ঘের" প্রেসিডেন্ট, "স্বপ্নদৃষ্টা"
"আত্মদান" "জান্‌কী বাঈ" প্রণেত্রী

নূরন্নেছা খাতুন

(বিদ্যাবিনোদিনী সাহিত্য-সরস্বতী)

সঙ্কলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশক—
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
'মোহাম্মদী প্রেস'
৯১নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
মোহাম্মদী প্রেস
৯১নং আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

নূরন্নেছা খাতুন

পূর্ব্বাভাষ

প্রেরিত মহাপুরুষের (দঃ) ধর্ম্ম সিংহাসনাধিকারী হজরৎ আবু বাকার সিদ্দিকের (রঃ) এস্লাম-রাজ্য প্রাপ্তি, হিজরী ১১ সাল ৬৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গালার শেষ নওয়াব দুর্ভাগা সেরাজের শোকার্হ অবসান ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার বৈকাল দুইটা পর্য্যন্ত, আমার এই জাতীয় বীরত্বের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার প্রধান সহায় হইতেছেন—আমার স্বামী।

মুন্সীগঞ্জে (বিক্রমপুর) সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনে আমার 'বঙ্গ-সাহিত্যে মোসলমান' প্রবন্ধ পাঠের পর, স্বামীর কয়েকজন বন্ধু আমার দ্বারা একখানি মোস্লেম বাঙ্গালার ও এস্লামের জাতীয় ইতিবৃত্ত লিখাইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করায়, তিনি বহু পরিশ্রমে এবং বহুতর দুষ্প্রাপ্য পুরাতন পুস্তক ও ইতিহাস হইতে মাল-মস্লা সংগ্রহ করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামীর বহু পরিশ্রমে বাঁধিয়া দেওয়া কাঠামের উপর আমি কাদা মাটি লেপিয়া এই প্রতিমাখানি খাড়া করিয়াছি মাত্র। "মোস্লেম বিক্রম", এক মেটে করা প্রতিমা। ইহাতে পটোর সাহায্যে রং ফলান হয় নাই, বা তাহার কোন দরকারও নাই। ইহা খাঁটি একখানি পাথরের একটী ক্ষুদ্র শালগ্রাম মাত্র স্বাভাবিক রংই ইহার রং,

স্বাভাবিক মূর্ত্তিই ইহার মূর্ত্তি। মোট কথা কোন কাল্পনিক রংয়ে রঞ্জিত ক'রে ইহাকে উপন্যাস আকারে গ'ড়ে তোলা হয় নাই। ইহা যে খাঁটি জিনিস সেই খাঁটিই আছে। যদি কোন স্থানে ইহার কোনরূপ সামান্য রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, তাহার একমাত্র কারণ আমার নিজের অক্ষমতা।

আমার এই "মোস্‌লেম বিক্রম" প্রকৃতপক্ষে এস্‌লামের জাতীয় ইতিহাস নহে। আমার কর্ম্মপঙ্গু স্বজাতীয় বাঙ্গালী মোসল্‌মানগণের ধর্ম্মপ্রাণ স্বধর্ম্মাবলম্বী বা পূর্ব্ব-পুরুষগণ, ধর্ম্মোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া কিরূপ অসম সাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন ও ধর্ম্মার্থে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে তাঁহারা স্বীয় নশ্বর জীবনকে কিরূপ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া মোক্ষলাভ উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরওয়ানার (পতঙ্গ) ন্যায় ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলেন; পবিত্র ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার নাম লইয়া, তাঁহারা কিরূপ অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন; তাহারই বাস্তব চিত্র এই পুস্তকে কিঞ্চিৎ দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছি মাত্র।

অতীতের স্মৃতি একপক্ষে যেমন মধুর, অপরদিকে তদ্রূপ শক্তি ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়া ও তৎসঙ্গে জাতীয় জীবনের জড়তা দূর করিয়া, তাহার স্থানে প্রাণে নবভাব উদিত ও বর্ত্তমান কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত করিয়া, মানবকে ভবিষ্যৎ গৌরবের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যদি আমার এই জীবন্মৃত জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে হয়, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের কার্য্যগুলিকেই মূল সাধনার বস্তু বলিয়া, তাহাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। তজ্জন্য অতীতের সেই সমস্ত রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনাবলীর মধ্যে কয়েকটী উজ্জ্বল চিত্র তাহাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া, তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ব্বাবস্থা জানাইয়া দেওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইতিহাস বলিতে কেবল রাজ বংশের কাহিনী ও তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর সমষ্টি বুঝায় না। ইতিহাসের অর্থ ইহা

অপেক্ষা খুব ব্যাপক। প্রধাণতঃ ইতিহাসে মানব সভ্যতার ক্রম বিবর্ত্তনের বিবরণ থাকাই চাই। তা' সেটা আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে নাই বলিলেই হয়; এবং সেই জন্যই আমি ইহাকে ইতিহাস বলিতে কুণ্ঠিতা। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে আমার জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশের সামান্য একটু বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

আমার আর এক প্রধান উদ্দেশ্য—বাঙ্গালার বহুতর লেখকেরা, এমন কি প্রবীন প্রবীন নামজাদা গ্রন্থকারগণ পর্য্যন্ত, বাঙ্গালায় তথা সমস্ত ভারতে মোসলেমগণের এই মহা বীরত্বের বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকা সত্বেও, কেবল ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া কতকগুলি কাল্পনিক ঘটনা উল্লেখে, এই বীরের জাতিটাকে একেবারে নির্জ্জীব প্রতিপন্ন করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। "মোস্‌লেম বিক্রম' পাঠে আমার স্বজাতীয় নর-নারীগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে—তাঁহাদের প্রতিবাসী, পুরুষানুক্রমে যুদ্ধাতঙ্ক রোগাগ্রস্থ আজন্ম-ভীরু মসিজীবী বাঙ্গালী হিন্দুগণ, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বা স্বজাতীয় অসিজীবী মহাপরাক্রান্ত বীর মোসলেম সন্তানগণকে, অলীক কল্পনা প্রসূত ঘটনা উল্লেখে যে কামুক, দুর্ব্বল বা কাপুরুষ বর্ণনায় ঐতিহাসিক নামের আবরণে নানা গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ ঈর্ষামুলক, ভিত্তিহীন, এবং তাহাদের স্বভাব-সুলভ মিথ্যা প্রলাপ উক্তি মাত্র।

তাঁহারা লিখিবার সময় ভাবেন না যে—যাহা সত্য তাহা কি কেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারে! মিথ্যার উপর কোন জাতি নিজের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি গড়িতে পারে নাই, হিন্দু-মোসলমান কেহ পারিবেও না। সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহাকে বরণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ যাঁহারা দেশের ও সৎসাহিত্যের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া নিজেদের মনে করেন ও পরিচয় দেন, তাঁহাদিগকে এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বরং

অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে ; আর সর্ব্বদাই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে—যাহা সুপরিচিত সত্য তাহার সহিত তাঁহাদের কল্পনার যেন কোন বিরোধ না ঘটে।

ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত তুচ্ছ করিয়া, আমি আমার এই ঐতিহাসিক সত্যের ক্ষুদ্র তরণীখানি, নির্ভয়ে সত্যের বিজয় পতাকা হস্তে, সাহিত্য সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলাম। জানিনা এই দুস্তর বারিধিমাঝে ইহার স্থান কোথায়!

১৯২৬ ফেব্রুয়ারী
নূরকুটীর, শ্রীরামপুর

নূরন্নেছা

প্রাণাধিক সহোদর,

খোন্দকার রকিব-অস্-সোল্‌তান

স্নেহের ভাই রকিব !

“জানকী বাঈ”য়ের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া, তুমি আমাকে মোসল্‌মান যুগের ইতিহাস লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলে। আমি তদুত্তরে বলিয়াছিলাম—“ইতিহাস শুধু ফুল্ল-কুসুম-সম্ভার নহে। ইতিহাসের গর্ভে অনেক অপ্রিয় সত্য রহিয়াছে; বর্ত্তমান উপন্যাস প্রিয় বঙ্গবাসী যে ঐ নীরস ঐতিহাসিক কাহিনী পাঠ করিবেন, সে আশা সুদূর-পরাহত। বিশেষতঃ সেই অতীতের অমূল্য উপাদান সংগ্রহ করাও আমার সাধ্যাতীত।”

আমার এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে তোমার চির প্রফুল্ল মুখখানি অভিমানের ছায়ায় আবৃত হইতে দেখিয়াছিলাম।

তৎপরে তুমি যখন বি, এ পরীক্ষা দিয়া, তখনও পর্য্যন্ত কাণের বেদনায় কাতর অবস্থায় আমাদের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তখন তোমার দাদা-ভাই ও আমি এই ঐতিহাসিক পুস্তকখানি আরম্ভ করিব কিনা ইতস্ততঃ করিতেছিলাম; তুমি ঠিক সময় এসেই আমাকে উৎসাহিত ক’রেছিলে। আমিও সেই সময় তোমাকে ব’লে ছিলাম যে—যদি তুমি মাতৃ ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও, তাহা হইলে আমি যে-কোন প্রকারে পারি তোমার কথা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। তার পর তুমি বি, এল, এর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় শেষ-পরীক্ষা

দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ দেখিয়া, আমার প্রাণে অপার আনন্দের উদ্রেক হইল।

আবার দেখিলাম, আমার দুখিনীর ধন "আত্মদান", আমাদের মাতৃ নৈবেদ্য বলিয়াই হউক, অথবা উহাতে আমাদের মর্ম্ম কথার আভাষ আছে বলিয়াই হউক, বইখানি তুমি যেন পছন্দ করেছ।

এক্ষণে আমার জীবন সংগ্রাম যাঁহার সেনাপতিত্বে পরিচালিত, এবং যাঁহার আশ্রয়ে বসিয়া আমি আত্ম-কৌতুহল চরিতার্থ করিতেছি; তিনি আমার কৌতুহলের অনুবর্ত্তী হইয়া, বিশেষতঃ তোমার প্রতি আপন স্বভাব সুলভ স্নেহ প্রযুক্ত অশেষ পরিশ্রম করিয়া, নানারূপ ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে যে সকল অমূল্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আমি সাধ্যানুসারে সজ্জিত করিয়াছি। জানি না ইহা জনসাধারণের প্রীতির চক্ষে পড়িবে কিনা!

ভাই, তোমারই ইচ্ছায় যখন লিখিয়াছি, তখন ইহাকে আর কাহার হাতে দিব? আমার স্নেহাশীষের সঙ্গে আমার "মোস্‌লেম বিক্রম" ও আমার জন্মভূমি বাঙ্গালায় আমার স্বজাতীয় নওয়াবগণের শাসননীতি ও কার্য্য কলাপের ইতিহাস; তোমারই হাতে দিলাম। ইতি—

নূরকুটীর,
শ্রীরামপুর, হুগলী

হিতাকাঙ্খিণী
তোমার সেজ বুবু
রাণী

মোস্‌লেম বিক্রম

ও

বাঙ্গালায় মোসলমান রাজত্ব

প্রথম খণ্ড

প্রথম সর্গ

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষসিংহ আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সত্য সনাতন ধর্ম্মপ্রচারক পবিত্র-আত্মা মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার অনুগামী ও শিষ্যমণ্ডলী (মহাজেরীণ, আন্‌সার ও তাবেঈন) সমস্ত আত্ম-বিষাদ মিটাইয়া লইয়া, পবিত্র ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হইয়া জগদীশ্বরের সত্য ধর্ম্ম প্রচারে ও তৎসহ দেশ জয়ে মনোসংযোগ করিলেন।

এই প্রকারে বিংশতি বৎসর কাল মধ্যে তাঁহারা সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন মিশর ও পারস্য দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। পারস্য বিজয় তাঁহাদের আরও পূর্ব্বাংশে রাজ্য বিস্তারের ভূমিকা মাত্র। কাজেই অল্পকাল মধ্যে তাঁহাদের শ্যেণদৃষ্টি এই ধনরত্নশালী জড়পুজক ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইল।

প্রতীচ্যে এই সময়ে মোসল্‌মানগণ যে সমস্ত মহাকীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার উল্লেখ না করিয়া, কেবল স্থানে স্থানে সামান্য একটু আভাস মাত্র দিয়া, আমাদের এই প্রাচ্য দেশে ও তৎসঙ্গে বাঙ্গালার মোস্‌লেমের কার্য্য কলাপ ও শৌর্য্য বীর্য্য লিপিবদ্ধ করিব।

প্রেরিত পুরুষের মৃত্যুর পর প্রথম খলিফা হজরত আবু বাকার সিদ্দীক মাত্র আড়াই বৎসর ৬৩২ খৃঃ হইতে ৬৩৪ খৃঃ হিঃ ১১ হইতে হিজরী ১৩ সাল পর্য্যন্ত রাজরাজেশ্বর পদে অভিষিক্ত ছিলেন। গ্রীক-সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সহিত ও পারস্য দেশের প্রান্তে, আরব বীর আবুওবাদা ও মহাবীর খালেদ কয়েকটী যুদ্ধ করিয়া মোস্‌লেম তরবারির বল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রথম খলিফার খেলাফতের শেষ ভাগে প্রসিদ্ধ দামেস্ক নগর খৃষ্টানগণের হস্ত হইতে মোসলমানগণের করতলগত হয়।

হজরত আবু বাকারের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর-বেন খাত্তাব হিঃ ২৩ খৃঃ ৬৪৩ পর্য্যন্ত নয় বৎসর মদীনার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ১৫ হিজরীর শেষ ভাগে উমান হইতে একদল আরব সেনা হিন্দুস্থানের সমুদ্রতীর আক্রমণের জন্য প্রেরিত হয়, এবং তাহারা বোম্বাই উপকূলে টানা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।

এই সৈন্যদলকে উমানের শাসনকর্ত্তা ওসমান-বেন সাকিফি, খলিফার অনুমতি না লইয়া ভারত উপকূলে পাঠাইয়া দেওয়ায়, খলিফা ওমর সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

অপর দিকে বাহ্‌রানের শাসনকর্ত্তা হাকাম স্বীয় ভ্রাতা আবুল আসির অধীনে দেবাল (আধুনিক করাচি) উপসাগরে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তাহারা অনায়াসে বিপক্ষগণকে পরাজিত করিয়া উপকূল অধিকার করিয়াছিল।

এই ঘটনার অল্পদিন পরে আবু-মুসা-আশরী ইরাকের (বসরা বিভাগ) শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতি রাবি-বেন-জেয়াদ হারিসীকে ভারত উপকূলে মাকরাণ ও কেরমানে পাঠাইয়া দেন। এই সময় আবু-মুসা, মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের রাজধানী মদীনা হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও ভারতে প্রবেশ পথের সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া মহামান্য খলিফাকে অবগত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

সেই সময় সমুদ্র যাত্রার উপযোগী অর্ণবযানের ব্যবস্থা না থাকায়, খলিফা ওমর জলপথে যুদ্ধ যাত্রার বিরোধী ছিলেন। ইহার প্রধান হেতু তাঁহার সেনাপতি আম্‌রু-বেন্‌-আসির মিশর জয়ের পর, খলিফা উক্ত সেনাধ্যক্ষকে ভূমধ্য সাগরের বিবরণ লিখিতে বলেন। ফলে সেই সময় সাগর উত্তাল তরঙ্গময় থাকায়, সেনাপতি আম্‌রু, সমুদ্রের ভয়াবহ বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। এই কারণেই খলিফা ওমরের সমুদ্র যাত্রার উপর বৈরী ভাব।

খলিফা মোয়াবিয়ার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে মোসল্‌মানগণ কর্ত্তৃক আর কোন জলযুদ্ধের বিশেষ আয়োজন হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে নানা বাধা বিঘ্ন ও নিষেধ উপেক্ষা করিয়াও, আরব দেশীয় নাবিকগণ ভারত মহাসাগরে যেরূপ কীর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ভূমধ্য সাগরে এই বীর মরু-সন্তানগণ সেইরূপ জলযুদ্ধে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিবার অবসর পাইলে, তৎকালে চতুর্দ্দিকে আজন্ম সাগর বেষ্টিত হইয়া থাকা নিবন্ধন গ্রীস দেশীয় নৌ-সেনাগণের বিচক্ষণতার নিকট তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিতে হইত না। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ খণ্ডের মানচিত্রেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত।

দ্বাবিংশতি হিজরিতে আবদুল্লা-বেন-ওমর, কেরমান আক্রমণ করিয়া রাজধানী কুয়াশির অধিকার করেন। তৎপরে তিনি সিস্‌তানে

করিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তাকে তাঁহার নিজ রাজধানী মধ্যে অবরোধ করিলেন।

শাসনকর্ত্তা সন্ধির প্রার্থনা করায়, আবদুল্লা তাঁহাকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, তথা হইতে চলিয়া আসিয়া আরব সাগরের ভারত উপকূলে মাক্‌রান নগর আক্রমণ করেন। মাক্‌রান অধিপতি সিন্ধু দেশের রাজার সাহায্য গ্রহণ করিলেন; কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ মরুবীরগণের তরবারির সম্মুখে এই মিলিত সৈন্য অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। অতঃপর আবদুল্লা, খলিফার নিকট সিন্ধু নদ পার হইয়া সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করিবার অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। খলিফা ওমর, তাঁহার রাজনৈতিক সতর্কতার বশবর্ত্তী হইয়া উত্তর সীমান্ত দেশ ও পশ্চিম ভূখণ্ডের ন্যায়, দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদেশও সেনাধ্যক্ষকে দুঃসাহস প্রদর্শন করিতে বাধা দিয়াছিলেন।

এই বৎসরেই আবদুল্লা-বেন উমান, কের্‌মানের অভ্যন্তর দিয়া অগ্রসর হইয়া মাক্‌রান অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে মাক্‌রান ও সিন্ধের জাম্‌বিল উপাধিধারী রাজা নিহত হইয়াছিল।

হিঃ ২৩ সালে পারস্যের প্রসিদ্ধ নগর সিরাজ, অরাবগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে ৭০ বৎসরের মধ্যে আরবেরা ঐ নগরের সেরূপ কোন সংস্কার করেন নাই।

দ্বিতীয় খলিফা ওমরের রাজত্বকালে মোস্‌লেম বীরগণ আরবের মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া, বীরদর্পে আফ্রিকা খণ্ডে প্রবেশ পূর্ব্বক মিশর দেশ জয় করিয়া, নীল নদীর তীরবর্ত্তী উর্ব্বর ভূখণ্ড ও ফেরাউনের বহু পুরাতন সমাধিক্ষেত্র পিরামিড্‌গুলির পাদদেশ পর্য্যন্ত অধিকারভুক্ত করিলেন। তাঁহারা এই সময় পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীর ইউনানেশ্বর মহামতি সেকেন্দারের মনোহর বন্দর, তৎকালীন গ্রীকরাজ হেরাক্লিয়াসের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র আলেকজেন্দ্রিয়া অজস্র রক্তদানে অধিকার ভুক্ত করিয়া, দুর্গোপরি

এস্‌লামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিলেন। সেনাপতি আমর-বেন-আল্‌ আস্‌ মিশর জয়ে যে অসম সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে ও তাঁহার এস্‌কেন্দারে সানি (দ্বিতীয় আলেক্‌জাণ্ডার) নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছে। এই আল-এস্‌-কেন্দারিয়া বিজয়ের সংবাদ পাইয়া গ্রীক সম্রাট হেরাক্লিয়াস কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, তাঁহার অন্তিম শয্যা গ্রহণ করেন।

হজরত ওমরের শোচনীয় মৃত্যুর পর, তৃতীয় খলিফা হজরত ওস্‌মান বেন-আফ্‌ফান হিজরী ২৩ সাল ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে মদীনার পবিত্র সিংহাসনারূঢ় হইয়া হিজরী ৩৫ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

হজরত ওস্‌মানের খেলাফতের প্রারম্ভে সেনাপতি ওস্‌মান-বেন-আবুল-আসি, ফারেস্‌ জয় করিতে গিয়া ইসতাখারের নিকট বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে হিঃ ২৬ সালে তিনি বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া কাজরুণ অধিকার করিয়া, ইস্‌তাখার নগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী কেলায় সোফেদ (শ্বেত দুর্গ) দখল করিলেন। কিন্তু হিঃ ২৮ সালের পূর্ব্বে সমস্ত প্রদেশটী সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিতে সক্ষম হন নাই।

দুই বৎসর পরে হিঃ ৩০ সালে ইস্‌তাখার নগরে এক ভয়ানক রাজদ্রোহ উপস্থিত হয়। তাহার ফলে তথাকার মোসলমান শাসন কর্ত্তাকে প্রজাবর্গের কোপে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। এই সময়ে পারস্যের পলায়িত রাজা ইয়াজ্‌দিজিরদ্‌ ইস্তাখারে প্রবেশ করিয়া নিজ দুর্ভাগ্য অপনোদনের চেষ্টা করেন; কিন্তু আবদুল্লা-বেন-ওমার ও ওস্‌-মানের নিকট জঘন্য ভাবে পরাভূত হইয়া ও অধিনস্থ সমুদয় সৈন্য ক্ষয় করিয়া, প্রথমতঃ কের্‌মানের দিকে, পরে তথা হইতে সিজিস্তান ও খোরাসানের দিকে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন।

এইরূপে ইস্তাখারের নগর [দুর্গ পুনরায় আরবগণের হস্তগত

হওয়ায়], তন্মধ্যে আশ্রিত পারস্য দেশীয় বহু-পুরাতন ভদ্রবংশজাত অনেককে মরু-সেনাগণের কোপে পতিত হইয়া তাহাদের তরবারির মুখে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী বৎসরে বস্‌রার শাসনকর্ত্তা আবদুল্লা-বেন-ওমার, খলিফার অনুমতি লইয়া সাহ ইয়াজ্‌দিজির্দ্দকে খোরাসান নগর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যান। এই সময়ের মধ্যে কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণাংশ মোসল-মানগণ সম্পূর্ণরূপে জয় ও করায়ত্ত করিতে না পারায়, তাহাদিগকে ফারেস্‌ ও কের্‌মানের পার্শ্ব দিয়া মরুভূমি পার হইয়া যাইতে হইয়াছিল। এই অভিযানে আরব সেনাগণের অগ্রসর হইবার পথে সেনানী মুজা-শিয়কে এক সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া কের্‌মানের বিদ্রোহ দমন করিয়া তৎপরে রাবি-বেন-জিয়াদ হারিসীর সেনাগণের সহিত মিলিত হইতে হইয়াছিল। তৎপরে উভয় সেনা মিলিত হইয়া সিজিস্তান প্রদেশ আক্রমণ করেন ও ঐ প্রদেশের রাজধানী জারান্‌জ অধিকার করিলেন।

আবদুল্লা-বেন-ওমর স্বয়ং তাব্বাসের অধিপতিকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া কোহেস্তান প্রদেশে প্রবেশ করেন। তথায় তাঁহাকে প্রবল বাধা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। শেষে আহ্‌নাফ-বেন-কায়েসের সাহায্য পাইয়া তিনি ক্রমান্বয়ে হিরাত, সারাখ্‌স, তেলিকান্‌, বাল্‌খ্‌, তুখারিস্তান এবং নেশাপুর অধিকার করিয়া সমস্ত খোরাসান প্রদেশ আয়ত্তাধীন করিলেন।

খলিফা আবু-জফর-অল-মনসুরের খেলাফতের অর্থাৎ হিঃ ১৪৮ সাল ৭৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, বাগ্‌দাদ নগর খলিফাদিগের রাজধানী না হইলেও খলিফা হজরত ওস্‌মানের সময় বাগ্‌দাদ একটী প্রসিদ্ধ নগর ছিল। এই সময় এই নগর হইতে কয়েকবার পূর্ব্বাঞ্চল, আরবগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল।

প্রথম তিনজন খলিফা মদীনাতেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে খলিফা হজরত আলী হিঃ ৩৬ সালে কুফা নগরে খেলাফৎ স্থাপন করেন। হিঃ ৪১ সালে উম্মায়দিজ বংশীয় খলিফাগণ কুফা হইতে খেলাফতের স্থান দামেস্ক নগরে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ও হিঃ ১৩২ সাল পর্য্যন্ত দামেস্ক নগরই খলিফাগণের রাজধানী ছিল। মধ্যে আবুল আব্বাস্ কিছু দিনের জন্য ফোরাত নদী তীরে আম্বার নগরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফা আল-মনসুর অত্যল্প দিনের জন্য নিকটবর্ত্তী হাশেমিয়া নগর রাজধানীতে পরিণত করিয়া পরে স্থায়ী ভাবে বাগদাদে, আসিয়া বসিলেন। এই বাগদাদ হিঃ ৬৫৬ সাল ১২৫৮ খৃঃ পর্য্যন্ত মোসলেম বাদ্সাহগণের রাজধানী ছিল।

পুরাতন ব্যাবিলোনিয়া প্রদেশের মধ্যে কুফা ও বসরা এই দুই স্থানে প্রধান মোস্লেম সেনা-নিবাস সংস্থাপিত হয়। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ক্যান্টনমেণ্টটী, ইরাণের রাজন্যবর্গের পারস্য উপসাগর দিয়া জল পথে ভারতবর্ষে পলায়ন পথে বাধা প্রদানার্থেই স্থাপিত হয়।

হজরত ওস্মানের বিস্তৃত রাজ্যের মধ্যে সিরিয়া প্রদেশ, উম্মায়দিজ বংশের আবু-সুফিয়ান পুত্র মোয়াবিয়ার শাসনাধীনে ছিল। ওস্মানের এই সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা খৃষ্টান নরপতিগণকে জলে ও স্থলে সর্ব্বত্র বিব্রত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই তৃতীয় খলিফার রাজত্বের শেষ ভাগে ৬৫৩।৬৫৪ খৃষ্টাব্দে, সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক নগর হইতে প্রেরিত আরব বীরগণ ভূমধ্যসাগর বক্ষের সাইপ্রাস, মাল্টা ও ক্রীট দ্বীপ, এবং পরে রোডস্ দ্বীপ অধিকার করিয়া উক্ত দ্বীপের বহু পুরাতন, জগতের অত্যাশ্চার্য্য দ্রব্য সকলের মধ্যে অন্যতম, তাম্র নির্ম্মিত অতি প্রকাণ্ডকায় দেবমূর্ত্তি কলোশাস্-অফ-রোডস্ ভগ্ন করিয়াছিলেন।

শেষ জীবনে অশীতিপর বৃদ্ধ খলিফা হজরত ওস্‌মান, আরবগণের শ্রদ্ধা ভালবাসা হারাইয়া শেষে তাহাদের অসন্তোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইলেন ও নিরক্ষর উত্তেজিত আরব সন্তানগণের অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইল।

চতুর্থ খলিফা হজরত আলী হিঃ ৩৫ সালে ৬৫৫ খৃঃ মদীনার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তথা হইতে কুফায় রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলেন। প্রেরিত মহাপুরুষের জামাতা এই চতুর্থ খলিফা মাত্র ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তাঁহার খেলাফতের প্রারম্ভে তিনি তাবার-বেন-দায়েরের অধীনে নিজ রাজ্য প্রান্তে হিন্দুস্থানের সীমায়, বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় দলপতি সম্বলিত একদল উৎকৃষ্ট সেনা রক্ষা করিয়াছিলেন। হিঃ ৩৮ সালের শেষ ভাগে ঐ সমস্ত সৈন্য বাহ্‌রাজ ও কোহ্‌পায়া গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া ভারত সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক, কায়কান ও কায়কানান (আধুনিক সোলেমান পর্ব্বত) পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্য্যন্ত পৌছিয়া ছিলেন।

এই গিরি পথের প্রবেশ দ্বারে মোস্‌লেম সৈন্যগণ অন্যূন বিংশতি সহস্র হিন্দু যোদ্ধা কর্ত্তৃক দৃঢ় প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে এই ধর্ম্মোন্মত্ত মরু বীরগণের গগন-ভেদী "আল্লাহ-আকবর" ধ্বনি, উভয় পার্শ্বের পর্ব্বত মালায় প্রতিধ্বনিত হইয়া হিন্দু সেনাগণের কর্ণরন্ধ্রে সুতীক্ষ্ণ শরের ন্যায় প্রবেশ করায়, তাহারা ভয়ে রণে ভঙ্গ দিল। ভারতীয় সেনাগণের মধ্যে অনেকেই মোস্‌লেম যোদ্ধবর্গের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

অদ্যাবধি এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে—প্রত্যেক বৎসর ঠিক ঐ সময় চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতমালা হইতে স্পষ্ট "আল্লাহ আকবর" ধ্বনি

শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে হারেস্-বেন-মায়্বা অদ্ভূত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন—(ফতুহল্ বোলদান)।

যুদ্ধ জয়ের পর বিজেতা সৈন্যগণ তথায় সুবন্দোবস্ত করিতে থাকাকালে, হঠাৎ তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে—খলিফা হজরত আলীকে মোয়াবিয়ার দলস্থ খারেজি সম্প্রাদায়ের লোকে, কূফার মস্জিদের মধ্যে ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত থাকা কালে গুরুতর রূপে আহত করায়, তৃতীয় দিবসে খলিফার আত্মা স্বর্গারোহণ করিয়াছে। এই সংবাদে ম্রিয়মান হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ আরব সেনাগণ, প্রত্যাবর্ত্তন কালে মাক্রাণে ফিরিয়া আসিয়া অবগত হইলেন যে—আবু সুফিয়ান পুত্র মোয়াবিয়া খলিফা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন।

এই চতুর্থ খলিফা হজরত আলি মুর্ত্তজা (ঈশ্বর প্রিয়) তাঁহার সময়ে বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। হজরত রসুল-খোদা, তাঁহার এই প্রিয় জামাতাকে "বিদ্যা মন্দিরের দ্বার" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। • এই চারিজন খলিফাই "খোলাফায়ে রাশেদীন" নামে অভিহিত। তৎপর হইতে খলিফাগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ভোগ-বিলাস-প্রিয় রাজা ধিরাজ মাত্র ছিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ

উমায়্যিদ বংশ

মোয়াবিয়া।

খলিফা হজরৎ আলীর নিধন প্রাপ্তির পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান্ এই অশান্তিময় খেলাফতের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহা হইতে হাত গুটাইয়া লইলেন। দামেস্কের শাসনকর্ত্তা মোয়াবিয়া হিঃ ৪১ সালে ৬৬১ খৃষ্টাব্দে আপনাকে মোসলমানগণের খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি হিঃ ৬০ সাল ৬৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দামেস্কের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার পর খেলাফতের প্রথাবস্থায় হিঃ ৪২ সালে সেনাপতি আবদুর রহমান সিন্ধুদেশের কিয়দংশ জয় করেন। অচিরে তাঁহার অধিনস্থ সেনানী মুহাল্লাব, আরব সৈন্য সমভিব্যাহারে কাবুলের সীমান্ত প্রদেশে গিয়া সৈন্য সমাবেশ করেন।

হিঃ ৪৬ সালে আবদুল্লা-বেন সাওয়ার কায়কান (খোরাসানের দিকে সিন্ধুদেশের কিয়দ্দংশ) দেশ অধিকার করিয়া, দামেস্ক নগরে গিয়া খলিফা মোয়াবিয়াকে অনেক উপঢৌন প্রদান করেন! পরে কিছুদিন রাজধানীতে অবস্থান করিয়া পুনরায় কায়কানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও তথাকার অধিবাসী দুর্দ্ধর্ষ তুর্কদিগের সমবেত শক্তির নিকটে পরাভূত ও নিহত হইলেন।

এই সংবাদ পাইয়া খলিফা মোয়াবিয়া চারি সহস্র অশ্বারোহীসহ অবদুল্লা-বেন্-সওয়ারিয়াকে কায়কানে প্রেরণ করিয়া, তাঁহাকে ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেনএবং কায়কানান পর্ব্বতের উৎকৃষ্ট অশ্ব সংগ্রহ

করিবার অনুমতি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লার সাহায্যার্থে ওমর-বেন-আবদুল্লাও প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা এই পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করিবার পর তথাকার অধিবাসী যুদ্ধপ্রিয় তুর্কগণ, তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল ও প্রবেশ দ্বার গিরিবর্ত্ম সকল বন্ধ করিয়া প্রায় সমস্ত মোস্লেম সেনা বিনাশ করিল। আরব সেনা গণের মধ্যে মাত্র কয়েকজন এই দুর্ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য মাক্‌রাণে ফিরিয়া যাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

আবদুল্লার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য সিনান-বেন-সল্‌মা তাঁহার অনুগামী হইলেন। মোয়াবিয়া এবার এই সঙ্গে এরাকের প্রবল প্রতাপশালী শাসনকর্ত্তা জেইয়াদ্‌কে (যিনি সেই সময় কুফা ও বস্‌রা হইতে উমান, সিজিস্তান ও খোরাসান রাজ্যগুলির উপরও শাসনকর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন) হিন্দুস্থান আক্রমণের উপযুক্ত একজন যোদ্ধা মনোনীত করিতে উপদেশ প্রেরণ করেন।

অল্পদিন মধ্যে জেইয়াদের প্রেরিত আহ নাফ-কায়েস্ যাইয়া সিনানকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন ও দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এবার জেইয়াদ-বেন্‌-আবু সুফিয়ান স্বয়ং মাক্‌রাণে যাইয়া তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সেনাপতি রশিদ-বেন্‌-আম্‌রু, আল্‌-মানজার-বেন্ জারুদ প্রভৃতিকে সিউস্তান, মান্দার, বাহরাজ, লুকান ও কুস্‌দার প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করায়, তাঁহারা বিস্তর ধন-রত্ন সংগ্রহ করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোককে বন্দিনী করিয়া রাজধানীতে পাঠাইয়া দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আল্ মানজার-বেন্ জারুদ লুকান, কুয়কান ও কুস্‌দার অধিকার করিয়া শেষোক্ত স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিবার পর তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল।

মোয়াবিয়ার রাজত্বকালে মধ্যআফ্রিকা বিজয়ী সেনাপতি আবদুল্লা-বেন্‌-সায়াদের পর মহাবীর ওক্‌বা তাঁহার স্থান অধিকার করেন। এই মহা সেনাপতি ওক্‌বা উত্তর আফ্রিকার সমস্ত ভূখণ্ডে এস্‌লামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। তিনিই আধুনিক মিশরের রাজধানী আল্‌-কাহেরা (কাইরো) নগর নির্ম্মাণ করেন। পরে পশ্চিমাভিমুখে দেশ জয় করিতে করিতে গিয়া, আল্‌জিরিয়া ও মরক্কো জয়ের পর আট্‌লান্টিক মহাসমুদ্রের তীরে পৌছিয়াও যেন বীর কেশরীর দেশ জয়ের আশা পরিতৃপ্ত হইল না। তখন সমুদ্রের তরঙ্গমালা বিধৌত বেলা মিরভু উপর অশ্ব প্রধাবিত করিয়া, মহাবীর ওক্‌বা আর অগ্রসর হইবার উপায় না দেখিয়া ঈশ্বর উদ্দেশ্যে, তাঁহারই সনাতন ধর্ম্ম আরও দূর দূরান্তরে প্রচার করিবার বাধাপ্রাপ্তিজনক দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

মোয়াবিয়ার পুত্র ঘৃণিত এজিদ হিঃ ৬০ হইতে হিঃ ৬৪ পর্য্যন্ত দামেস্কের সিংহাসন কলঙ্কিত করিয়াছিল।

এজিদের রাজত্বকালে কুফা ও বস্‌রার শাসনকর্ত্তা ওবেয়দুল্লা-বেন জায়ে জনৈক আল্‌মন্‌জির-বেন-হারুকে ভারত সীমান্তে শাসনকর্ত্তা মনোনীত করেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে বুরানী সীমান্তে জ্বর রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আল্‌মন্‌জীরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হাক্কাম, কেরমান হইতে বস্‌রায় ওবেয়দুল্লা-বেন্‌-জায়েদের নিকট গিয়া তাঁহার স্মরণাপন্ন হওয়ায়, শাসনকর্ত্তা হাক্কামকেই তাঁহার পিতৃ সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

এই সময় ওবেয়দুল্লাহ ভারত সীমা রক্ষার্থে জনৈক সাহসী বীর হারির-অল্‌-বাহালিকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বরণ করায়, তিনি কয়েকটী সীমান্ত খণ্ডযুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

-১ এই সেই এজিদ, এই পাপাত্মার খেলাফতের প্রথম বৎসেই হিঃ ৬১

খৃঃ ৬৮০ সালের মোহাররম মাসে কারবালার প্রান্তরে যে ভীষণ কাণ্ড হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে বুকের রক্ত শুকাইয়া যায়, চক্ষে অশ্রুর স্রোত বহিয়া যায়। এই একষষ্টিতম হিজরির মোহাররম মাসের ১০ই তারিখে পাষণ্ড এজিদ, হজরৎ রসুলুল্লার বংশধরগণের উপর, হজরৎ শের-খোদা আলীর পুত্র পৌত্রগণের প্রতি, কি অমানুষিক ব্যবহার, কি নৃশংস অত্যাচারই করিয়াছিল। জগতের ইতিহাস দুর্বৃত্ত নরপিশাচ এজিদের এই পাশবিক ব্যবহার কষ্টের সহিত বক্ষে ধারণ করিয়া আছে ও প্রতি বৎসর মোহাররম মাসে উহা ধার্ম্মিকগণকে স্মরণ করাইয়া শোকে ম্রিয়মান করিতেছে।

এজিদের পর দ্বিতীয় মোয়াবিয়া কয়েকমাস দামেস্কের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে মারওয়ান হিঃ ৬৪ হইতে ৬৫ ও তৎপুত্র প্রসিদ্ধ খলিফা আবদুল মালেক হিঃ ৬৫ হইতে হিঃ ৮৬ অর্থাৎ ৭০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনারূঢ় ছিলেন।

হিঃ ৬৫ সালে আরববীরগণ সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া একবার রাজপুতানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই আক্রমণের ফলে আজমীরের রাজা মানিক রায় ও তাঁহার একমাত্র পুত্র যুদ্ধে নিহত হন।

খলিফা আবদুল মালেক সিংহাসনারূঢ় হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বৃহৎ সাম্রাজ্য ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহিরের সকল দেশ গুলিতেই বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জলিত। এই বিদ্রোহানল রাজ্যের পুর্ব্বাঞ্চলেই অধিকতর প্রশ্রয় পাইয়াছিল। মোখ্তার কুফা অধিকার করিয়া হজরত আলীর পুত্র এমাম হোসায়েনের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য চেষ্টিত। নাফি-বেন-আজ্রকের দল ফারেস, কেরমান এবং আহ্ওয়াজ্ দখল করিয়া বসিয়াছে। এই সঙ্গে খেলাফতের দাবিদার আবদুল্লা-বেন-

জোবায়ের আরবদেশ ও খোরাসান অধিকার করিয়া মকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন।

আবদুল মালেক তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষের মধ্যে এই সমস্ত শত্রুগণকে দমন করিয়া, মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র রাজাধিরাজ বলিয়া ঘোষিত হইলেন; এবং সাম্রাজ্য বৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন।

হিঃ ৬৭ সালে ওবায়দুল্লাহ-বেন-জেইয়াদ কুফা আক্রমণ করিলে মোখ্‌তার তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও নিহত করিল, এবং খলিফার সেনাগণকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

ইহার চারি বৎসর পরে খলিফা আবদুল মালেক কুফা নগরী মোখ্‌-তারের হস্তচ্যুত করিয়া লইলেন। এই সময়ে জনৈক আরববীর মোহাল্লাব কেরমানে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, তথা হইতে অগ্রসর হইতে হইতে ফারেস ও আহ্‌ওয়াজ হস্তগত করিলেন। এই মোহাল্লাব আবার কিছু-দিন পরেই খলিফার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

অপর দিকে হেজ্জাজ-বেন্‌-ইউসফের ভীষণ আক্রমণে মক্কাধিপ আবদুল্লা নিপতিত হইলেন ও মক্কা খোরাসান বিজেতা হেজ্জাজের করতলগত হইল। খলিফা আবদুল মালেক তাঁহার এই মহা তেজস্বী সেনাপতি হেজ্জাজের বীরত্ব ও প্রতিভা দর্শনে তাঁহাকে ইরাকের শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন।

হেজ্জাজ ইরাকের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সৈয়দ-বেন আস্‌লাম্‌কে মাকরাণে নিজ অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। সৈয়দের দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি তথাকার একজন উদ্ধত স্বভাব বীরপুরুষ হারেস্‌ পুত্র মাবিয়া-আল্লাফির বিষ দৃষ্টিতে পড়িলেন। এই মাবিয়া-আল্লাফির তরবারির তলে অচিরে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইল।

আল্লাফিকৃত এই হত্যা ব্যাপারের পরই হেজ্জাজ, আবদুর-রহমান-বেন-আসাব্‌কে আল্লাফির বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু চতুর আল্লাফি পথে তাঁহাকে হত্যা করিয়া, আর অনর্থক প্রবল পরাক্রমশালী হেজ্জাজের কোপাগ্নিতে পড়িয়া থাকা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া, সিন্ধু দেশে আসিয়া হিঃ ৮৫ সালে সিন্ধু-রাজ রায় দাহিরের সহিত মিলিত হইলেন। আল্লাফি, এমদাদ-উদ্দীন মোহাম্মদ-বেন-কাসেমের সিন্ধু আক্রমণ কাল পর্য্যন্ত রাজা দাহির রায়ের সঙ্গেই ছিলেন।

হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে ও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মহা সমৃদ্ধিশালী আলোর নগরী (আধুনিক খয়েরপুর ও রোরীর মধ্যবর্ত্তী স্থান) সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী ছিল। তৎকালীন এই সিন্ধুদেশ পূর্ব্বে কাশ্মীর সীমান্ত ও কনোজ, পশ্চিমে মাক্‌রাণ ও সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত, দক্ষিণে সমুদ্র তীর ও দেবাল (আধুনিক করাচি ও সৌরাষ্ট্র বন্দর) এবং উত্তরে কায়ুদান ও কায়কানান (আধুনিক সোলেমান পার্ব্বত্য প্রদেশীয় তুরান) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমস্ত ভূখণ্ড আবার চারিজন সামন্ত শাসনকর্ত্তার অধীনে চারি খণ্ডে বিভক্ত ছিল।

প্রথম—ব্রাহ্মানাবাদ (আধুনিক সিন্দ হায়দ্রাবাদ) সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রধান নগর শিউইস্তান, এই পর্ব্বতসঙ্কুল বিভাগ, রুঝান্‌ পার্ব্বত্য দেশ হইতে মাক্‌রাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয় অংশ তাল-ওয়ারী ও চাচ্‌পুর, ইহা বুদ্ধপুর পর্য্যন্ত স্থিত; এবং চতুর্থ মূলতান ইহা কাশ্মীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সাইহুম বা মেহরাণ তীরবর্ত্তী প্রকাণ্ড রাজধানী আলোর, তৎকালীন সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধিতে ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এবং যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই সময় প্রবল পরাক্রান্ত রায় দাহির এই সমগ্র ভূখণ্ডের রাজাধিরাজ ছিলেন।

দাহির তাঁহার রাজত্ব পর্য্যাবেক্ষণ কল্পে ও সর্ব্বত্র প্রজা-মণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত হইবার জন্য, কিছুকাল ব্রাহ্মানাবাদ অঞ্চলে থাকিয়া তথা হইতে শিউইস্তান গিয়াছিলেন। তৎপরে পিতার অর্দ্ধ সমাপ্ত দুর্গ রেওয়ার দেখিতে গিয়া তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিলেন।

এই সময় রমল দেশের রাজা, দাহিরের ধনরত্ন ও বহু পালিত হস্তীর পরিচয় পাইয়া, পরাক্রান্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রেওয়ার নগর যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হইল। ভীষণ যুদ্ধের পর রাজা দাহির যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। তৎপরে বিজয়ী সেনাগণ রেওয়ার হইতে রাজধানী আলোর নগরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকায়, দাহির হিঃ ৮৫ সালে আরবের অধিবাসী বানি-আসমৎ বংশীয় তেজস্বী যোদ্ধা মোহাম্মদ আল্লাফির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

অচিরে আবদুর-রহমান-বেন-আসার হন্তা মোহাম্মদ আল্লাফি, মাত্র পাঁশ শত মহা তেজস্বী মরু-সেনাসহ আসিয়া দাহির রায়ের সৈন্যগণের সহিত যোগ দিলেন, এবং হিন্দু সেনাগণের সহিত মিলিত হইয়া নিশাকালে রমলের অশীতি সহস্র সেনাগণকে ভীষণ রণোল্লাস ধ্বনির সহিত আক্রমণ করিলেন। আল্লাফির এই অকস্মাৎ অস্বাভাবিক নৈশ আক্রমণের বেগ রমলের প্রকাণ্ড বাহিনী সহ্য করিতে পারিল না। তাহার মধ্যে অধিকাংশ মোস্‌লেম তরবারির আঘাতে নিহত হইল। এবং অনেকে রাজা দাহিরের সেনাগণ কর্ত্তৃক বন্দি হইল। রমল রাজের ৫০টী যুদ্ধ হস্তী, অনেক অশ্ব ও বিস্তর যুদ্ধাস্ত্র বিজয়ী সেনাগণের হস্তগত হইল।

ধরিতে গেলে ইহাই ভারতে মোস্‌লেম বিজয়ের সূত্রপাত। (তওয়ারিখ হিন্দ-অ-সিন্ধ ও চাচ্‌ নামা)।

তৃতীয় সর্গ

খলিফা ওলিদ-বেন-আবদুল মালেক

খৃঃ ৭০৫ হইতে ৭১৫

হিঃ ৮৬ সালে এই মহা-পরাক্রমশালী খলিফা মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের সিংহাসন আলোকিত করেন। ওলিদের রাজত্বকালে আরব সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল।

ইরাকের শাসন কর্ত্তা হেজ্জাজ, সৈয়দ হন্তা আল্লাফি ভ্রাতাগণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য হিন্দুস্থানের সীমায় হারুণ পুত্র সেনাপতি মোহাম্মদকে নিযুক্ত করিলেন। যে কোন প্রকারেই হউক আল্লাফিদিগকে ধরিয়া পাঠাইতে হইবে, তাঁহার উপর হেজ্জাজের এই হুকুম থাকিল। অনেক পরিশ্রমের পর হিঃ ৮৬ সালে তিনি আল্লাফি ভ্রাতাগণের মধ্যে একজনকে বধ করিতে সমর্থ হইয়া, তাহার ছিন্ন মস্তক হেজ্জাজ দরবারে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

নিষ্ঠুর হেজ্জাজ সেই সময় ইরাকের শাসনকর্ত্তা হইলেও, তিনি পারস্য দেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেশজয় স্পৃহা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হওয়ায়, হেজ্জাজ পূর্ব্ব দিকে ক্রমশঃ রাজ্য বৃদ্ধি করিবার আশা মনোমধ্যে পোষণ করিতে লাগিলেন, এবং এই উদ্দেশ্যে কোতায়বার অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কোতায়বা প্রথমতঃ খাওয়ারজম্‌ অধিকার করিয়া তথা হইতে আক্‌সাস্‌ নদী পার হইয়া বুলিতে

গেলে এক প্রকার বিনা বাধায় মধ্য-এসিয়ার বোখারা, খোজান্দ শাশ্‌ সামারকন্দ প্রভৃতি তুর্কীস্থানের সমৃদ্ধিশালী জনপদগুলি ও তৎসহ সমস্ত ফরগণা প্রদেশ করায়ত্ত করিলেন। কোতায়বা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া কাশ্‌গর প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানে চীন দেশের রাজ দূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

হেজ্জাজের অপর একদল সৈন্যের সহিত কাবুল-রাজের সংঘর্ষ বাধে; এবং তাঁহার তৃতীয় সেনাদল মাক্‌রানের ভিতর দিয়া সিন্ধু নদের মোহনা দেবাল (আধুনিক করাচি) বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

লঙ্কা দ্বীপের অধিপতি সেই সময় আট খানি অর্ণবপোত পরিপূর্ণ নানা প্রকারের উপঢৌকনাদি ও তৎসহ অনেক দাস দাসী, আমির হেজ্জাজ ও খলিফার শুভ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিতেছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে দেবাল রাজের অধিনস্থ কতকগুলি জলদস্যু ঐ সকল জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া লয়। এই লুণ্ঠনের প্রতিশোধ গ্রহণই হেজ্জাজের তৎকালে ভারতাভিমুখে সৈন্য প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য।

সেই সময় দেবাল রাজ, মহারাজা দাহিরের সামন্ত নৃপতি থাকায় হেজ্জাজের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, দাহির রায়ও এই লুণ্ঠন ব্যাপারে লিপ্ত আছেন। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি বিবেচনা করিলেন যে, মহা পরাক্রান্ত দাহির রায়ের সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত সৈন্য তাঁহার নাই। এই কারণে বাধ্য হইয়া ইরাক অধিপতি ভারতে সৈন্য প্রেরণের জন্য মহামান্য খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। খলিফা ইরাকের শাসনকর্তার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া উত্তর দিলেন—

"এই দূরতা' নিবন্ধন তিনি তাঁহার সেনাপতি মহাবীর মুসাকে, তাঁহার স্পেন জয়ের অদম্য গতি স্থগিত রাখিতে আদেশ দিয়াছেন ও তাঁহার

আজ্ঞাক্রমে ঐ সেনাপতির অধীনস্থ বীর অজেয় আরব সন্তানগণ জিবরাল্টারের তীরে বসিয়া অতি কষ্টে ইউরোপ আক্রমণের লোভ সম্বরণ করিতেছে; এক্ষণে আবার দূরবর্ত্তী ভারতে বহুল অর্থব্যয়ে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তিনি অনর্থক সত্য-ধর্ম্মাবলম্বীগণের জীবন বিপদাপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন না।"

শেষে হেজ্জাজ, বাজালি বংশোদ্ভব বুদায়েল্‌কে দেবাল আক্রমণের জন্য আহ্বান করিলেন। তৎসঙ্গে মোহাম্মদ হারুণের প্রতি তিন সহস্র সৈন্য লইয়া মাক্‌রানে গিয়া বুদায়েলের সহিত মিলিত হইবার ও আবদুল্লা-বেন্‌ খাতালের প্রতি, উমান হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে নিরুণে যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল তাহাতে সেনাপতি বুদায়েল সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে, শেষে অশ্ব হইতে নিপতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। এই যুদ্ধে বহু মোস্‌লেম সৈন্য সামানি অর্থাৎ বৌদ্ধ সেনাগণ কর্ত্তৃক বন্দি হয়।

যুদ্ধাবসানেই যখন ক্রোধান্ধ হেজ্জাজ নিরুণের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রাজাকে পত্র লিখিলেন যে—বিগত যুদ্ধ ও মোস্‌লেম বন্দিগণের সম্বন্ধে সত্বর প্রতিকার না করিলে, তিনি চীন দেশের সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডের বিধর্ম্মীগণকে তরবারির মুখে শিক্ষা প্রদান করিবেন,—তখন নিরুণরাজ ভয়ে গোপনে পত্র লিখিয়া হেজ্জাজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন ও সমস্ত বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

তৎপরে ওমার-বেন্‌-আবদুল্লা হিন্দুস্থান আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। হেজ্জাজ তাঁহার প্রর্থনা অগ্রাহ্য করিয়া সপ্তদশ বর্ষীয় অজাতশ্মশ্রু সদ্বংশজাত মনোহরকান্তি বীর, নিজ জামাতা এমদাদ-উদ্দীন মোহাম্মদ বেন্‌-কাসেম্‌কে সেনাপতি পদে নিয়োজিত করিলেন।

বালক সেনাপতি মহাবীর কাসেম প্রথমেই দেবাল রাজ্য (করাচি ও থাট্টা) আক্রমণ করিলেন। মহারথী মোহাম্মদ কাসেমের সহিত জাওবা-বেন্‌-আকাবা সালামি নামক জনৈক ঐতিহাসিক আসিয়াছিলেন। তাঁহারই লেখা ইতিবৃত্ত হইতে অবগত হইতে পারা যায় যে—মোহাম্মদ কাসেম দেবাল জয়ের পর, বহু ধনরত্ন লইয়া নৌকাযোগে ক্রমশঃ নিরুণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। নিরুণ দুর্গ আধুনিক জিলাই হায়দ্রাবাদ হইতে ৩৫ মাইল দূরে কিঞ্জার হ্রদের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। কাসেমের নৌকাগুলি আরোহী মোস্‌লেম সেনা সম্ভার লইয়া সিন্ধুনদ বহিয়া ক্রমশঃ উপর দিকে ধাবিত হইতে থাকে। শেষে তাঁহারা নৌকা অবতরণে সিসামের পথ অবলম্বনে, ছয় দিনে নিরুণ রাজ্যে পৌঁছিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই স্থানে জলাভাবে সেনাগণের খুবই কষ্ট হইতে লাগিল। এই অবস্থা দর্শনে সেনাপতি মোহাম্মদ কাসেম, একান্ত মনে পরম করুণানিদান আল্লাহতাআলার সমীপে এতগুলি সত্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রাণ রক্ষার্থে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার কাতর প্রার্থনা ফলবতী হইল। অল্পকাল মধ্যেই প্রচুর বারিপাতে সমস্ত নদী তড়াগ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

নিরুণের শাসনকর্ত্তা সীমানি অনেক উপঢৌকন সহ আরব সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

মোহাম্মদ-বেন্ কাসেম নিরুণের পুরাতন বুদ্ধ-মন্দিরের পার্শ্বে, মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অচিরে প্রকাণ্ড ও সুদৃশ্য মোস্‌লেম ভজনালয় নির্ম্মিত হইয়া, তাহাতে 'আজান' ও 'নামাজ' আরম্ভ হইল। মহাবীর কাসেম নিরুণের মস্‌জিদে একজন এমাম নিযুক্ত করিয়া তথা হইতে শিউস্থান জয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

এই যাত্রায় মিত্র রাজা সামানি, পথ প্রদর্শক হইয়া আরববীর কাসেম্‌কে বাহরাজ বা বলাহার পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন।

দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র, চন্দ্রের পুত্র ভজহার্ শিউস্তানের দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি মোসল্‌মানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং সমস্ত সামন্ত নৃপতিবর্গের ও প্রজাগণের নিকট সাহায্যার্থে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। ভজহরের অধীনস্থ রাজাগণ দুর্দ্ধর্ষ মরু সেনাগণের বল বিক্রম অবগত থাকায় কিছুতেই মহাবীর কাসেমসহ বল পরীক্ষা করিতে সাহস করিল না।

কাসেম দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই সময় ভজহরের প্রজাবর্গ সেনাপতির নিকট তাহাদের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার্থে প্রার্থনা করায়, মোহাম্মদ কাসেম তাহাদিগকে অভয় দান করিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত দুর্গ মধ্যস্থ রাজসৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। আক্রমণের ফলে ভজহরের সেনাগণ বিতাড়িত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ভজহর রাত্রিযোগে দুর্গের উত্তর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া নদী পার হইয়া পলায়ন করিলেন।

এই দুর্গ জয়ের সহিত সমস্ত শিউস্তান প্রদেশ বীর পুঙ্গব কাসেমের হস্তগত হইল। দুর্গ মধ্যে সেনাপতি বিস্তর ধনরত্ন ও স্বর্ণ রৌপ্য পাইলেন এবং উহার অধিকাংশ তিনি নিজ সেনাগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন।

অতঃপর মোহাম্মদ বেন কাসেম বুধিয়া (আধুনিক কচ্ছু গান্ধব) প্রদেশ জয়ের আশায়, সেনাগণকে লইয়া কুম্ভ নদীর তীরবর্ত্তী নিধান নামক স্থানে গিয়া অবতীর্ণ হইলেন। বুধিয়ার রাণাবংশ অযোধ্যার পুরাতন সূর্য্যবংশীয় রাজগণের বংশধর বলিয়া খ্যাত ছিলেন। হঠাৎ আরব সৈন্যগণের আগমন দেখিয়া সমস্ত সামন্ত রাজগণ বুধিয়া রাজ

কাকা কোটালের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া রাত্রিযোগে মোস্‌লেম সেনাগণকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কাকা তাহাদের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া উত্তর দিলেন যে—তিনি বুদ্ধদিগের পুস্তকে আভাষ পাইয়াছেন ও জ্যোতিষ গণনায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, হিন্দুস্থান মোসল্‌মানগণের করতলগত হইবে; এই কারণে তিনি মোসল্‌মানগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

ইহার অল্পদিন পরেই কাকা কোটাল, সেনাপতি মোহাম্মদ কাসেমের সমীপে গিয়া আত্মসমর্পণ করায়, মহানুভব কাসেম তাঁহাকে যথেষ্ট সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন।

বুধিয়া দেশে অবস্থান কালে সেনাপতি কাসেম, আমির হেজ্জাজ-বেন-ইউছুফের নিকট হইতে ফর্‌মান পাইলেন যে—

"পরম করুণা নিদান আল্লাহতাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, সেনাপতি যেন মেহ্‌রান পার হইয়া রাজা দাহির রায়কে আক্রমণ করেন ও তাঁহাকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া, সমস্ত সিন্ধু প্রদেশে মোস্‌লেম বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে সুশাসনের বন্দোবস্ত করিয়া দেন।"

আমির হেজ্জাজের আদেশ পাইয়া সেনাপতি কাসেম পুনরায় নিরুণে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নিরুণ হইতে আমিরের নিকট তাঁহার সমস্ত বিজয় বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিয়া এবং বিজিত প্রদেশের যে যে স্থানে যতগুলি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন ও ঐ সকল ভজনালয়ে যেরূপে প্রত্যহ পাঁচ বার আজান ও নামাজ হইতেছে; তৎসহ প্রত্যেক শুক্রবারে জোম্‌আর নামাজের সময় মহামান্য খলিফার নামে যেরূপে খোৎবা পাঠ হইয়া থাকে, প্রভৃতি রাজ্য বিস্তার ও ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন।

সেনাপতি মহাবীর কাসেমের সৈন্য পরিচালনের সংবাদ পাইয়া রাজা দাহির রায় সসৈন্যে মেহ্‌রান নদীর অনতিদূরে আসিয়া, তথায় সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমির হেজ্জাজ-বেন্‌-ইউসফ, জামাতা কাসেমের সাহায্যার্থে আরও দুই সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী আরব-সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন।

সেনাপতি মোহাম্মদ বেন কাসেম এই সৈন্য সম্ভার লইয়া নদী পার হইয়া হিন্দু সেনাগণকে আক্রমণের চেষ্টায় নৌকা সংগ্রহে যত্নবান হইলেন। এই কার্য্যে তিনি বায়েতের অধিপতি মোকা বিশ্বের নিকট হইতে বিশেষরূপে সাহায্য পাইয়াছিলেন। কাসেম অধীনস্থ সেনানী জাকওয়ান-বেন্‌ উল্‌ওয়ান্‌-আল্‌ বিক্‌রির অধীনে ১৫০০ সৈন্য দিয়া মোকা বিশ্বের সাহায্যে নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করাইতে তৎপর হইলেন।

এই সেতু নির্ম্মাণ কালে, সেনাপতি দেখিতে পাইলেন যে—নদীর পরপারে শত্রুগণ পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় সমবেত হইয়া, সেতু নির্ম্মাণে বাধা প্রদান করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া অবস্থান করিতেছে। তখন তিনি পশ্চিম পারে, মেহ্‌রাণ নদীর পরিসর পরিমাণ স্থানে নৌকাগুলি সংযোগ করাইয়া, সমস্ত নৌকাগুলি অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত যোদ্ধায় পরিপূর্ণ করিলেন ও সম্মুখের বৃহৎ নৌকাখানিতে সুনিপুণ গোলন্দাজ সৈন্য সমাবেশ করিয়া, সংযোজিত নৌ-সেতুটী ভাসাইয়া দিলেন।

সুনিপুণ আরব গোলন্দাজগণের ক্ষিপ্রহস্তের শর নিক্ষেপ, হিন্দু সেনাগণ অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। নদীকুল-রক্ষী দাহির-সেনা তীর পরিত্যাগ করিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। কাসেম নৌ-সেতু সুদৃঢ় করিয়া তাহার অশ্বারোহী ও পদাতিক সমুদয় সৈন্য নদী পারে লইয়া গিয়া, ভীষণ বেগে শত্রু মধ্যে পতিত হইয়া, তাহাদিগকে দূরবর্ত্তী ঝামনগরের দ্বার পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিলেন।

আরব অশ্বারোহীগণ সকলেই সুদৃঢ় লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত ছিল। সেনাপতি মোহাম্মদ কাসেম তাঁহার সৈন্যগণকে লইয়া প্রথমতঃ বায়েত দুর্গের সম্মুখে শিবির সংস্থাপন করিলেন। পরে তথা হইতে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জিওয়ার বা জয়পুর গিয়া সেই স্থানে সসৈন্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাজা দাহির প্রথমতঃ এই সংবাদে অধৈর্য্য হইয়া, মন্ত্রী সিসাকরকে (সিয়াকার) ডাকিয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। মন্ত্রী অনেক চিন্তার পর উত্তর দিলেন যে—মোসলমানেরা যখন জয়পুর অধিকার করিয়াছে, তখন তাহাদের সকল স্থানেই জয় হইবে। মন্ত্রীর উত্তরে রাজা দাহির একেবারে উদ্যমভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। পরে সেই সময়ের একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে এই যুদ্ধের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা তাঁহার নিকট আরও জানিতে চাহিলেন যে—সেই সময়ে শুক্রগ্রহ আকাশের কোন স্থানে অবস্থান করিতেছে।

জ্যোতিষী, গণনা করিয়া অনেক বিলম্বের পর উত্তর দিলেন যে—শুক্রগ্রহ আরবগণের পশ্চাতে ও রাজার সম্মুখে থাকায়, যুদ্ধে আরব সেনাগণেরই বিজয়ের অধিক সম্ভাবনা। তখন রাজা দাহির অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়ায়, জ্যোতিষ বিদ্যাবিৎ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য শুক্রগ্রহের একটী স্বর্ণ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে বলিয়া, উহা তাঁহার ঘোড়ার জীনের পশ্চাতে বাঁধিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতে উপদেশ দিলেন।

পাঁচ দিন ধরিয়া উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। শেষে ৩৩ বৎসর পূর্ণ উদ্যমে রাজ্য শাসন করার পর, প্রবল প্রতাপশালী রাজাধিরাজ দাহির রায় হিঃ ৯৩, ১০ই রমজান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় (৭১২ খৃঃ জুন) রেওয়ার দুর্গপ্রান্তে গুরুতর আহত হইয়া মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইলেন।

রাজা দাহিরের মৃত্যু সম্বন্ধে আবুল লায়েস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

দাহির তাঁহার শ্বেত হস্তী আরোহণে আরব সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে, বীরবর মোহাম্মদ কাসেম তাঁহার অগ্নিবাণ নিক্ষেপকারী (ন্যাপথ্য) সেনাগণের দিকে ইঙ্গিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটী প্রজ্বলিত আগ্নেয়-শর দাহিরের হাওদায় পড়িয়া হস্তীপৃষ্ঠস্থ হাওদায় অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল। তখন হস্তী, পৃষ্ঠপ্রজ্বলিত অগ্নির অসহ্য যন্ত্রণায় চালকের ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তৎপরে জল হইতে উঠিয়া রাজা দাহিরকে পৃষ্ঠে লইয়া পলায়ন করিবার কালে রাজা, শরাঘাতে গজপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইয়া যেমন নিকটস্থ একজন আরব যোদ্ধাকে আক্রমণ করিলেন, অমনি তাহার সবল হস্তের অসি দাহিরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাঁহার গ্রীবাদেশের রক্ত চুম্বন করিল।

দাহিরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জয়সিংহ অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গে (আধুনিক সিন্ধু হায়দ্রাবাদ নগর হইতে ৪৭ মাইল উত্তর পূর্ব্বে) আশ্রয় লইলে, মোহাম্মদ কাসেম উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এই দুর্গে কাসেম ছয় সহস্রাধিক হিন্দু যোদ্ধাকে তরবারীর মুখে নিপতিত করিয়া ও তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক সৈন্যের শরবিদ্ধে বিনাশ সাধন করিয়া দুর্গাধিকার করিয়াছিলেন। যুদ্ধে জয়সিংহের সমুদয় অনুচরবর্গ ও তাহাদের স্ত্রী পুত্রগণ রণবিজয়ী কাসেম হস্তে বন্দী হইল। দাহির পুত্র রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে গণনা করিয়া দেখা গেল যে—বন্দিগণের সংখ্যা ত্রিংশ সহস্রেরও অধিক। তন্মধ্যে রাজা দাহিরের ভাগিনেয়ীকে লইয়া ৩০ জন রাজ পরিবারভুক্ত স্ত্রীলোকও বন্দিনী হইয়াছিলেন। *এই সমস্ত বন্দী বন্দিনীর পঞ্চমাংশ দাহিরের ছিন্ন মস্তকসহ, জনৈক সেনানী কায়াবের সমভিব্যাহারে আমির হেজ্জাজের নিকট কুফায় প্রেরিত হইল।

দাহিরের পুত্র জয়সিং সেই সময় হইতে সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া, বাহ্‌রুব, ধালিয়া প্রভৃতি স্থানের খণ্ড যুদ্ধে মোস্‌লেম সেনাপতি কাসেমকে বহুদিন পর্য্যন্ত বিব্রত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। শেষে কাশ্মীরে পলায়ন করিয়া রাজপুত্র জয়সিংহ তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে সমস্ত আলোর রাজ্য মোস্‌লেমগণের হস্তগত হইল।

এই মহা বিজয়ের পর, একদিন প্রায় এক সহস্র মুণ্ডিত-মস্তক ব্রাহ্মণকে মহাবীর কাসেম সমীপে উপস্থিত করা হইল। সেনাপতি তাহাদিগকে তাহাদের এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহারা কাহার সৈন্য দলভুক্ত জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণগণ বিনয় সহকারে এইরূপ উত্তর করিল—

"ধর্ম্মরাজ, আমাদের রাজা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আপনার সেনাগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে; এবং তাহারা আমাদের মধ্যেও অনেককে হত্যা করিয়াছে। সেই দুঃখে আমরা এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। আপনি ধার্ম্মিক, আপনি আমাদিগকে যে শাস্তি উপযুক্ত হয় প্রদান করুন।"

বীরবর কাসেম ব্রাহ্মণগণের এবম্প্রকার নম্রতা ও সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপ দয়া প্রদর্শন দ্বারা মহাবীর কাসেম, সিন্ধু রাজ্যের বহু হিন্দু প্রজা ও সামন্ত রাজগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন।

কাসেম ব্রাহ্মণাবাদ রাজ্যের প্রজাগণের মধ্যে প্রচুর ধন বিতরণ করিয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে প্রধান প্রধান লোক বাছিয়া তাহাদিগকেই রাজস্ব আদায় কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই উদারচেতা আরব যুবকের গুণের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই সেনাপতির শরণাপন্ন

হইলেন। মোহাম্মদ বেন-কাসেমও তাহাদের শ্রেষ্ঠতা ও যোগ্যতার প্রমাণ গ্রহণে তাহাদের মর্য্যাদা ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণ মোহাম্মদ কাসেমের রাজত্বে অবাধে ও নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের মন্দিরে পূজা পাঠ করিবার অনুমতি পাইল। তৎপরে সেনাপতি, আমির হেজ্জাজের নিকট লিখিয়া, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের জন্য নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের ভজনামন্দির প্রস্তুত করিবার অনুমতি (ফরমান) আনাইয়া দিলেন।

অতঃপর মোহাম্মদ কাসেম সিন্ধু দেশের রাজধানী আলোর নগরে গিয়া জানিতে পারিলেন যে—তথাকার সাধারণ লোকের মনে তখনও ধারণা রহিয়াছে যে, রাজা দাহির রায়ের মৃত্যু হয় নাই; বরং তখনও তিনি মুসল্‌মানগণকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহার্থে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন।

ইতিপূর্ব্বে দাহিরের প্রধানা মহিষী লাদী বাঈকে বন্দিনী করিবার পর, কাসেম রাণীকে নিজ শিবিরে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাণী লাদী স্বেচ্ছায় এছলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও অল্পদিন মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মের অনেক রীতি নীতি ও পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এক্ষণে নগরের লোকের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য সেনাপতি, উক্ত লাদী বাঈকে তাঁহার নিজ পুরাতন গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণের উষ্ট্রে আরোহণ করাইয়া, বিশ্বাসী কয়েকজন অনুচর সমভিব্যাহারে নগর ভ্রমণ করাইলেন ও সেই সময় রাণী উষ্ট্র পৃষ্ঠ হইতে বলিতে লাগিলেন—

"আমি রাজা দাহির রায়ের পাটরাণী লাদী। রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার ছিন্ন মস্তক, রাজচ্ছত্র ও পতাকাদি সহ খলিফার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। খোদাতায়ালা কোরাণে বলিয়াছেন—"তোমরা নিজে তোমাদের ধ্বংস ডাকিয়া আনিও না।" (চাচ্‌নামা)

আলোর হইতে বীর সেনাপতি কাসেম মুলতান যাত্রা করিলেন ও তথায় মিনারেট সম্বলিত একটী বৃহৎ জামে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে আমির দাউদ নাসারকে মুলতানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, ঐ স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় মধ্যে সুযোগ্য মোস্‌লেম সেনাপতি মোহাম্মদ বেন-কাসেম, মুলতানে পঞ্চাশৎ সহস্র উৎকৃষ্ট দেশীয় অশ্বারোহী সেনা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দানে অল্পদিন মধ্যেই যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিলেন।

মুলতানে সেনাপতি, খলিফা মারওয়ান পৌত্র ওলিদ-আবদুল-মালেকের নিকট হইতে কনোজ জয় করিবার ও তথাকার রাজাকে পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার ফরমান প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অধীনস্থ সেনানী আবু-হাকিম সায়বানীকে দশ সহস্র অশ্বারোহী সহ খলিফার উপদেশ বাণী বুঝাইয়া দিয়া কনোজে পাঠাইলেন ও স্বয়ং সসৈন্যে কাশ্মীরের সীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে কনোজ রাজ্য আজমীরের সীমা পর্য্যন্ত ব্যপ্ত ছিল।

আবু-হাকিম সায়বানী উদাফরে পৌছিয়া কনোজ রাজ রায় হরচন্দ্রের নিকট জায়েদ-বেন-আমরুকে একখানি পত্র সহ প্রেরণ করিলেন। পত্রে উল্লেখ ছিল যে—

"রাজা যেন পত্র পাইবা মাত্র পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও মহামান্য খলিফার মহা সেনাপতি এমদাদ উদ্দীনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, তাঁহার অধীনস্থ শাসন কর্ত্তা হইয়া থাকিতে স্বীকৃত হন।"

রায় হরচন্দ্র পত্র পাঠে দূতকে অবগত করিলেন যে—

"এই রাজ্য তাঁহার পুরুষানুক্রমে সহস্র বৎসরের অধিক কাল শাসন করিতেছেন। তিনি কোন শত্রুর হুঙ্কারে কখনও ভয় করেন নাই; এবং দূত অবধ্য না হইলে এতক্ষণ তাহাকে বন্দী হইতে হইত।"

জায়েদ এই সংবাদ সেনাপতি কাসেমের নিকট জ্ঞাপন করায়, তিনি তৎক্ষণাৎ কনোজ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

এদিকে পরদিন প্রত্যুষেই মহামান্য খলিফার নিকট হইতে জনৈক অশ্বারোহী একখানি পত্র আনিয়া মহা সেনাপতি মোহাম্মদ কাসেমের হস্তে দিল।

এই সম্বন্ধে আলি-আবুল-হাসান-পুত্র মোহাম্মদ উল্লেখ করিয়াছেন—"রাজা দাহিরকে হত্যা করিবার পর সেনাপতি কাসেম, দুইজন রূপ-লাবণ্যবতী রাজকুমারীকে প্রাসাদ হইতে ধৃত করিয়া বন্দিনী অবস্থায় হাব্সী খোজা সমাভব্যাহারে দামেস্কে খলিফার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। খলিফা তাহাদিগকে কিছুদিন হেরেমে রাখিয়া, উহাদের উভয়কে একদা রাত্রিকালে নিজ সমীপে আহ্বান করিলেন ও ভগ্নীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে রাজকুমারী পরিমল দেবী অপেক্ষা কুমারী সূর্য্য দেবীই বয়োঃজ্যেষ্ঠা।

তৎপরে খলিফা সূর্য্যকে নিকটে রাখিয়া কনিষ্ঠাকে হেরেমে বিদায় করিয়া দিবার পর, সূর্য্য দেবী নিজ মুখাবরণ অনাবৃত করিলে খলিফা তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র, সূর্য্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহামান্য বাদশাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল যে,—

"আমি মহামহিমান্বিত খলিফার উপযুক্তা নহি। আমাদিগকে বন্দিনী করার পর মহাসেনাপতি এমদাদ উদ্দীন আমাদের উভয় ভগ্নীকে তিন রাত্রি তাঁহার অঙ্কে স্থান দিয়াছিলেন ও তৎপরে বাদশাহের দরবারে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

খলিফা ওলিদ-বেন্ আবদুল মালেক, সে সময় সূর্য্য দেবীর রূপে এতাধিক মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি তৎকালে বিবেক শক্তি

হারাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে লেখনী লইয়া সেনাপতিকে পত্র লিখিলেন—"মোহাম্মদ কাসেম যে স্থানে যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, পত্র পাঠ যেন আপাদমস্তক সদ্যমুক্ত পশু চর্ম্মের থলিয়ায় আবদ্ধ হইয়া খলিফা সমীপে আনীত হ'ন।"

উদাফর্ নগরে মহা-সেনাপতি, খলিফার এই হুকুমনামা প্রাপ্ত হইয়া অধীনস্থ কর্ম্মচারীবর্গকে ডাকিয়া, তাঁহার দেহ সদ্যমুক্ত পশু চর্ম্মে আবৃত করিয়া সেলাই করিয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশ মত ঐ অবস্থায় তাঁহাকে একটী সিন্দুকে পুরিয়া দামেস্ক নগরে খলিফার নিকট পাঠান হইল। বলা বাহুল্য যুবক কাসেমের পবিত্র আত্মা ইহার অল্পক্ষণ মধ্যেই ঈশ্বর সমীপে নীত হইয়াছিল।

মৃতদেহ সহ কাষ্ঠাধার মারওয়ান-পৌত্র অলিদের নিকট পৌছিবার পর, তিনি সূর্য্য দেবী (যাহার প্রকৃত নাম এক্ষণে জান্‌কী দেবী প্রকাশ পাইল) ও পরিমল দেবীকে ডাকাইয়া তাহাদের সম্মুখে ঐ মৃতদেহ অনাবৃত করিয়া, তাঁহার রাজাদেশ কি প্রকারে পালিত হইয়াছে, তাহা সুন্দরীদ্বয়কে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এমন সময় জান্‌কী, খলিফার নিকট অনুনয় বিনয় সহকারে তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল যে—সে সেনাপতির বিরুদ্ধে যাহা কিছু কহিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ঈর্ষামূলক ও মিথ্যা। মহামতি মোহাম্মদ কাসেম তাহাদের উভয় ভগ্নীর প্রতি যথোচিৎ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের প্রতি নিজ সহোদরার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন ও কুত্রাপি তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। অপর পক্ষে সেনাপতি তাহাদের পিতৃহন্তা, সিন্ধু দেশ ধ্বংসকারী; তিনি হিন্দ ও সিন্ধের অন্যূন সত্তর জন রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহাদের স্ত্রী-কন্যাগণকে এইরূপ বন্দিনী করিয়াছেন; সেনাপতি দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার স্থানে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া,

হিন্দুর ধর্ম্মে ও প্রাণে দারুণ আঘাত করিয়াছেন; তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য ভগ্নীদ্বয় এই প্রতিহিংসাময়ী অভিসন্ধির সৃষ্টি করিয়া, রাজ সমীপে সেনাপতির বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা উক্তি করিয়াছিল।

দাহির দুহিতাদ্বয়ের মুখে এই বিবরণ শ্রবণে, সেই সময় খলিফা ওলিদের এতাধিক মনস্তাপ হইয়াছিল যে, তিনি রাগান্ধ হইয়া নিজ দক্ষিণ হস্তের উপরিভাগ দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া রক্ত প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

তৎপরে খলিফা ওলিদ নিজে উপস্থিত থাকিয়া, হুকুম দিয়া যুবতী দ্বয়কে জীবন্ত অবস্থায় প্রাচীর মধ্যে গাঁথাইয়া ফেলিলেন।

এদিকে এস্লামের জয় হিন্দুস্থানে ক্রমশঃ ঘোষিত হইয়া চতুর্দ্দিকে মোস্লেম বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। (ফতেহ্নামা ও জাব্দাতোত্ তাওয়ারিখ)।

ঠিক এই একই সময়ে পৃথিবীর অপর প্রান্তে সেনাপতি মুসা, তাঁহার বীর সহচর অদম্য সাহসী যুবক তারেকের সাহায্যে স্পেনের উত্তর সীমা পিরেনীজ পর্ব্বত ও বিস্কে উপসাগর পর্য্যন্ত মোস্লেম সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া, ইউরোপে মোস্লেম বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। মহা তেজস্বী সেনাপতি তারেক যে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া সমুদ্র পারে স্পেনে পদার্পণ করিলেন, নিজের নামানুসারে সেই পর্ব্বতের নাম জোবাল্-তারেক অর্থাৎ তারেক্ পর্ব্বত রাখিয়াছিলেন। কালে প্রণালীটির নাম জোবল্ তারেক বা জিব্রাল্টারে পরিণত হইল।

সিন্ধু দেশের ন্যায়, স্পেনও এস্লামের তরবারি তলে আত্মসমর্পণ করায়, সেখানেও অধিবাসী খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও ইহুদিরা নির্ব্বিঘ্নে নিজ নিজ ধর্ম্ম কার্য্য সম্পন্ন করিবার অনুমতি পাইল। উভয় স্থানেই পরাভূত দেশবাসিগণ বিজেতার অধীনে বড় বড় দায়িত্বজনক পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

জামাতা মোহাম্মদ কাসেমের প্রতি আমির হেজ্জাজের কনোজ জয়ের পর চীনদেশ আক্রমণের উপদেশ ছিল। এবং জাগ্‌জারটশ বিজেতা মহাবীর কোতায়বা ও কাসেমের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করণ-কল্পে হেজ্জাজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে—এই দুই বীরের মধ্যে যিনি অগ্রে চীনদেশ জয় করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই ঐ বহু পুরাতন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করা হইবে।

মহাবীর কাসেমের ন্যায় স্পেন বিজয়ী বৃদ্ধ মহাসেনাপতি মুসাকেও নিজ অধীনস্থ সেনানী মহাতেজঃ তারেকের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া দুর্ব্যবহার করিবার জন্য, পরবর্ত্তী খলিফা সোলায়মানের কোপাগ্নিতে পড়িয়া যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

চতুর্থ সর্গ

খলিফা সোলায়মান ৯৬ হিঃ হইতে ৯৯ হিঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে ভারতের অনেক নৃপতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। দাহির-পুত্র জয়সিং কাশ্মীর হইতে বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণাবাদ পুনর্দখল করিয়া লইলেন।

মহাবীর কাসেমের স্থান পূরণ করিবার জন্য সেনাপতি এজিদ্‌কে পাঠান হইল, কিন্তু সিন্ধুদেশে পৌঁছিবার অষ্টাদশ দিবসে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। তাঁহার স্থলে হবিব্-বেন-মোহাল্লাব, জয়সিংহ দমনে প্রেরিত হইলেন। হবিব্ সিন্ধু নদী তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া একদল হিন্দু সেনাকে পরাজিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আলোরের সমস্ত অধিবাসিগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল।

ওলিদ-ভ্রাতা সোলায়মানের মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় ওমর খলিফা হইয়া ভারতের অনেক রাজন্যকে দামেস্কের অধীনতা স্বীকার করিতে ও এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। এই সঙ্গে তিনি তাঁহা-দিগকে অবগত করিয়া দিলেন যে—তাঁহারা স্বেচ্ছায় এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগকেও অপরাপর মোসল্‌মান নরপতিগণের সমান অধিকার দেওয়া হইবে। এই সময় দাহির পুত্র ও আরও অনেক রাজা, খলিফা ওমর-বেন-আবদুল আজিজের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া,

আম্বি নাম গ্রহণে পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আরব সেনাপতি আমরু-বেন-মোস্‌লেম-আল-বাহালি হিন্দুস্থানের অনেক-গুলি রাজাকে এই সময় বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছিলেন। (আল্ বেলাদুরি)

ওমরের পর ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় এজিদ্, হাশেম ও দ্বিতীয় মারওয়ান ১৩২ হিঃ বা ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দামেস্কের সিংহাসনারূঢ় ছিলেন।

পঞ্চম সর্গ

আব্বাসি বংশ

এই বংশের প্রথম খলিফা আবুল-আব্বাস্-আস সাফফাহ চারি বৎসর কাল হিঃ ১৩২ হইতে হিঃ ১৩৬ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবার পর খলিফা আবু-জফর্-অল্-মনসুর ৭৫৪ খৃঃ হইতে ৭৭৫ খৃঃ ১৫৪ হিজরী পর্য্যন্ত বাগ্‌দাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হিং ১৩০ সালে আল্-মনসুর, হাশেম্‌কে সিন্ধু দেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য এই সময়ে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল, সেনাপতি হাশেম্ অত্যল্পকাল মধ্যে তাহাদের রাজ্য হস্তগত করিয়া তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। হাশেম্ তাঁহার অধীন সেনাধ্যক্ষ আম্‌রু-বেন-জামল্‌কে তৎকালীন গুর্জ্জর প্রদেশভুক্ত বরোদা জয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার অপর একদল সৈন্য কাশ্মীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করিতে কৃতকার্য্য হয়। ইহারা কাশ্মীর হইতে অনেক সুন্দরী ললনা ও বালক বন্দী করিয়া আনিয়াছিল। ক্রমে সমস্ত মুলতান প্রদেশ, সামরিক শাসনকর্ত্তা হাশেমের করায়ত্ত হইল।

এই সময় সিন্ধু দেশস্থ আরবগণ গান্ধার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ও তথাকার একটী দেবালয় ধ্বংস করিয়া উহার ধ্বংসাবশেষ লইয়া গিয়া একটী বৃহৎ মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

হারুণ-অর্‌-রশীদ

হিঃ ১৭০ সাল ৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ন্যায়-বিচারক খলিফা হারুণ-অর্‌-রশীদ বাগ্‌দাদের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

হারুণ-অর্‌-রশীদের প্রখর দৃষ্টি ছিল, যাহাতে আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ এই উভয় স্থানের শাসনকর্ত্তাদ্বয় অধিক প্রবল হইয়া বাগ্‌দাদের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে না পারে। এবং এই জন্যই তিনি সিন্ধুদেশ ও মিশরের শাসনকর্ত্তাদ্বয়কে মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করাইতেন।

দাউদ-বেন-এজিদ মোহাল্লবি, পিতার মৃত্যুর পর মিসরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। খলিফা ৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে আফ্রিকা খণ্ড হইতে সরাইয়া সিন্ধুদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আবুল-আব্বাস সিন্ধুর শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন।

খলিফা হারুণ-অর্‌-রশীদের সময়ে সিন্ধুদেশের আরবগণ এতদূর পরাক্রমশালী হইয়াছিল যে—তাহাদের ক্রমশঃ রাজ্য বৃদ্ধি দেখিয়া সুদূর খাকান ও তিব্বত পর্য্যন্ত ত্রস্ত হইয়া হইয়া পড়িয়াছিল।

আরব্য উপন্যাসের অমর খলিফা এই হারুণ-অর-রশীদ, প্রজাগণের হিতের জন্য ও তাহাদের অভাব অভিযোগ নিবারণের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিক জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা হয় না।

খলিফা নিজে একজন সুকবি ছিলেন; তৎসহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্য চালনায় তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। এ কারণ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আনীত বিদ্যানুরাগী সুধীবৃন্দ দ্বারা যেমন এক পক্ষে তাঁহার রাজসভা আলোকিত হইয়া থাকিত, অপর পক্ষে দেশ বিজয়ের জন্য তিনি বাছিয়া বাছিয়া সেনা ও উপযুক্ত সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন; এবং সময়ে সময়ে নিজে রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ পর্য্যালোচনা করিতেন।

গ্রীক রাজ নাইসীফোরাস্, মোস্লেম অধিকার ভুক্ত দেশ আক্রমণ করায়, খলিফা হারুণ-আর-রশীদ স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিয়া গ্রীক রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। পরে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া শেষে নিজ হৃদয়ের উদারতা বশতঃ ঐ খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী রাজার সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। এই গ্রীক খৃষ্টানগণকে বাধা প্রদান করিবার জন্য খলিফা হারুণকে প্রায় দেড় লক্ষ বেতন-ভোগী সৈন্য, তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমাংশে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইয়াছিল।

খলিফার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি শেষ জীবনে খোরাসানে যাইবার কালে, তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য ভারত হইতে জনৈক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মানিক্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বৈদ্যের চিকিৎসা গুণে খলিফা হারুণ-অর-রশীদ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন; কিন্তু বাল্খে পৌছিবার পূর্ব্বেই ৮০৯ খৃঃ খোরাসানের মধ্যবর্ত্তী আধুনিক মেশেদ নগরের উত্তরস্থিত তুস নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে খলিফার অভিলাসানুযায়ী বৈদ্য মানিক্যকে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার করিয়া, পারস্য উপসাগর দিয়া তাঁহার দেশে পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

হারুণ-অর-রশীদের পর তৎপুত্র আল্ মামুন হিঃ ১৯৮ হইতে ২১৮ হিঃ পর্য্যন্ত ও তৎপরে আব্বাসী বংশের মোতেসেম্-বিল্লাহ্, মোতামাদ্ অল্লাহ্, মোকতাদার বিল্লাহ্, মতি-উল্লাহ ও কাদের-বিল্লাহ বাগদাদে ৪২২ হিজরী ১০৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়ায়, ভারতের যে সমস্ত দেশ আরব বীরগণ বহু আয়াসে জয় করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ সর্গ

বাগদাদের খলিফাগণের ক্ষমতা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতে দেখিয়া তাঁহাদের অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সকল শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে মাবরন্নেহার (ট্রান্স ককেশিয়া) ও খোরাসানের অধিপতি এস্‌মাইল সামানি সর্ব্বপ্রথমে হিঃ ২৬৩ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। এই সামানি বংশের রাজাগণের মধ্যে এস্‌মাইল সামানি, নিজ রাজ্য মাবরন্নেহার ও খোরাসানের সহিত, উজ্‌বেক্‌ দেশের বোখারা ও পারস্যের উত্তরাংশ পর্য্যন্ত রাজত্ব বিস্তারিত করিয়া সুখ্যাতির সহিত সুশাসন দণ্ড পরিচালন পূর্ব্বক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সৎনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তাঁহার পরেও এই সামানিয়া বংশ সম্পূর্ণ যশঃ কীর্ত্তি ও তৎসঙ্গে সুবিচারের সহিত প্রায় ৯০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই সময় খাওয়ারিজাম্‌, (আধুনিক খীভা) প্রদেশের অন্তর্গত বিরূণ নামক জনপদে জগৎ প্রসিদ্ধ সুলেখক আবু-রায়হান মোহাম্মদ-বেন-আহমদ ৩৬০ হিঃ ৯৭০।৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আবু রায়হানের লিখিত ভারতের ইতিহাস হইতে তৎকালীন অনেক সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়। এই আবু রায়হান-আল্‌-বিরুণী একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক. গণিত ও জ্যামিতি শাস্ত্রজ্ঞ, নৈয়ায়িক ও জ্যোতিষী ছিলেন। তাঁহার জীবন চরিত লেখক সাম্‌সুদ্দীন-মোহাম্মদ-শাহ্‌রাজবি. আল্‌-বিরুণী সম্বন্ধে এইরূপ

উল্লেখ করিয়াছেন—বৎসরের মধ্যে মাত্র দুই দিন ভিন্ন তিনি কুত্রাপি আবু-রায়হান্‌কে কলম হস্তচ্যুত করিতে অথবা পুস্তক হইতে চক্ষু অপসারিত করিতে দেখেন নাই।

আবু-রায়হান-আল্‌-বিরুণী সোলতান মাহ্‌মুদের সভায় সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া অনেক দিন তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতের ভাষা শিক্ষা করেন। সংস্কৃত ভাষা উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়া তিনি ন্যায় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। বিস্তর সংস্কৃত পুস্তক তিনি আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। আল্‌-বিরুণী গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া অনেক ইউনানী ভাষার পুস্তক আরবীতে ও আরবী হইতে সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রবাদ আছে যে, তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলি একত্রিত করিলে—তৎসমুদয় একটী উষ্ট্রের পৃষ্ঠেও স্থানান্তরিত করা যাইত না।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে বিরুণী বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখা ভৌগলিক ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক এখনও পাওয়া যায়। ভুবৃত্তান্ত লিখিয়া তিনি সম্রাট মস্‌উদের নিকট হইতে এক উষ্ট্র পৃষ্ঠের বোঝাই রৌপ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই রৌপ্য তিনি গৃহে না লইয়া গিয়া রাজকোষে প্রত্যার্পণ করেন।

আবু-রায়হান-আল্‌-বিরুণীর স্বহস্তে লিখিত "তওয়ারিখ হিন্দের" কিয়দংশ এক্ষণে প্যারিসের লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

ভারতে সংস্কৃত ও ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিরুণী, যোগ ও ন্যায় শাস্ত্রের দুই খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শন, সংস্কৃত হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

সোলতান মাহ্‌মুদের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে খৃঃ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে কাবুলে যে সকল ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় আবু-রায়হানের এই তওয়ারিখল্‌ হিন্দ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মাহ্মুদের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বিশেষরূপ বর্ণনা, তাঁহার তওয়ারিখল্-হিন্দে বর্ণিত আছে।

বহুপূর্ব্বে তুর্ক দেশীয় রাজা কাবুলে আধিপত্য করিতেন। কথিত আছে যে, বার্হ্-তিগীন (তিগীন তুর্কি শব্দ অর্থ সাহসী) নামক একজন পরাক্রমশালী তুর্কবীর তিব্বতের মধ্য দিয়া আসিয়া কাবুলে বাকার পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বারহ্-তিগীন সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। যাহা হউক আশ্রয় স্থান হইতে বাহির হইয়া তিনি বাহুবলে কাবুলের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার বংশধরেরা ৬০ বৎসর যাবৎ কাবুলে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কাবুলের তুর্ক রাজাগণের মধ্যে কনক্ বা কনিকা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি পেশাওয়ার পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া তথায় একটী বৃহৎ পাঠাগার স্থাপন করেন। কনোজের রায় উপাধিধারী রাজা তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের প্রত্যাশায় তাঁহাকে অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করেন। কনোজ রাজের প্রেরিত উপঢৌকনের মধ্যে একখানি অতি মূল্যবান রেশমি কাপড় ছিল, যাহার সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া বিষ্ণুপদ অঙ্কিত থাকায়, দরজি কোন মতে উক্ত বস্ত্রে কাবুলাধিপতির অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইল না। অধিকন্তু সে বলিয়া পাঠাইল যে—এই কাপড়ে পদচিহ্ন থাকায় ইহাতে রাজ-পোষাক প্রস্তুত হইতেই পারে না।

কাবুল রাজের মনেও ধারণা হইল যে—এই কাপড়খানি উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করার অর্থ, কনোজ রাজের তাঁহাকে অপমান করা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

অচিরে রাজা কনক্ সৈন্যসহ কনোজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন কনোজেশ্বর মহা বিপদ গণিয়া মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন।

মন্ত্রী অনেক চিন্তার পর রাজাকে তাঁহার নাক ও অধরোষ্ঠ কাটিয়া দিবার পরামর্শ দিলেন। রাজা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া শেষে মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাঁহার নাসিকা ও ওষ্ঠ ছেদ করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। মন্ত্রী অনেক কষ্টে রাজা কনকের দরবারে পৌছিয়া, যথা বিহিত বিনয়-সহকারে তাঁহাকে অবগত করিলেন যে,—

"কনোজ রাজকে প্রবল পরাক্রমশালী কাবুল রাজের সহিত সন্ধি করিতে ও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বলায়, রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার এই অবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে এই কষ্ট, যন্ত্রণা ও অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, মহা পরাক্রান্ত কাবুলাধিপতি অচিরে কনোজ আক্রমণ করিয়া, রাজাকে উপযুক্ত মত শাস্তি প্রদান করেন। কনোজে পৌছিবার যে প্রচলিত পথ আছে উহা বহুদূর ব্যাপী ও বিস্তর কষ্টসাধ্য। এই কারণ মন্ত্রীর ইচ্ছা যে তিনি তাহার নিজ পরিচিত নাতিদীর্ঘ পথ প্রদর্শনে কাবুল সেনাগণকে কনোজে লইয়া যান। কেবল মাত্র এই পথে কিয়দ্দূর মরুভূমি উত্তীর্ণ হইতে হইবে বলিয়া, তাঁহাকে সৈন্যগণের পানার্থে কিঞ্চিৎ পানীয় জল সঙ্গে লইতে হইবে।"

কাবুলাধিপতি এই যথার্থ স্বদেশানুরাগী মন্ত্রীর শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তাহাকে তিল মাত্র সন্দেহ করিতে পারিলেন না ও তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সসৈন্যে কনোজ আক্রমণের জন্য মরুপথ অবলম্বন করিলেন। শেষে এই মন্ত্রীর কুচক্রে পতিত হইয়া তাঁহার অধিকাংশ সেনা জলাভাবে মরুমধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। অবশেষে রাজা কনক্ অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

কনকের পর এই বংশীয় কাতরমাল্ প্রভৃতি অনেকে রাজা হইবার পর, শেষে তুর্কিরাজ লখত-জামান বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া পড়ায়,

তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সমন্দ তাঁহাকে বন্দী করিয়া, স্বয়ং কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

তৎপরে এই ব্রাহ্মণ রাজবংশে ভীমপাল, জয়পাল, আনন্দপাল, নব্‌-ভজন্‌পাল প্রভৃতি রাজা হইয়াছিলেন। নব্‌ভজন্‌পালের পুত্র দ্বিতীয় ভীমপালই কাবুলের শেষ হিন্দু রাজা।

সপ্তম সর্গ

সামানি বংশের সপ্তম রাজা আবদুল মালেক্‌-নূহ্‌ হিঃ ৩৫০ সালে বোখারায় মানব লীলা সম্বরণ করার পর, তাঁহার পুত্র আবুল্‌-মনসুর ও তাঁহার সহোদরের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই বিবাদ মীমাংসার জন্য সমস্ত ওমরাহ্‌গণ একমত হইয়া খোরাসানের প্রবীণ শাসনকর্তা আবেস্তাজীর (আলপ্তগীন) অভিমতের উপ নির্ভর করিলেন। আলপ্তগীন অনেক বিবেচনার পর মৃত বাদশাহের সহোদরকেই সিংহাসনারূঢ় করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া নিজ অভিমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই রাজধানীর জনসাধারণের মত লইয়া আবুল্‌-মনসুর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

যুবক মনসুর পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিবার পরই, আলপ্তগীনকে খোরাসান হইতে রাজধানী বোখারায় ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আলপ্তগীন দেখিলেন যে এই আহ্বানে রাজ সমীপে উপস্থিত হওয়া ও বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করা, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী নহে। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ সেনাবল বিবেচনায় ও পরাক্রান্ত বোখারা রাজের সহিত প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা যুক্তিসঙ্গত নহে বুঝিয়া, তিনি অধীনস্থ একান্ত অনুরক্ত তিন সহস্রমাত্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে, ক্রমশঃ দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া প্রসিদ্ধ গজনী নগর হস্তগত করিয়া, তথায় এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন।

বোখারাধিপতি আবুল্‌-মন্‌সুর এই সংবাদে স্বীয় সেনাপতি আবুল্‌-হোসেনকে বহু সৈন্যসহ গজ্‌নী নগর আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। রাজ সেনার সহিত গজ্‌নী নগর প্রান্তে আলপ্তগীনের আফগান সেনার যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, তাহাতে উপর্য্যুপরি দুইবার আবুল্‌-মন্‌সুরের সেনাগণ পরাস্ত হইল ও শেষে পলায়ন করিল। গজ্‌নীর নব শাসনকর্ত্তা আলপ্তগীন স্বাধীন রাজা হইয়া তথায় পঞ্চদশ বৎসর কাল রাজত্ব করার পর, হিঃ ৩৬৬ সালে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

আলপ্তগীনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আবু-এস্‌হাক্‌ এক বৎসর মাত্র গজ্‌নীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অপুত্রক মানবলীলা সম্বরণ করায় হিঃ ৩৬৮ সালের ৮ই সাবান ৯৭৬ খৃঃ আলপ্তগীনের বিখ্যাত সেনাপতি গাজী নাসের-উদ্দীন সবক্তগীন, নাসের উদ্দীন নাম ধারণে সাধারণ প্রজাবর্গ ও ওমরাহ্‌গণের সম্মতিক্রমে গজ্‌নীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সবক্তগীন গজ্‌নীর অধিপতি আলপ্তগীনের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে আমির সবক্তগীনকে খোস্‌দারের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইল। এই যাত্রায় আমির আহার নিদ্রা পরিত্যাগে সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণে বরাবর খোস্‌দার নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও সঙ্গে সঙ্গে নগর অধিকার করিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তাকে বন্দী করিলেন। পরে উক্ত শাসনকর্ত্তার অনুনয় বিনয় ও নম্রতায় দয়াপরবশ হইয়া, তাঁহাকে করদ রাজা স্বরূপ মস্‌নদে বসাইয়া গজ্‌নী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই বিজয়ের পর হইতে আমির সবক্তগীন ভারতের যে সমস্ত জনপদ বা পার্ব্বতীয় দুর্গে ইতিপূর্ব্বে কখনও এস্‌লামের জয়পতাকা উড্ডীন হয় নাই, এইরূপ বহু নগর ও দুর্গ অল্পায়াসে করায়ত্ত করিতে

লাগিলেন। এই প্রকারে সবক্তগীন রাজা জয়পালের রাজত্বের কিয়দংশ অল্পকাল মধ্যেই অধিকার করিয়া বসিলেন।

তৎকালে ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ রাজা জয়পালের রাজধানী, আধুনিক থানেশ্বর হইতে একশত মাইল পশ্চিমে মহা-সমৃদ্ধিশালী ভাতেন্দা নগর ছিল। এবং তাঁহার রাজ্য উত্তর পশ্চিমে লাহোর হইতে লুম্ঘান প্রদেশ, অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত ও দক্ষিণ পূর্ব্বে কাশ্মীর হইতে মূলতান পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল।

মহা পরাক্রমশালী রাজা জয়পাল, মোসল্মানগণ কৃত এই রাজ্যাধিকারের অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য, সামন্ত রাজন্যবর্গকে আহ্বান করিয়া তাহাদের ও নিজের সৈন্য একত্রিত করিলেন। তৎপরে এই বিপুল বাহিনী লইয়া গজ্নী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আমির সবক্তগীন রাজা জয়পালের এই যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ পাইয়া, অধীনস্থ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সাহসী আফ্গান যোদ্ধাগণকে সঙ্গে লইয়া, রাজধানী গজ্নী হইতে জয়পালের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিবার জন্য নামিয়া আসিতে লাগিলেন। আমির দেখিলেন যে,—জয়পাল তাঁহার অন্ধকার রাত্রের ন্যায় মসীকৃষ্ণ অসংখ্য ক্ষুদ্রকায় সেনা লইয়া লাম্ঘান ও গজ্নীর মধ্যবর্ত্তী পথে অপেক্ষা করিতেছেন। এই যুদ্ধ যাত্রায় আমিরের মহা তেজস্বী সিংহ-বিক্রমশালী পুত্র আমিরুদ্দৌলা মাহ্মুদ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

উভয় সৈন্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কয়েকদিবস ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। শেষে একদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রপতনসহ মুষলধারে বারিপাত হইতে থাকায়, হিন্দু সেনাগণ প্রমাদ গণিতে লাগিল। শেষে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। রাজা জয়পাল সভাসদগণের সমক্ষে তৎপরে

স্বীকার করিয়াছিলেন যে—তিনি অকাল মৃত্যুর করাল ছবি, সেই ভয়ঙ্কর সময় চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন।

এই দুরবস্থায় পড়িয়া রাজা বাধ্য হইয়া আমিরের নিকট দূত প্রেরণে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে—"তিনি মহামান্য ও মহাপরাক্রমশালী আমিরের, সন্ধি সম্বন্ধীয় অনিয়মবদ্ধ যে কোন প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।"

আমির সবক্তগীন সাধারণতঃ পরাজিত শত্রুর প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। সেই কারণে তিনি প্রাণভয়ে ভীত এই হিন্দু রাজার সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কুমার মাহ্‌মুদ, রাজদূতকে কঠোর বচনে অপমানিত করিয়া ফিরাইয়া দিলেন ও বলিয়া দিলেন যে—"পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থে তিনি ঈশ্বর কৃপায় সম্পূর্ণ বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবেন না।

এই সংবাদে জয়পাল অধিকতর নম্রতাবলম্বনে আমির সমীপে লিখিয়া পাঠাইলেন যে—"সন্ধি প্রস্তাবে অসম্মত হইলে মহামান্য আমিরের কোনই লাভের আশা নাই। পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে হইলে, তৎপূর্ব্বেই তিনি তাঁহার সমুদয় ধনৈশ্বর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিবেন, হস্তীগুলির চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিবেন, স্বীয় সৈন্যের মধ্যে গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া যাহাতে পরস্পর পরস্পরের তরবারির আঘাতে হত হয়, তাহার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিবেন; এবং পুরবাসিনী রমণী ও স্ত্রী কন্যাগুলিকে জ্বলন্ত অনলে নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইয়া মারিবেন। এক কথায় আমির যুদ্ধ জয়ের পর মৃত দেহ, ভস্মস্তূপ ও অস্থির সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই পাইবেন না।"

আমির সবক্তগীন এই সংবাদ প্রাপ্তে পুত্রকে পরামর্শ দিয়া, রাজা জয়পালের সহিত যুদ্ধে বিরত করিলেন। তৎপরে যে সন্ধি হইল তাহাতে

জয়পাল দশলক্ষ দেরহাম দিতে স্বীকৃত হইলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশটী উৎকৃষ্ট হস্তী ও তাঁহার রাজ্য মধ্যস্থ কতকগুলি নগর ও দুর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরের সময় স্বীকৃত অর্থের কিয়দংশ প্রদান করিয়া, রাজা জয়পাল অবশিষ্ট অর্থ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রাজধানী ভাতেন্দা নগরে ফিরিয়া আসিয়া রাজা, কুপরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন না।

অতঃপর আমির ক্রোধান্ধ হইয়া পুনরায় জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিলেন ও প্রথমতঃ লাম্‌ঘান হস্তগত করিয়া বহু নগরবাসিকে তরবারির মুখে নিপাত করিলেন। তৎপরে আমিরের সেনাগণ নগর লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিল ও গৃহে অগ্নি সংযোগ করিল, এবং দেবালয় সকল ধ্বংস করিল। এই সময়ে অনেক পৌত্তলিক পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়া প্রাণ ও ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিল। লাম্‌ঘান পতনের পর সবকৃতগীন আরও অনেক নগর অধিকার করিয়া ও পৌত্তলিকগণের দেব মন্দির লুণ্ঠন করিয়া, বিস্তর ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

জয়পাল তাঁহার সামন্ত রাজগণের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে, বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে এক লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমির সবকৃতগীন এই সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া নিকটবর্ত্তী একটী পাহাড়ে আরোহণ করিলেন ও তথা হইতে এই মেষ-পালের ন্যায় অগণিত ক্ষুদ্র কৃষ্ণকায় হিন্দু সেনাগণকে পর্ব্বত নিম্নে বিচরণ করিতে দেখিয়া, নেকড়ে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদানে তাহাদের উপর

পতিত হইতে তাঁহার দারুণ আগ্রহ জন্মিল। তিনি তখন মোসলেম সৈন্য-গণকে যুদ্ধার্থে বজ্র-গম্ভীর-স্বরে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

অল্পকাল মধ্যে আমির তাঁহার অত্যল্প সংখ্যক সৈন্য মধ্য হইতে, এক এক দলে মাত্র পাঁচশত বীর বাছিয়া লইয়া, তাহাদিগকে গদা হস্তে শত্রু-গণকে আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এই প্রকারে একদল সৈন্য ক্লান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, আবার নূতন একদল তাহাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিল। ক্রমে এই অভিনব আক্রমণের ফলে, হিন্দু সেনাগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তখন যুদ্ধকৌশল-বিশারদ সুকৌশলী সবক্তগীন, তাঁহার এই অল্পসংখ্যক সৈন্য একত্রিত করিয়া শত্রুগণের উপর ভীষণ বেগে পতিত হইলেন। এই মুষ্টিমেয় আফ্‌গান সৈন্যের বেগ সিন্ধুবারিবৎ ভারতীয় অসংখ্য সৈন্যগণ সহ্য করিতে পারিল না; আফগানের বজ্র-মুষ্টিধৃত শাণিত তরবারির তলে ক্ষুদ্রাবয়ব হিন্দু সৈন্যগণের দেহ ভূলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

এই সময় যুদ্ধক্ষেত্রের যে অবস্থা দাঁড়াইল, তাহাতে তরবারি ভিন্ন অন্য কোন যুদ্ধাস্ত্রেরই ব্যবহার হইতে পারিল না। এবং তরবারির যুদ্ধে যে কোন একজন আফ্‌গান সেনার সমকক্ষ হইতে পারে, সমস্ত পৌত্তলিক সেনাগণের মধ্যে এমন এক প্রাণীও ছিল না।

অশ্ব ও পদাতিক সেনাগণের ঘন ঘন পদ সঞ্চালনে, প্রথমতঃ রণক্ষেত্র একটী বৃহদাকার ধূলি রাশির স্তূপ বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। পরে রক্ত মিশ্রিত হইয়া রণস্থলের ধূলি রাশি কর্দ্দমে পরিণত হওয়ায় ও চতুর্দ্দিকে খণ্ডিতদেহ-নিঃসৃত-রক্তধারা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর আকারে প্রবাহিত হইতে থাকায়, রণভূমির উপরিভাগ হঠাৎ পরিষ্কার হইয়া আসিল। তখন একজন জীবিত হিন্দু সেনাকেও আর রণক্ষেত্রে দেখা গেল না। চতুর্দ্দিকে কেবল কৃষ্ণকায় মৃত হিন্দু সৈন্যের স্তূপ।

রাজা জয়পাল ধৃত হইবার পর আমির, এই পরাজিত রাজবন্দির মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। এই সময়ে জয়পাল বিস্তর কাকুতি মিনতি সহকারে তাঁহার শিখা মাত্র অমুণ্ডিত রাখিয়া, উহার পরিবর্ত্তে তাঁহার দূর দূরান্তরের সমস্ত রাজ্য আমিরকে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। আমির সবকৃতগীন রাজার কাতরোক্তিতে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বহু ধনরত্ন, দাস-দাসী ও অগণিত হস্তী লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

পথে যাইবার কালে আমির তাঁহার একজন দশ হাজারি মন্‌সব্‌দারকে লাম্‌ঘান ও পেশ্‌ওয়ারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এবং পেশ্‌ওয়ারী ও খিলিজী বংশের বহু সৈন্য লইয়া, নিজ সেনাদল বৃদ্ধি করিতে করিতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৎপরে আমির সবকৃতগীন তাতার দেশে শান্তি স্থাপন করিতে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া আর হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেন নাই। হিজরী ৩৮৭ সালে ৫৬ বৎসর বয়সে বালখ্‌ নগরের বাবুমাল পল্লীতে সবকৃতগীনের মৃত্যু হয়।

আমির সবকৃতগীনের হিন্দে এই মহা বিজয়ের ফলাফল শ্রবণে আনন্দিত হইয়া, বাগ্‌দাদের খলিফা আমিরুল মোমেনীন কাদের বিল্লাহ্‌ তাঁহাকে সোল্‌তান সফিউদ্দৌলা খেতাব ও তৎসঙ্গে মূল্যবান খেলআত্‌ উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন। এই সঙ্গে মহাতেজস্বী মাহমুদ-বেন্‌-সবকৃতগীনকে, ইয়ামিনদ্দৌলা আমিনল্‌-মেল্লাত উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন রাজা বা রাজ-পুত্রের প্রতি বাগ্‌দাদ হইতে এরূপ সম্মানের উপাধি প্রদত্ত হয় নাই।

সোলতান সবকৃতগীন তাঁহার সমস্ত সামন্ত নরপালগণকে ও খোরাসানের শাসনকর্ত্তাকে গজনীর দরবারে আহ্বান করিয়া খলিফা-প্রদত্ত এই

খেল্‌আত্‌ পরিধান করিলেন; এবং আল্লাহ্‌-তাআলার প্রেরিত মহাপুরুষের পরবর্ত্তী সিংহাসনাধিকারী খলিফার অধীনস্থ হইয়া থাকিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। আমির এই সঙ্গে দরবারে উপস্থিত রাজন্যবর্গকে উপযুক্ত উপাধি ও খেল্‌আত্‌ দানে পরিতুষ্ট করিয়া, প্রতিবৎসর পৌত্তলিক দেশে সত্যধর্ম্ম প্রচারার্থে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

অষ্টম সর্গ

মহাবীর সোলতান মাহ্মুদ—

আমির আলপ্তগীনের রাজত্ব কালে তদীয় সৈন্যাধ্যক্ষ (পরে আমির) সবক্তগীন অনেক বার সিন্ধু নদী পার হইয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গুলি আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল অভিযানের মধ্যে হিঃ ৩৬১ খৃঃ ৯৭১ সালে একবার চিনাব (চন্দ্র ভাগা) তীরস্থ সদ্রা দেশে যুদ্ধাভিযান করিয়া তথায় উপস্থিত থাকা কালে অবগত হইলেন যে—১২ই রবিউল আউআল্ অর্থাৎ পরম পবিত্রাত্মা হজরত মোহাম্মদের জন্ম দিনে তাহার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রেরিত পুরুষের জন্ম দিনে পারশ্য দেশে ভূমিকম্প হইয়া পারশ্যের পরাক্রান্ত রাজা কাস্‌রার চতুর্দ্দশ খিলানযুক্ত সুরম্য দেবালয় ভূমিসাৎ হইয়াছিল। সেই সময় সবক্তগীনের ঐ কথা স্মরণ হওয়ায়, তিনি সদ্রাদেশের অনেক-গুলি দেবমন্দির ও প্রতিমা সেই দিন ধ্বংস করিয়া দিয়া, পুত্রের নাম মাহ্মুদ রাখিলেন।

হিঃ ৩৮৭ সালে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে এমিনদ্দৌলা নেজাম-উদ্দীন আবুল কাসেম সোলতান মাহ্মুদ, বাল্খ নগরে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাগ্দাদের খলিফা কাদের-বিল্লাহ তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে সোল্তান উপাধিতে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, সিংহাসনারোহণ-কালে সোলতান মাহমুদ পিতৃ অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া আজীবন

পৌত্তলিকগণের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিবেন ও সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

হিঃ ৩৯১ সালে মাহ্‌মুদ সসৈন্যে গজনী হইতে বহির্গত হইয়া পেশওয়ারে পৌছিলেন ও নগরের বাহিরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এইস্থানে সোলতান অবগত হইলেন যে—ঈশ্বরদ্রোহী রাজা জয়পাল তাঁহার গতির প্রতিবন্ধকতা করিবার জন্য বহু সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া দ্রুতগতিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই স দে গজনীপতি তাঁহার সৈন্য মধ্য হইতে দশ সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী স ভব্যাকারে খোদা-তাআলার নাম লইয়া, বিপক্ষের দ্বাদশ সহস্র অশ্বা হী, ত্রিংশ সহস্র পদাতিক, তিন শত হস্তী ও সৈন্য আক্রমণ করিলেন। ধার্ম্মিক-প্রবর মাহমুদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে—ঈশ্বরের অনুগ্রহ পা লে তাঁহার অল্প সেনা শত্রুর বিপুল বাহিনীকে অল্পক্ষণ মধ্যে বিদ্ধস্ত করি সক্ষম হইবে।

জয়পাল সেই সময় তাঁহার সৈন্যগণকে ইয়া, অধীনস্থ করদ ও মিত্র রাজন্যবর্গের সেনাগণের সহিত মিলিত বার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় দুর্দ্ধর্ষ মোস্‌লেম সেনাদল তরবারি ও ভল্ল হস্তে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

হিন্দু সেনাগণ রণভেরী নিনাদে তাহাদের অশ্ব ও মাতঙ্গ গুলিকে উৎসাহিত করিতে লাগিল এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একের পর অপর শ্রেণী ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে অসংখ্য সেনায় গোল পাকাইয়া এরূপ আকার ধারণ করিল যে—শেষে আপন দলের নিক্ষিপ্ত শরে আপনারাই বিদ্ধ হইতে লাগিল। এই কৃষ্ণ বর্ণের হিন্দু সৈন্য ব্যূহ মধ্যে সর্ব্বত্রই এস্‌লামের তরবারি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা বিকীর্ণ করিতে দেখা যাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিধর্ম্মীগণের রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল।

অচিরে মোস্‌লেম সেনাগণ অবশিষ্ট ঈশ্বরদ্রোহীগণকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতে কৃতকার্য্য হইল। এই দিবস বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই তুর্ক ও আফ্‌গান সেনাগণ অন্যূন পঞ্চদশ সহস্র পৌত্তলিকগণকে তরবারি ও ভল্লাঘাতে হত্যা করিয়া তাহাদের দেহ শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষনের জন্য রণস্থলে ছড়াইয়াছিল। এই যুদ্ধে জয়পালের ১৫।১৬টী রণহস্তী মোসলেম্‌ বীরগণের বজ্রমুষ্টিধৃত তরবারির আঘাতে শুণ্ড কর্ত্তীতাবস্থায় যন্ত্রণায় রণস্থলে দৌড়াদৌড়ি করিয়া শেষে মৃত্তিকায় শয্যা গ্রহণ করিল।

রাজা জয়পাল তাঁহার পুত্র কন্যাগণ ও ভ্রাতুস্পুত্রাদি সহ বন্দী হইলেন; তাঁহাদিগকে একসঙ্গে দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া সোলতান সমীপে লইয়া যাওয়া হইল। জয়পালের গলদেশ হইতে ন্যূন পক্ষে দুই লক্ষ দিনার মূল্যের বৃহদায়তন মুক্তা ও মধ্যে মধ্যে অতি মূল্যবান প্রস্তর খচিত সুবর্ণ হার খুলিয়া লওয়া হইল।

পরমেশ্বরের সহায়তায় হিঃ ৩৯২ সালের ৮ই মোহাররম ১০০১ খৃঃ ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার, সোলতান মাহ মুদ খোরাসান অপেক্ষা বৃহদায়তন ও উর্ব্বরা হিন্দুস্থানের একটী প্রদেশ জয় করিয়া বহু বন্দী ও বন্দিনী সহ নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই মহা বিজয়ের, পর সোলতান, বিধর্ম্মী ঈশ্বরদ্রোহী জয়পালকে বন্ধনাবস্থায় সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করাইয়া ও সেই সঙ্গে চতুর্দ্দিকে এস্‌লামের তরবারির তেজ বিকীর্ণ করিয়া, পরে রাজা জয়পালকেই তাঁহার হারান সিংহাসনে বসাইলেন। করদ রাজা জয়পালের সহিত গজ্‌নী অধিপতির সেই সময় যে সন্ধি হইল, তাহার সমুদয় সর্ত্ত অনুযায়ী কার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত, রাজার পুত্র ও পৌত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ আবদ্ধ রাখিবার জন্য, সোলতান সঙ্গে করিয়া রাজধানীতে লইয়া গেলেন।

অল্পকাল মধ্যে রাজা জয়পাল, সোলতানের আদেশ অনুযায়ী তাঁহার সন্ধি সূত্রে স্বীকৃত হস্তী, ও ধন-রত্ন, স্বীয়-পুত্র আনন্দপালের (যিনি তৎ-কালে সিন্ধু নদের পরপারে রাজত্ব করিতেন) নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া গজনীতে প্রেরণ করার পর—সোলতান মাহ্‌মুদ রাজার পুত্র ও পৌত্রকে অব্যাহতি দিলেন।

দ্বিতীয় অভিযান

পর বৎসর সোলতান সংবাদ পাইলেন যে, হিন্দুগণ তাঁহার রাজ্যের সীমায়, উপত্যকা ও অরণ্য মধ্যে গোপনে সমবেত হইয়া মোসল্‌মানগণকে আক্রমণ করিবার চেষ্টায় ক্রমশঃ দলবদ্ধ হইতেছে। এই সংবাদে মাহ্‌মুদ বিচলিত হইয়া তাঁহার সেনা মধ্য হইতে বাছিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ওয়াহিন্দ নগরাভিমুখে তাহাদের দমনার্থে প্রেরণ করিলেন। অচিরে মোসলেম অশ্বারোহীগণ তাঁহাদের তরবারির বল প্রদর্শনে সমবেত পৌত্তলিকগণকে কতক ধ্বংস করিয়া ও অবশিষ্ট পার্ব্বতীয় ছাগবৃন্দের ন্যায় তাড়াইয়া দিয়া, ওয়াহিন্দ দেশ অধিকার করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সোলতানের নিকট এই বিজয়-বার্ত্তা প্রেরিত হইল।

তৃতীয় অভিযান

৩৯৫ হিঃ ১০০৪।৫ খৃষ্টাব্দে সোলতান মাহ্‌মুদ সিন্ধু পার হইয়া ভাটিয়া রাজ্যের দিকে সৈন্য চালনা করিলেন। রাজা বাজিরাও সেই সময় ভাটিয়া রাজ্যের পরাক্রান্ত অধিপতি ছিলেন। তাঁহার রাজধানীর চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এবং তৎসহ গভীর বিস্তৃত পরিখা দ্বারা সুবেষ্টিত থাকায়, তৎকালীন লোকের ধারণা ছিল যে—যতই বলবান শত্রু হউক না কেন, এই দুর্গম 'ভাটিয়া' রাজধানী মধ্যে কোনমতে প্রবেশ করিতে

পারিবে না। রাজধানী ধনৈশ্বর্য্যে ও প্রচুর সুশিক্ষিত সেনা এবং সামরিক নানাপ্রকার যুদ্ধাস্ত্রে পরিপূর্ণ থাকায়, রাজা বাজিরাওয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে—তাঁহার রাজ্য কখনও পর হস্তগত হইবে না। এই বিশ্বাসেই রাজা নগরদ্বারের বাহিরে আসিয়া মোস্‌লেম সেনাগণকে আক্রমণ করিলেন।

রাজার সৈন্যগণের সহিত একদল বলশালী সুশিক্ষিত যুদ্ধ হস্তী ছিল। তিনদিন ধরিয়া দিবারাত্রি হিন্দু-মুসলমানে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। চতুর্থ দিবসে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত অসি ও শর যুদ্ধের পর, সোলতান মাহমুদ তাঁহার ওজস্বী ভাষায় সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া, বীর দর্পে "আল্লাহোআকবর" বলিয়া রণোল্লাসের সহিত সম্মুখস্থ অলীকবাদী পৌত্তলিকগণকে আক্রমণ করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ আফগান্‌গণের বজ্র-মুষ্টি ধৃত তরবারির আঘাতে দুর্ব্বল খর্ব্বাকায় কৃষ্ণবর্ণের হিন্দু সৈন্যগণ মৃত্তিকা চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় মহা পরাক্রমশালী সোলতান মাহ্‌মুদকে যুদ্ধক্ষেত্রে উল্কাবৎ চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া, তাঁহার সম্মুখে বামে দক্ষিণে বর্ম্ম পরিহিত বিধর্ম্মীগণকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত ও বর্শাবিদ্ধ করিয়া, তাহাদের যুদ্ধ তৃষ্ণা চিরকালের মত মিটাইয়া দিতে দেখা গিয়াছিল। এই যুদ্ধে রাজা বাজিরাওয়ের প্রধান সহায় তাঁহার বিস্তর যুদ্ধহস্তী নিহত হইল। শেষে মোস্‌লেম শক্তির নিকট পরাভূত হইয়া রাজার অবশিষ্ট সৈন্য পশ্চাৎপদ হইল ও পরিখা এবং উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত নগর মধ্যে আশ্রয় লইয়া প্রকাণ্ড লৌহদ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

রণোন্মত্ত ধার্ম্মিক সৈন্যগণ অল্পকাল মধ্যে কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা দ্বারা পরিখা পরিপূর্ণ করিয়া, তাহার উপর দিয়া কতকগুলি সৈন্য প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া, বীর হুঙ্কারে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনে নগরে প্রবেশ করিয়া লৌহদ্বার উন্মোচন করিয়া দিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় মোস্‌লেম যোদ্ধাগণ নগরে প্রবেশ করিল।

রাজা এই অবস্থা দেখিয়া কতকগুলি অনুচরসহ গোপনে পলায়ন করিয়া পার্ব্বতীয় অরণ্য মধ্যে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সোলতানের একদল সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অনুচরগণসহ রাজাকে ঘিরিয়া ফেলিল। বাজিরাও অনন্যোপায় হইয়া ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করিলেন।

এই সময় মোস্‌লেম সেনাগণ নগর অধিকার করিয়া তন্মধ্যে লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। যুদ্ধাবসানে মাহ্‌মুদ দুই শত আশিটী হস্তী, বহু ধনরত্ন এবং দাসদাসী লইয়া গজনী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফিরিবার কালে পথে বর্ষার জন্য তাঁহাকে সৈন্য লইয়া অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল।

চতুর্থ অভিযান।

হিঃ ৩৯৬ সালে সোলতান মাহ্‌মুদ মুলতানের শাসনকর্ত্তা আবুল-ফতুহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মুলতানাধিপতি এই সময় স্বাধীন হইবার জন্য উস্‌খুস্ করিতেছিলেন; এমন কি তাঁহার রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছিল। এই দারুণ অবাধ্যতার অপ্রিয় সংবাদ সোলতানের নিকট পৌঁছিবামাত্র, তিনি বর্ষায় সমুদয় নদনদীর জলাতিশয্যের বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া মুলতানাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পথে জয়পালের পুত্র আনন্দপালের রাজ্যের উপর দিয়া সৈন্য চালনা করিয়া আসিবার জন্য মাহ্‌মুদ তাঁহার অনুমতি চাওয়ায়, রাজা আনন্দপাল তাহাতে সম্মত না হইয়া বরং মোস্‌লেম সেনাগণের অগ্রসরে বাধা প্রদান করিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত মাহ্‌মুদ জয়পাল পুত্রের ব্যবহারে রাগান্ধ হইয়া প্রথমতঃ তাঁহাকেই আক্রমণ করিলেন। রায় আনন্দপাল পরাজিত হইয়া

পর্ব্বতে ও অরণ্যমধ্যে অনুচরসহ আশ্রয় লইলেন। মোসলেম সেনাগণ তখন তাহাদিগকে মেষপালের ন্যায় তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে আনন্দপাল কাশ্মীর প্রান্তের অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মুলতানাধিপতি আবুল-ফতুহ তাঁহার অপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজার এই দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার সমুদয় ধনৈশ্বর্য্য ও মণি-মাণিক্য, কয়েকটী হস্তীর পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া রাজ্য পরিত্যাগে সরন্দিপের দিকে পলায়ন করিলেন। সহজেই মুলতান রাজ্য সোলতানের হস্তগত হইল।

এই অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে সোলতান শুনিতে পাইলেন যে—বল্‌খের শাসনকর্ত্তা ইলাক্ খাঁন, জাইহুন নদী পার হইয়া স্বীয় এলাকার বাহিরে আনুমানিক পঞ্চাশ সহস্র সেনা সমাবেশ করিয়াছেন। সংবাদ পাইয়াই মাহ্‌মুদ তাঁহার অধীনস্থ তুর্ক, ভারতীয়, আফ্‌গান ও গজ্‌নীর সৈন্য লইয়া ইলাক্ খাঁনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন ও অচিরে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্থ করিলেন।

পঞ্চম অভিযান

হিঃ ৩৯৮ সালে জগৎ বিখ্যাত বীর মাহ্‌মুদকে, অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা সেবক পালকে শিক্ষা দিবার জন্য পঞ্চমবার ভারতে আসিতে হইয়াছিল। মুলতান অধিকার করিয়া তথা হইতে ইলাক্ খাঁনের বিদ্রোহ দমনার্থে যাইবার কালে সোলতান, রাজা জয়পালের পৌত্র সেবক পালকে তাঁহার ভারত রাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আবু-আলী-সান্‌জারী, সেবক পালকে পেশাওয়ারে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া মোসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার নাম "নওয়াসা সাহ" রাখিয়াছিলেন।

এক্ষণে সোলতান অবগত হইলেন যে—তাঁহার অধীনস্থ উক্ত নওয়াসা সাহ্ পবিত্র এস্লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দান করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া সোলতান ভারতে আসিয়া সেবক পালকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত ধন সম্পত্তি সোলতানের সমভিব্যাহারি সেনাগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইল, এবং তদবধি নওয়াসা সাহ্ যাবজ্জীবন বন্দী হইয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ আক্রমণ

পরবর্ত্তী বৎসর ১০০৮ খৃষ্টাব্দে ৩৯৯ হিজরী রবিওল-আখের মাসের শেষ দিনে, সোলতান মাহ্মুদ পুনরায় ভারত আক্রমণে বহির্গত হইলেন। সিন্ধু নাদের পূর্ব্ব তীরে, সমুদ্র তীর হইতে একশত মাইল উত্তরে সুপ্রসিদ্ধ নগরকোট দুর্গ এই বার তাঁহারল ক্ষ্য স্থান ছিল।

এই সময়ে রাজা আনন্দপাল কাশ্মীর প্রান্ত হইতে চলিয়া আসিয়া ভারতের সমুদয় রাজন্যবর্গের নিকট মোসলমানগণকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। হিন্দু রাজাগণও এই যুদ্ধে যোগদান করা পরম পবিত্র কর্ম্ম ও ধর্ম্মসঙ্গত বিবেচনায় আনন্দপালের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, দিল্লী ও আজমীরের রাজগণ এই ধর্ম্ম যুদ্ধে যোগদান করিবার ইচ্ছায় তাঁহাদের সমুদয় শক্তি একত্রিত করিয়া বিরাট বাহিনী সমভিব্যাহারে পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে এসলামের বিরুদ্ধে এত প্রবল শক্তি কখনও একত্রিভূত হয় নাই।

রাজা আনন্দপাল স্বয়ং এই বিশাল বাহিনী পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন ও ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে পেশাওয়ারের সমতল ভূমিতে গিয়া মোস্লেম সেনার সম্মুখীন হইলেন। এই স্থানে উভয় সৈন্য চল্লিশ

দিন শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। এই সময় মধ্যে কোন পক্ষই যুদ্ধার্থে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিল না।

ইত্যবসরে সোলতান তাঁহার অবস্থিতি স্থান চতুর্দ্দিকে পরিখা বেষ্টিত করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন ও অপর পক্ষে, ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে হিন্দু সৈন্য আসিয়া বিপক্ষ সৈন্যের কলেবর পুষ্টি করিতে লাগিল। এই সময়ে দূর দূরান্তর হইতে হিন্দু স্ত্রীলোকেরাও তাঁহাদের অলঙ্কার আদি বিক্রয় করিয়া এই মোস্‌লেম বিতাড়নের সাহার্য্যের জন্য হিন্দু রাজন্যবর্গ ও সেনাগণকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। এমন কি দরিদ্র হিন্দু নারীগণও সুতা কাটিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থে এই প্রকাণ্ড বাহিনীর যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

বিচক্ষণ যুদ্ধ নীতি বিশারদ মহা সেনাপতি সোলতান মাহ্‌মুদ, বিপক্ষের এই দৃঢ়তা ও অসম্ভব সংযোগের পরিচয় পাইয়া, এবার কোন ক্রমেই তাহাদিগকে প্রথমে আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তিনি তাঁহার ছয় সহস্র গোলন্দাজ সেনাগণকে, কেবল দূর হইতে শত্রুগণের উপর শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে উত্যক্ত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এই সময় সোলতান মাহমুদ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে—এই প্রকার শর নিঃক্ষেপে তিনি বিপক্ষগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ তাঁহার পরিখার নিকট আনিয়া ফেলিতে পারিবেন ও তৎপরে তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ সেনাগণের সাহায্যে তখন তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিতে কৃতকার্য্য হইবেন।

কিন্তু সোল্‌তানের এতাধিক সতর্কতা সত্বেও যখন ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল, সেই সময় ত্রিংশ সহস্র ৩০,০০০ সাহসী জাঠ্ যোদ্ধা অসীম সাহস প্রদর্শনে তাঁহার উভয় পার্শ্বের সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া, সোলতানের অশ্বারোহী সৈন্য মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিল। ইহারা দেখিতে

দেখিতে অল্পক্ষণ মধ্যে প্রায় তিন সহস্র মোস্‌লেম সেনা বিনাশ করিতে কৃতকার্য্য হইল। জাঠ্ সৈন্যগণ এই সময় এতদূর বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল যে—মহারথী মাহ্‌মুদকেও তাহাদের অসির সম্মুখ হইতে ক্ষণকালের জন্য পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছিল।

এই সময় মোস্‌লেম সেনাগণের অব্যর্থ লক্ষ্য শর ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবাণ নিঃক্ষেপে হিন্দু সেনাপতি আনন্দপালের হস্তী ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া পালাইতে থাকায়, পৌত্তলিকগণ উহা প্রধান সেনাপতির পৃষ্ঠ প্রদর্শন অনুভব করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইতে লাগিল। অধিকন্তু—ইতিপূর্ব্বে যে সকল জাঠ্ সেনা মোস্‌লেম ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহাদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের এক প্রাণীকেও আর ফিরিতে হইল না।

আবদুল্লা-তাঈ পাঁচ সহস্র আরব অশ্বারোহী সেনা লইয়া এবং আর্শলান্ জাজির দশ সহস্র তুর্কি, আফগান ও খিলিজী যোদ্ধার সহিত একাধিক্রমে দুই দিন ও পূর্ণ দুই রাত্রি ধরিয়া হিন্দু সেনাগণের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং অন্যূন আট সহস্র শত্রু সেনা বিনাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে অনুগমনকারী সেনাপতিদ্বয় যে সমস্ত ধনসম্পত্তি অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা উভয়েই সোলতান সমীপে উপস্থিত করিলেন।

এদিকে সোলতান মাহ্‌মুদ স্বয়ং পলায়িত প্রধান দলের অনুসরণ করিয়া, নগর-কোটের ভীমনগর নামক সংরক্ষিত দুর্গ প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীমনগর দুর্গ তৎকালে চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত উচ্চ পর্ব্বতোপরিস্থিত একটী অতি সুদৃঢ় পার্ব্বতীয় দুর্গ ছিল। ভারতের বহু নৃপতি, এবং পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও ধনশালী লোকসমূহ, তাহাদের যাবতীয় মূল্যবান রত্নরাজি এই দুর্গে রক্ষা করিয়াছিলেন। দুর্গমধ্যস্থ প্রকাণ্ডাকার বিগ্রহের মনস্তুষ্টিকল্পে

তাঁহারা বহু অলঙ্কার ও রত্ন এই প্রস্তরময় দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণও করিয়াছিলেন।

সোলতান মাহ্‌মুদ মনে ভাবিলেন যে—দেব মন্দিরের এই বহুকাল সঞ্চিত রত্নরাজি এবং দুর্গ মধ্যস্থ কাক পক্ষীদের—(মোসল্‌মানগণ সেই সময়ে কৃষ্ণকায় ভারতীয় হিন্দুদিগকে বায়স পক্ষীর সহিত তুলনা করিতেন ও ঐ নামে তাহাদিগকে অভিহিত করিতেন। "হিন্দু" শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় জাতীবাচক বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু শব্দটী পারশিক শব্দ, এবং ঐ পারশিক ভাষায় ইহার অর্থ কৃষ্ণবর্ণ ও তস্কর। পারস্য, তাতার, তুর্কিস্থান প্রভৃতি দেশের সুন্দর পুষ্টকায় গৌর বর্ণের মোস্‌লেম সেনাপতি ও সৈন্যগণ ভারতে আসিয়াই সর্ব্ব প্রথমে এই খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণকায় লোক দেখিতে পাইয়া, ঘৃণার সহিত উহাদিগকে এই "হিন্দু" নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। কালে ঐ ঘৃণাবাচক বিশেষণটী গৌরবের জাত্যাভিমান সূচক পদে পরিণত হইয়াছে। (আবু-নাসার্‌ আল্‌ উত্‌বী কৃত তওয়ারিখ-এ ইয়ামিনী।—এই সংরক্ষিত ধনরত্ন বহন করিতে নিশ্চয় তাঁহার উষ্ট্রের পৃষ্ঠ ভগ্নপ্রায় হইবে। একারণ সোলতান এই ভীমনগর দুর্গ আক্রমণ করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে দুর্গাবরোধ করিলেন।

পর্ব্বত-নিম্ন হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর, বর্ষায় বারিপাতের ন্যায় দুর্গাভ্যন্তরে পতিত হইতে লাগিল, তৎসঙ্গে অমিততেজাঃ মোস্‌লেম বীরগণকে পর্ব্বত গাত্র ছাইয়া ফেলিতে দেখিয়া দুর্গরক্ষী সেনাগণ ভীত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। তাহারা দুর্গ দ্বার খুলিয়া দিয়া "বাজপক্ষী সমক্ষে চটকের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া" মোস্‌লেম সেনাগণের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে লাগিল।

রণবিজয়ী সোলতান মাহ্‌মুদ হিন্দু সেনাগণের কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্

করিয়া, জুজ্জানের শাসনকর্ত্তা আবু নসর আহমদের সহিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও দুর্গমধ্যে সংরক্ষিত সমুদয় রত্নরাজি অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। যে রাশিকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যস্তূপ তাঁহার হস্তগত হইল, সোলতান উহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার প্রধান গৃহাধ্যক্ষ আলতা-তান্‌শ ও আসিখ্‌তিগীনের উপর ন্যস্ত করিয়া, বহুমূল্য মণিমুক্তাগুলি লইয়া স্বীয় অধিকারে রক্ষা করিলেন।

এই অভিযানে সোলতান এতাধিক ধনরত্ন ও স্বর্ণ রৌপ্য পাইয়াছিলেন যে—রাজকোষে প্রেরণার্থে বহু উষ্ট্র পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়াও যাহা উদ্বৃত্ত রহিল, তাহা তিনি দুই হস্তে সৈন্যগণের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিতরণ করিয়া হস্তের সার্থকতা উপলব্ধি করিলেন। যে পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা তাঁহার হস্তগত হইল, তাহার মূল্য দারহাম হিসাবে সত্তর কোটীরও অধিক হইবে। সোল্‌তান বিস্তর স্বর্ণ ও রৌপ্যের থান (খামি) পাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুমূল্যবান সূক্ষ্ম ও সুদৃশ্য রেশমী বস্ত্র সকল যাহা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, সেরূপ সুদৃশ্য বস্ত্র তাঁহার সেনামধ্যে কেহ পূর্ব্বে কখন অবলোকনও করে নাই।

লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে একটী রৌপ্য নির্ম্মিত প্রকাণ্ড গৃহ সোলতানের হস্তগত হয়। গৃহটীর দৈর্ঘ ৬০ হস্ত ও প্রস্থ ৫০ হস্ত পরিমাণ ছিল। এবং তাহার নির্ম্মাণ কৌশল এরূপ ছিল যে—ঘর খানির সমস্ত অংশ খুলিয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া গিয়া, পরে ইচ্ছামত যে কোন স্থানে উক্ত গৃহটী অতি সহজে পুনঃ স্থাপন করা যাইত। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত ছিদ্রশূন্য স্তম্ভসমূহের উপর স্থাপিত ৮০ হস্ত লম্বা ও ৪০ হস্ত প্রস্থ একটী অতীব সুন্দর বহুমূল্য চন্দ্রাতপ গজনীধিপতি ভীমনগর দুর্গ হইতে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

গজনী নগরীতে পৌঁছিয়া সোলতান মাহ্‌মুদ তাঁহার প্রাসাদ অঙ্গনে

একখানি বহুমূল্য সুদৃশ্য গালিচা বিছাইয়া, তদোপরি ভারতের সমুদয় রত্নরাজি বিস্তৃত করিয়া দিলেন। এই সময়ে গজনীর অধীনস্থ রাজন্যবর্গ ও অপরাপর দেশের রাজদূত সকল এবং স্বাধীন তুর্কিস্থানের রাজা তাঘানখাঁনের দূত প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ভারত মন্থিত এই সমুদয় উজ্জ্বল বৃহদায়তন মুক্তা, নির্ম্মল বিশুদ্ধ আভাযুক্ত চুণি-পান্না-নীলা এবং জ্যোতিষ্মান্ হীরক সকল দেখিয়া চক্ষু স্বার্থক করিলেন ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

এই বিখ্যাত মহা বিজয়ের সংবাদ পাইয়া, বাগ্‌দাদের খলিফা কাদের বিল্লাহ্, আমীর মাহ্‌মুদ-বেন-সবক্তগীনের প্রতি "সোলতান" আখ্যা প্রদান করিলেন।

নবম আক্রমণ

৪০৪ হিঃ ১০১৩ খৃষ্টাব্দে সোলতান মাহ্‌মুদ ভারতের কুসংস্কারাবিষ্ট দেবমন্দির ধ্বংস সাধন করিয়া পৌত্তলিকতার যথাসম্ভব উচ্ছেদ করণোদ্দেশ্যে, বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে নবমবার ভারত আক্রমণ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে সিন্ধু রাজের নিকট হইতে সোলতান, তাঁহার ভারত আক্রমণ নিবারণের উৎকোচ স্বরূপ বাৎসরিক পঞ্চাশটী উৎকৃষ্ট হস্তী ও তৎসহ হিন্দুস্থানের উৎপন্ন কারুকার্য্য খচিত সুদৃশ্য রেশমী বস্ত্র ও দুই সহস্র যুবক হিন্দু যোদ্ধা পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। সিন্ধুরাজ সেই মত কিছুদিন সোলতানের নিকট হিন্দু সেনাসহ ঐ সমস্ত অঙ্গীকৃত দ্রব্য পাঠাইয়াও দিয়াছিলেন।

প্রতি বৎসর এই দুই সহস্র হিন্দু যোদ্ধা ইচ্ছাপূর্ব্বক মোসলমানগণের সহিত যোগ দিয়া তাহাদের বেতন ভুক্ত সেনা হইয়া থাকা ও তাহাদেরই আদেশে স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতে, তৎকালীন

হিন্দুদিগের স্বদেশ প্রেমিকতা ও স্বধর্ম্মে আস্থার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাহ্‌মুদের এই নবম অভিযানে প্রথমতঃ তাঁহাকে সৈন্য লইয়া হিন্দুস্থানের প্রবেশ পথে অতিশয় বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। এই সময় পর্ব্বতে এতাধিক তুষার পাত হইয়াছিল যে, কিছুদিন ধরিয়া চতুর্দ্দিক বরফাচ্ছন্ন হইয়া থাকায় পথ চেনা বিশেষ দায় হইয়া পড়িল। অগত্যা অতি কষ্টে এই বরফরাশির উপর সোলতান মাহ্‌মুদকে সসৈন্যে অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

তৎপরে মাহ্‌মুদ সমুদয় সৈন্য লইয়া গুজরাটের রাজধানী নাহ্‌রদিন (আন্‌হাল ওয়ারার নিকট) আক্রমণ করিলেন ও তাঁহার এই বিরাট বাহিনীর দক্ষিণাংশ স্বীয় ভ্রাতা সেনাপতি আমীর নসরের ও বাম ভাগ আরস্‌লানোল্‌ জেজিরের এবং পুরোভাগ প্রসিদ্ধ যোদ্ধা আবু-আবদুল্লা মোহাম্মদকে তাঁহার অধীনস্থ আরব অশ্বারোহী সেনাদলের সহিত রক্ষা করিতে দিয়া, স্বয়ং মহাসেনাপতি স্বরূপ সমস্ত মোস্‌লেম সৈন্যগণকে পরিচালন করিতে লাগিলেন।

এই বিপুল বাহিনীর মধ্যভাগের পর্ব্বত সম অচল অটল যোদ্ধাগণকে সোল্‌তানের দেহ রক্ষীগণের নেতা আলতন্‌তাশ চালনা করিতে লাগিলেন।

রাজা নিদার ভীম এই ব্যাপার দর্শনে ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া অধীনস্থ সৈনাধ্যক্ষগণকে ও রাজাদিগকে, তাহাদের সমস্ত সেনা লইয়া সমবেত হইতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ রাজধানী আন্‌হাল-ওয়ারার প্রান্ত দেশে সমবেত হইবার পর, রাজা এই বিশাল বাহিনী লইয়া একটী দুর্গম অপ্রশস্ত গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া পর্ব্বত পশ্চাতে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং পার্ব্বতীয় পথের প্রবেশ দ্বারে বৃহদায়তন হস্তী সকল রক্ষা করিয়া উহা অবরোধ করিয়া রাখিলেন।

রাজা মনে ধারণা করিয়াছিলেন যে, এই স্থান যেরূপ দুর্গম তাহাতে মোস্‌লেম সৈন্যগণ কোনমতে এই অপরিচিত অপ্রশস্ত গিরিবর্ত্ম দিয়া গিরি উপত্যকায় প্রবেশ করিতে পারিবে না; কিন্তু শেষে রাজা নিদারভীমের নিদ্রা ভাঙ্গিল, তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে—পরমেশ্বর ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করেন ও ঈশ্বরদ্রোহীদিগকে ধ্বংশ করেন।

এইস্থানে বুদ্ধদেবের একটী প্রকাণ্ড মন্দিরাভ্যন্তরে একখণ্ড প্রস্তর গাত্রে, ঐ মন্দিরটী পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত লেখা দেখিতে পাইয়া, সোল্‌তান মাহ্‌মুদ ইহার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, শেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর, এই দীর্ঘকাল যে অতিরঞ্জিত করিয়া লেখা হইয়াছে তাহা সাব্যস্ত হইল।

এই অভিযানে গজ্‌নী অধিপতি অনেক ভদ্রবংশীয় লোককে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শেষে ঐ সম্মানার্হ বন্দিগণকে গজনীর সাধারণ দোকানদারগণের নিকটে দাসবৃত্তি করিতে দেখা গিয়াছিল।

দশম অভিযান

থানেশ্বর।

৪০৫ হিজরীর প্রারম্ভে ১০১৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সোল্‌তান মাহ্‌মুদ সংবাদ পাইলেন যে—দিল্লী হইতে ৩০ মাইল উত্তরে থানেশ্বর রাজ্যে যুদ্ধকার্য্যে সাহায্যোপযোগী সিংহল দ্বীপের বিস্তর বৃহদাকার ঐরাবত সকল রক্ষিত আছে; এবং ঐ রাজ্য একজন ঘোর ঈশ্বরদ্রোহী জড়োপাসক রাজার রাজত্ব। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার এই দশম অভিযান এবার থানেশ্বরের প্রতিই ধাবিত হইল।

ইতিপূর্ব্বে পাঞ্জাব জয়ের পর সোল্‌তান, রাজা আনন্দপালকেই করদ রাজা স্বরূপ তাঁহারই সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া তাঁহার সহিত

সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকায়, এই অভিযানে তিনি আনন্দপালকে বলিয়া পাঠাইলেন যে—তাঁহার রাজ্যাভ্যন্তর দিয়া সৈন্য চলাচল করিলে তাঁহার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই; বরং এক্ষেত্রে মোস্‌লেম সেনাগণকে তাঁহার রাজ্যের সীমা অতিক্রম করাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ গজ্‌নীর সেনাগণের সমভিব্যাহারে থাকিলে, তাঁহার প্রজাগণের প্রতি কোনই অনিষ্টপাতের আশঙ্কা থাকিবে না।

রাজা আনন্দপাল এই প্রস্তাবে সম্মত ও সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় ভ্রাতাকে দুই সহস্র অশ্বারোহী সহ সোল্‌তানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, এবং মোস্‌লেম সেনাগণের আবশ্যকীয় সমুদয় খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন।

রাজার উপদেশ মতে তদীয় ভ্রাতা, সোলতান মাহ্‌মুদকে থানেশ্বরের মন্দির ধ্বংস না করিবার জন্য যথাসাধ্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। তিনি সোল্‌তানকে বুঝাইবার বিস্তর চেষ্টা করিলেন ও শেষে বলিলেন যে,—"দেবমন্দির ভগ্ন করা এস্‌লামের ধর্ম্ম সঙ্গত কার্য্য বলিয়া তদীয় রাজভ্রাতা নগরকোটের দুর্গ মন্দির ধ্বংসের সময় মহামান্য সোল্‌তানের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে হিন্দুদিগের এই মহাতীর্থ থানেশ্বরের মন্দির নষ্ট করিবার অভিলাষ ত্যাগ করিলে, রাজা নিজে তৎপরিবর্ত্তে গজ্‌নী নগরীতে প্রতি বৎসর ৫০টী অতি বৃহৎ মাতঙ্গ ও তৎসহ যথাসম্ভব রত্নরাজী উপঢৌকন প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন; এবং থানেশ্বর রাজ্য সম্বন্ধেও তাঁহাকে কর দিয়া তাঁহার করদ রাজ্য মধ্যে পরিগণিত করিবার জন্য রাজার নিকট প্রস্তাব করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।"*

ধর্ম্মপ্রাণ মাহ্‌মুদ উত্তর দিলেন:—

"আমি খোদাতাআলার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া ভারতবর্ষ হইতে

পৌত্তলিকতা উচ্ছেদ করিবার ব্রতে ব্রতী হইয়াছি; এমতাবস্থায় কি প্রকারে থানেশ্বরের দেবমন্দির রক্ষা করিতে পারি!"

গজ্‌নীপতির এই উত্তর ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভাষ সঙ্গে সঙ্গে থানেশ্বর ও দিল্লীর পরাক্রান্ত রাজসমীপে প্রেরিত হইল। তিনিও অবিলম্বে ভারতের যাবতীয় রাজন্য-বর্গের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে—

মাহ্‌মুদ অকারণ বহু অহিন্দু সেনা লইয়া তাঁহার সংরক্ষিত হিন্দুর প্রধান তীর্থ থানেশ্বরের দেব মন্দির ভগ্ন করিতে আসিতেছেন। এই সাগর তরঙ্গের সম্মুখে সত্বর দৃঢ় প্রতিবন্ধক উপস্থাপিত করিতে না পারিলে ইহা সমস্ত হিন্দুস্থান প্লাবিত করিবে, এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত রাজ্যই ইহা অচিরে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অতএব সমস্ত হিন্দু শক্তি থানেশ্বরে কেন্দ্রীভূত হইয়া ইহার অপ্রতিহত গতির বাধা প্রদান করা ও হিন্দুধর্ম্মের এই ঘোরশত্রু চির নিপাত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজের এই ধর্ম্মডঙ্কা বাদ্যে হিন্দুস্থানের সকল হিন্দু রাজাই যথা সম্ভব সেনা ও রসদ সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্র থানেশ্বরে সমবেত হইতে লাগিলেন।

এদিকে মহাবল পরাক্রান্ত অতুল তেজঃ ধর্ম্মপ্রাণ মাহ্‌মুদ, এস্‌লামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া, পৌত্তলিকতা নির্ম্মূল করিবার মানসে, বহু সেনাসহ জলশূন্য মরুভূমি,—যাহাতে ইতিপূর্ব্বে কখনও মনুষ্য বা ঘোটকের পদচিহ্ন অঙ্কিত হয় নাই,—সেই ভয়াবহ মরুদেশ পার হইয়া আধুনিক পানিপথের নিকটবর্ত্তী থানেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।

তৎকালে যমুনা এই থানেশ্বরের পদধৌত করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। সোল্‌তান যেস্থানে নদী একটী গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া খরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অপর দিকে পৌত্তলিকগণ সম্মুখে বহু পর্ব্বতাকার কৃষ্ণকায় ঐরাবত সকল রক্ষা করিয়া

তৎপশ্চাতে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিল।

সোল্‌তান তাঁহার রণকৌশলজাল বিস্তার করিয়া, তাঁহার কতকগুলি সেনা নদীর দুইটী অগভীর স্থান পার হইয়া দুইদিক হইতে শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন; এবং তাহারা ঘোরতর যুদ্ধে নিযুক্ত থাকা কালে স্বয়ং, সমস্ত শক্তি লইয়া অবশিষ্ট বিপক্ষগণকে উভয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ভীষণবেগে আক্রমণ করিলেন।

মাহ্‌মুদের এই প্রচণ্ড আক্রমণের প্রতিবন্ধকতা করিবার ক্ষমতা দুর্ব্বল-হস্ত পৌত্তলিকগণের ছিল না, এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে মোস্‌লেম অসির নিকট সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত হইয়া হিন্দু সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া যে যেদিকে পাইল পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা তাহাদের এই সমস্ত সুশিক্ষিত হস্তীগুলি পশ্চাতে ফেলিয়া পলায়ন করিল। কেবলমাত্র একটী শিক্ষিত হস্তী পলাইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিল, তদ্ব্যতীত উহাদের রণহস্তীগুলি মোস্‌লেম সেনাগণ, সোল্‌তানের শিবিরাভিমুখে তাড়াইয়া লইয়া গেল।

এই যুদ্ধে পৌত্তলিকের শোণিত প্রবাহ এরূপভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল যে—রক্তে নদীর জল বিবর্ণ হইয়া গেল, এবং কয়েক দিবস পর্য্যন্ত উহা পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া রহিল। নিশাগমে পৌত্তলিক সেনাগণ পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করিতে সমর্থ না হইলে, এই যুদ্ধে এক প্রাণীরও ফিরিবার আশা থাকিত না। জগদীশ্বর তাঁহারই ধর্ম্মানুবর্ত্তীগণকে সর্ব্বত্র বিজয়ী করেন।

এই ঘোরতর যুদ্ধ জয়ের পর, ধর্ম্মপ্রাণ মাহ্‌মুদ, দেব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভারতের বহু পুরাতন বিগ্রহ জুগ্‌-সোমের মস্তক চূর্ণ করিলেন ও ঐ অবস্থায় পৌত্তলিকগণের এই কুসংস্কারের প্রস্তরস্তূপ গজনীর

জামের মস্‌জিদে সর্ব্বসাধারণ সত্যধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রতিনিয়ত উঠিবার সোপান স্বরূপ ব্যবহৃত হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য দেবমূর্ত্তি-গুলিও সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণীকৃত হইয়া ধরাবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

এই দেব মন্দিরে সোল্‌তান যে সমস্ত রত্নরাজী প্রাপ্ত হইলেন, তাহার মধ্যে একটী অকলঙ্ক বৃহদাকার মাণিক (চুণি) ছিল; যাহার ওজন তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ রত্ন ব্যবসায়ী হাজি মহম্মদ কান্দাহারী ৪৫০ মেস্কাল উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আয়তনে ও নির্ম্মাল্যে উহার তুল্য রত্ন তৎপূর্ব্বে মানব চক্ষু কখন দেখে নাই বা কর্ণে শুনে নাই।

থানেশ্বর করায়ত্ত করিয়া সোল্‌তান মাহ্‌মুদ দিল্লী আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ ওমরাহ্‌ ও সেনানীগণ, পাঞ্জাবে কোন মোসল্‌মান শাসনকর্ত্তার সুবন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত লাহোরের করদ রাজা আনন্দপালের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত নহে, প্রভৃতি নানারূপ যুক্তিপূর্ণ তর্ক ও উপদেশ দ্বারা সোল্‌তানকে তাঁহার আর অধিক অগ্রসর হইবার সংকল্প হইতে বিরত করিলেন। যাহা হউক আনন্দপাল, সোল্‌তানের এই অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, তাঁহার প্রতি সৌজন্য ও নম্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

থানেশ্বর জয় করিয়া ফিরিবার সময় মোসল্‌মান সেনাগণ অন্যূন দুই লক্ষ বন্দী নরনারী সঙ্গে লইয়া গেলেন। গজ্‌নী রাজধানীতে ঐ সকল হিন্দু বন্দী বন্দিনী রাজপথে বেড়াইবার সময়, উহাকে ভারতের কোন বৃহৎ নগর বলিয়াই অনুমিত হইত। সোল্‌তানের সামান্য সামান্য সেনারাও পর্য্যন্ত থানেশ্বর বিজয়ের পর, প্রত্যেকে অনেকগুলি করিয়া হিন্দু বন্দী বন্দিনী, গোলাম ও বাঁদি স্বরূপ তাহাদের নিজ নিজ অংশে পাইয়াছিল। (ফেরেস্তা)

একাদশ অভিযান।

মথুরা ও কান্যকুব্জ

একাদশ অভিযানে সুল্‌তান মাহ্‌মুদ, হিন্দু তীর্থ দেবমন্দির সমাকীর্ণ পৌত্তলিকগণের পরমারাধ্য, বিষ্ণুর পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা, এবং ব্রাহ্মণগণের মূল আবাস ভূমি কনোজ আক্রমণে বহির্গত হইলেন।

৪০৯ হিজরী রবিঅল-আখের ১০১৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে সোল্‌তান, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে উৎসুক মাত্র বিংশতি সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী লইয়া, খোদা-তাআলার নাম গ্রহণে গজনী পরিত্যাগ করিলেন। এই অভিযানে তিনি তিন মাসকাল অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে, একপ্রকার সাচ্ছন্দ্য ও নিদ্রার নিকট বিদয় গ্রহণে, পথে বহু পার্ব্বতীয় দুর্গ ধ্বংস করিতে করিতে আসিয়া, শেষে রাজা হরদৎ রায়ের প্রসিদ্ধ বরণ দুর্গ প্রান্তে (আধুনিক বুলন্দ সহরের সন্নিকটে) শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

সত্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের এই ধর্ম্মযুদ্ধে আগমন সংবাদ শ্রবণে, রাজা হরদৎ রায়ের ভয়ে উরু কম্পন আরম্ভ হইল। তিনি অনেক তর্ক বিতর্কের পর পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় "দশ সহস্র সঙ্গী-সহ সোল্‌তান সমীপে উপস্থিত হইয়া মোসলমান ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই স্থানে কয়েক দিবস বিশ্রামান্তে সোল্‌তান, কুলচাঁদের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজা কুলচাঁদ একজন পরম স্তাবক হিন্দু রাজা ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা ভিন্ন এই বিজয়ী মোস্‌লেম সৈন্যগণকে কোনমতে যুদ্ধে বিরত করা সম্ভবপর নহে বিবেচনা করিয়া

স্বীয় সৈন্য সম্ভার ও হস্তী আদি লইয়া অরণ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

গজনীধিপতি তাঁহার সৈন্যদিগের মধ্য হইতে অল্প সংখ্যক সৈন্য বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকে রাজা কুলচাঁদের অনুসরণে অরণ্য মধ্যে প্রেরণ করিলেন। অল্পকাল মধ্যে উহারা 'মহাবন' নামক অরণ্য-দুর্গ মধ্যে রাজ সৈন্যগণের সন্ধান পাইল। তখন মোস্‌লেম্ বীরগণ আল্লাহো-আক্‌বর রবে অরণ্য প্রতিধ্বনিত করিয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন ও তরবারি এবং বর্শাঘাতে ঈশ্বরোদ্রোহীগণকে ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন। শেষে হিন্দু সেনাগণ দুর্গপাদদেশ-বাহিনী খরস্রোতা যমুনা নদী পার হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ বন্দী হইয়া পড়িল, অবশিষ্ট জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইল।

এই যুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র হিন্দু যোদ্ধা মোস্‌লেম তরবারির মুখে ও জলমগ্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। রাজা কুলচাঁদ সস্ত্রীক হস্তী আরোহণে নদী পার হইবার সময় মোসলেম সেনাগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ধৃত হইবার প্রাক্কালে, তিনি একটী বৃহৎ ছুরিকা দ্বারা প্রথমতঃ স্বীয় সহধর্ম্মিনীকে স্বহস্তে হত্যা করিয়া, পরে নিজের বক্ষে ঐ তীক্ষ্ণাগ্র ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

এই যুদ্ধ জয়ে মাহ্‌মুদ ১৮৫টী রণহস্তী ও অনেক যুদ্ধাস্ত্র পাইয়াছিলেন।

অতঃপর সোল্‌তান হিন্দু তীর্থ মথুরা নগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেখিলেন বহু পুরাতন মথুরা চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত সুন্দর নগর; যমুনার দিকে তাহার দুইটী প্রকাণ্ড পুরদ্বার। নগরের উভয় পার্শ্বে অন্যূন এক সহস্র দেবমন্দির; এবং এই সমুদয়

প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দিরগুলির সর্ব্বাঙ্গে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া উহার প্রান্তভাগ রিভেট্ করণদ্বারা ঐ গুলি যথাসাধ্য সুদৃঢ় করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

নগরের মধ্যস্থলে একটী অতীব সুদৃশ্য বৃহদায়তন দেব মন্দির, যাহার সৌন্দর্য্য লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। সোলতান মাহ্‌মুদ স্বয়ং এই মন্দির সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে—শত কোটী স্বর্ণ দিনার ব্যয় ব্যতীত ও শতশত বহুদর্শী জ্ঞানী শিল্পিগণের দুই শত বৎসরের কঠিন পরিশ্রম ভিন্ন এইরূপ একটী মন্দির গঠিত হইতে পারে না।

এই প্রকাণ্ড সুদৃশ্য দেব মন্দিরাভ্যন্তরে পাঁচটী সুবর্ণ নির্ম্মিত দেব মুর্ত্তি রক্ষিত ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের উচ্চতাও দশ হস্ত পরিমাণ ছিল। একটী বিগ্রহের চক্ষু দুইটী, যে দুই খানি চুণি নির্ম্মিত ছিল, উহার প্রত্যেক খানির মূল্য পঞ্চাশ হাজার দিনারের কম নহে। অপর একটী মুর্ত্তির চক্ষু উজ্জ্বল রক্ত নীলা দ্বারা প্রস্তুত। সেই দুইখানি নীলার ওজন প্রায় ৪৫০ মেস্কাল হইয়াছিল। এই পাঁচটী স্বর্ণ বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া, সোল্‌তান মাহ্‌মুদ যে পরিমাণ উৎকৃষ্ট সুবর্ণ পাইলেন, তাহার ওজন ৯৮ হাজার তিন শত মেস্কাল হইল। এতদ্ভিন্ন মন্দির মধ্যে দুই শত রৌপ্যময় মুর্ত্তিও ছিল; কিন্তু সেইগুলি ভাঙ্গিয়া ওজন না করিয়া, ঐ অবস্থাতেই গজ্‌নীতে প্রেরিত হইল। বিগ্রহ ভগ্নের পর সোল্‌তান সমুদয় দেব মন্দিরগুলি প্রথমতঃ অগ্নি সংযোগে পোড়াইয়া দিতে ও তৎপরে চূর্ণ করিয়া ভূমিসাৎ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

মথুরা বিজয়ের পর সোল্‌তান তথা হইতে ১৫০ দেড় শত মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণস্থিত, গঙ্গা তীরবর্ত্তী ব্রাহ্মণপ্রধান কান্যকুব্জ রাজ্য আক্রমণের ইচ্ছা করিয়া, যাত্রার ফলাফল দেখিবার ইচ্ছায় ঈশ্বরোপাসনান্তে তাঁহার পবিত্র বাণী কোর্‌আন খুলিতেই, "ফতুহ্" শব্দের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত

হইল। এই "ফতুহ্" অর্থাৎ যুদ্ধ জয় শব্দে হঠাৎ গজনীপতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায়, তিনি পরমেশ্বর-দ্রোহী পৌত্তলিক ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করাই খোদাতাআলার অভিপ্রেত বিবেচনায়, অধিকাংশ সেনা মথুরায় রক্ষা করিয়া, অত্যল্প সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে কনোজরাজ কুঙার রায়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রাজা, পৌত্তলিকতার ধ্বংসকারী প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির আগমন বার্ত্তা পাইয়া, স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া ৮ই সাবান তারিখে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গা পার হইয়া, একজন অধীনস্থ রাজার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সময় সোল্তানের আগমনে নগরের অনেক লোক স্ব-ইচ্ছায় পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। মাহ্মুদ কনোজের সমুদয় দেবমন্দিরগুলি ভূমিসাৎ করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই নগরে সেই সময় ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় দশ সহস্র দেবমন্দির বিদ্যমান ছিল। নগরবাসিগণ তাহাদের নিত্য আরাধনা ও সাধনার ধন, এই বহু শতাব্দীর সযত্ন-রক্ষিত মূক ও বধির দেবমূর্ত্তিগুলির শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিবার ভয়ে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

এই স্থান হইতে মাহ্মুদ, ব্রাহ্মণগণের অধিকৃত অপর একটী দুর্গ, মুঞ্জ আক্রমণ করিলেন। প্রথমতঃ হিন্দু সেনাগণ তাহাদের সাধ্যমত বাধা প্রদান করিল। অবশেষে দুর্দ্ধর্ষ মোস্লেম সেনাগণের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল ও অনেকেই এস্লামের তরবারির তলে প্রাণ হারাইল।

অতঃপর সোল্তান একজন হিন্দু রাজাকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া, বহু সংখ্যক পৌত্তলিক বন্দী ও বন্দিনী এবং বিস্তর ধন-রত্ন ও স্বর্ণ-রৌপ্যাদি লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই অভিযানে গজনীধিপতি ভারত হইতে এতাধিক নরনারী সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন

যে——রাজধানীতে গিয়া শেষে উহারা দুই দেরহাম হইতে দশ দেরহাম মাত্র মূল্যে এক একজন বিক্রীত হইতে লাগিল। দূরবর্ত্তী মাওয়ার-আন্‌—নাহার, ইরাক ও খোরাসান হইতে দাস ব্যবসায়িগণ আসিয়া ভারতের এই অভাগ্য বন্দী ও বন্দিনীগুলিকে কিনিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের দেশ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল।

দ্বাদশ অভিযান।

হিঃ ৪১২ সালে গজ্‌নীপতি সংবাদ পাইলেন যে,—হিন্দুস্তানের কতকগুলি রাজা, কনোজ রাজের গজনীপতির বশ্যতা স্বীকারের জন্য তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজাকে নিহত করিয়াছে। এই সংবাদে সোল্‌তান পূর্ব্বপূর্ব্ব বারের অপেক্ষা অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার চির ঈপ্সিত ও রাজ সিংহাসন অপেক্ষা আনন্দ দায়ক, অশ্ব পৃষ্ঠস্থিত চর্ম্ম নির্ম্মিত জিনে আরোহণ করিয়া রাজধানী পরিত্যাগে ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন।

এইবার সোল্‌তান মাহ্‌মুদ লাহোরের পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তথাকার রাজা পৃথ্বীরাও জয়পাল, এই মোস্‌লেম বাহিনীর গতিরোধ করা সাধ্যাতীত দেখিয়া বুন্দলখণ্ডের প্রতাপান্বিত রাজা কালিঞ্জর রাজ নন্দের শরণাপন্ন হইলেন। দেখিতে দেখিতে আরও অনেক রাজা মোস্‌লেমগণের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য সসৈন্যে রাজা নন্দের সহিত যোগদান করিলেন।

মাহ্‌মুদ যমুনার তীরে আসিয়া দেখিলেন যে, নদীর অপর পার্শ্বে পৃথ্বীরাও জয়পাল, কালিঞ্জর রাজের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। উভয় সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী যমুনা নদীও তখন হাঁটিয়া পার হইবার উপযুক্ত নহে।

সোল্‌তান এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সেনাগণের প্রতি আর যমুনা পার হইবার অনুমতি দিলেন না।

রাত্রিযোগে গজনীপতির অজ্ঞাতে, তাঁহার দেহরক্ষী সেনা মধ্য হইতে মাত্র আটজন বীর, সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইল। তৎপরে এই অমিততেজা ধর্ম্ম উৎসাহে উৎসাহিত যুবকাষ্টক বীর হুঙ্কারে পৃথ্বীরাওয়ের সেনা-মধ্যে নিপতিত হওয়ায়, তাহারা অকস্মাৎ ভয়ে অনন্যোপায় হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা জয়পাল কোনমতে তাঁহার সেনাগণকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া ; শেষে কয়েক জন বিশ্বাসী সেনা সমভিব্যাহারে নিজেও পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। মোস্‌লেম যোদ্ধগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া নিকটবর্ত্তী বারী নগর পর্য্যন্ত পৌছিল, এবং ঐ নগর রক্ষীশূন্য দেখিয়া, তাহারা কতকগুলি দেবমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেব-মূর্ত্তি ধ্বংস করিয়া চলিয়া আসিল। (তরকতে-আক্‌বরি, নেজামদ্দীন, ফেরেশ্‌তা, উৎবী ও আবু রায়হান আল্‌-বিরুনী কৃত তারিখুল্ হিন্দ্‌)।

এই স্থান হইতে সোল্‌তান মাহ্‌মুদ কালিঞ্জর অভিমুখে গমন করিলেন। রাজা নন্দ এই মোস্‌লেম শক্তির অভ্যর্থনা করিবার জন্য ৩৬ হাজার অশ্বারোহী, এক লক্ষ পাঁচ হাজার পদাতিক এবং ছয় শত চল্লিশটী বিশালকায় যুদ্ধ মাতঙ্গ প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন।

সোল্‌তান প্রথমেই দূত প্রেরণে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজা নন্দকে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। রাজা তাঁহার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করতঃ, বরং তিনি—"খোদা-তা-আলার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত" এইরূপ সংবাদ দিয়া পাঠাইলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গজ্‌নীপতি একটী উচ্চ পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়া শত্রু সেনার অসংখ্যতা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হিন্দু সেনাগণের দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহার বীর হৃদয়ও ক্ষণেকের জন্য বিচলিত হইয়া উঠিল।

তখন তিনি, এই ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভের জন্য পরম করুণা নিদান খোদাতাআলার নিকট কায়মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ রাত্রি সমাগমে রাজা নন্দের প্রাণে যেন কোন দৈব শক্তি প্রভাবে দারুণ শঙ্কার সঞ্চার হইল ও তিনি গোপনে তাঁহার সমস্ত সৈন্য সম্ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মাত্র কয়েকজন দেহরক্ষী সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন।

পরদিবস প্রত্যুষে সৈন্যগণ রাজার হঠাৎ নিরুদ্দেশের কোন কারণ নিরূপণ করিতে সমর্থ না হইয়া, যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যে প্রকাণ্ড সেনা-নিবাস জনশূন্য হইয়া পড়িল। সোল্‌তান প্রথমতঃ ইহার ভিতর কোন সামরিক দুরভিসন্ধি নিহিত আছে বিবেচনায়, অভিনিবেশ সহকারে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ মানসে একাকী অশ্বারোহণে বাহির হইলেন। পরে ঐ স্থানের মৃত্তিকা নিম্নে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোন কৌশল-জাল রক্ষিত হয় নাই সিদ্ধান্ত করিয়া, স্বীয় সেনাগণের প্রতি লুণ্ঠনের আদেশ প্রদান করিলেন।

বিনা যুদ্ধে নন্দরাজার পাঁচ শত আশিটী উৎকৃষ্ট যুদ্ধ হস্তী ও অনেক রসদ মোসল্‌মানগণের হস্তগত হইল। সোল্‌তান ঈশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া এই সমস্ত লইয়া তথা হইতে গজ্‌নী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (তব্‌কতে আক্‌বরী)

ত্রয়োদশ অভিযান।

পর বৎসর ৪১৩ হিজরীতে সোল্‌তান সংবাদ পাইলেন যে—জালালা-বাদ ও পেশাওরের মধ্যবর্ত্তী কীরাত ও নূর নামক পার্ব্বতীয় দেশের অধিবাসিগণ দুরন্ত পৌত্তলিক এবং সেই সঙ্গে সিংহ উপাসক। তিনি তাঁহার স্বদেশের নিকটবর্ত্তী এই পৌত্তলিকগণকে পবিত্র একেশ্বরবাদিত্বের

উজ্জ্বল আলোক প্রদান করিবার জন্য মহাব্যস্ত হইয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। কীরাত রাজ অচিরে আনুগত্য স্বীকার করিয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রজাবৃন্দ সকলেই মোস্লেম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

তৎপর সোল্তান তাঁহার সেনানী সাহেব আলিকে নূর দেশ অধিকার করিতে পাঠাইয়া দিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ অতি সহজে ঐ দেশ জয় করিয়া, তথায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন ও আলি-বেন কাদেরকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, সকলে গজনী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলা বাহুল্য এই উভয় দেশের সমস্ত অধিবাসীবৃন্দ পবিত্র এস্লাম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

চতুর্দ্দশ অভিযান।

১০২২ খৃষ্টাব্দে সোলতান মাহ্মুদ গোয়ালিয়র ও পুনরায় কালিঞ্জর আক্রমণ করিলেন। ইহাই কাহারও মতে সোলতানের পঞ্চদশ বারের ভারত আক্রমণ বলিয়া বিখ্যাত। এই অভিযানে গোয়ালিয়র রাজ অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া গজনীপতির বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

তৎপরে মাহ্মুদ-বেন-সবক্তগীন ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করিয়া, দুর্গের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া উহার প্রবেশ দ্বার অবরোধ করিয়া রহিলেন।

দুর্গাধিপ রাজা নন্দরায়, পুনরায় তাঁহার এই দুরবস্থা দর্শনে গজনী-পতির নিকট তিনশত হস্তী পাঠাইয়া দিয়া সন্ধির প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। এই সময় চতুর নন্দরায় মোস্লেম বীরের সামর্থ্য পরীক্ষার্থে এই তিনশত হস্তী, চালকশূন্য অবস্থায় মোস্লেম শিবিরাভিমুখে তাড়াইয়া লইয়া গিয়া সোল্তান শিবিরে প্রবেশ করাইয়া দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু

তুর্কী বীরগণ যখন হস্তীগুলির নিকটবর্ত্তী হইয়া, নিজ নিজ পালিত হস্তীর ন্যায় তাহাদের উপর আরোহণ করিয়া উহাদিগকে ইচ্ছামত চালাইতে লাগিল, তখন শত্রুপক্ষ তাহাদের এই সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা নন্দ সোল্‌তানের বশ্যতা স্বীকার সূচক একটী হিন্দি স্তুতি কবিতা লিখিয়া মাহ্‌মুদ শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। সোল্‌তান তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া নন্দরায়কে তাঁহার কালিঞ্জর দুর্গ ও আরও চতুর্দ্দশটী ক্ষুদ্র-বৃহৎ দুর্গ প্রত্যর্পণ করিলেন। পরে নন্দ প্রদত্ত বহু ধন-রত্ন সঙ্গে লইয়া গজনীতে ফিরিয়া গেলেন।

এইবার রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সোলতান মাহ্‌মুদ গণনা করিয়া দেখিলেন যে,—তাঁহার বিশাল রাজত্বের বিভিন্ন স্থানে তিনি যে সমস্ত সৈন্য ও হস্তী রক্ষা করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন রাজধানীতে তাঁহার নিকট চুয়ান্ন হাজার উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ও এক সহস্র তিন শত হস্তী উপস্থিত রহিয়াছে। (তব্‌কতে আক্‌বরী)।

পঞ্চদশ অভিযান।

গুজ্‌রাট—সোমনাথ

৪১৬ হিঃ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি সোলতান মাহ্‌মুদ গুজরাটের (তৎকালীন প্রভাস) পশ্চিম-দক্ষিণে সমুদ্রতীরস্থিত প্রসিদ্ধ দেবমন্দির সোমনাথ আক্রমণ করেন।

সোমনাথে ভারতের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্ববৃহৎ বিগ্রহ ছিল। প্রত্যহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তীর্থ যাত্রীর সমাগম হইয়া, তথায় সকল সময়েই অন্যূন এক লক্ষ যাত্রী উপস্থিত থাকিত। প্রতিমা

পূজকগণের বিশ্বাস ছিল যে,—মৃত্যুর পর সকলের আত্মা দেহান্তর গ্রহণার্থে তথায় গিয়া উপস্থিত হয়, এবং সমুদ্রও জোয়ার ভাটার অছিলায় সোমনাথের পূজা দিয়া থাকে। এই কারণে ভারতের সমস্ত হিন্দুগণ তাহাদের যাবতীয় মূল্যবান বস্তু দিয়া এই বিগ্রহের পূজা দিতেন। সোমনাথ মন্দিরের পাণ্ডাগণ এই সমস্ত মূল্যবান পূজোপচার গ্রহণে খুবই অবস্থাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গ সোমনাথের সেবায় প্রায় দশ সহস্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

মন্দির মধ্যে বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য রত্নরাজির ঢেরি লাগিয়া রহিত। সোমনাথ হইতে হিন্দুগণের মহা পবিত্র পূত-সলিলা গঙ্গা, সাত শত মাইল দূরবর্ত্তী হইলেও, প্রত্যহ গঙ্গা জলে বিগ্রহ ধৌত করা হইত; এবং এই গঙ্গা জল আনিবার জন্য প্রয়াগ হইতে গুর্জ্জর দেশ পর্য্যন্ত 'এই বহু বিস্তীর্ণ পথে, শত শত লোক অপেক্ষা করিত। সহস্র ব্রাহ্মণ সমস্বরে প্রত্যহ বিগ্রহের নিকট পূজাপাঠ করিতেন, এবং তৎসঙ্গে মন্দির দ্বারে সাড়ে তিন শত পুরুষ ও কুমারী বন্দী একত্রে নাচিয়া নাচিয়া সোমনাথ দেবের স্তব-স্তুতি গাহিত। ইহারা প্রত্যেকেই উপযুক্ত বেতন পাইত।

সোল্‌তান মাহ্‌মুদ যে সময়ে ভারতের অন্যান্য দেশ সকল জয় করিয়া বিগ্রহ ধ্বংস করিতেছিলেন; সেই সময় হিন্দু জনসাধারণের ধারণা হইয়াছিল যে—সর্ব্বপ্রধান জাগ্রত দেবতা সোমনাথ, এই সমস্ত ক্ষুদ্রকায় বিগ্রহগুলির উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; নতুবা মোসলমানেরা কোন মতেই উহাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিত না। যথার্থ একেশ্বরবাদী সনাতন ধর্ম্মানুরাগী ধর্ম্মপ্রাণ সোলতান মাহ্‌মুদ, লোক পরম্পরায় প্রতিমা পূজকগণের এই অন্ধ বিশ্বাসের সংবাদ পাইয়া, সোমনাথ বিগ্রহ চূর্ণ করণার্থে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহার মনে ধারণা হইল যে—এই সর্ব্বজন-পূজিত সোমনাথের দুরবস্থা করিয়া ও পৌত্তলিকগণকে ইহার

অপদার্থতা দেখাইয়া, এই মানব হস্ত নির্ম্মিত প্রস্তর খণ্ডের যে কোনই ক্ষমতা নাই, ইহা তাহাদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, নিশ্চয় তমসাচ্ছন্ন প্রস্তর পূজকগণ, আগ্রহের সহিত সত্য-সনাতন একেশ্বরবাদী পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ধার্ম্মিক-প্রবর বীর শার্দ্দুল মাহ্‌মুদ, ১০ই সাবান তারিখে মাত্র ত্রিংশ সহস্র অশ্বারোহী যোদ্ধাসহ মুল্‌তানের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এবং পবিত্র রমজান মাসের মধ্যভাগে মুল্‌তানে পৌছিলেন। তথা হইতে জলশূন্য মরু মধ্য দিয়া হিন্দুস্থানে প্রবেশের রাস্তার অবস্থা স্মরণ করিয়া, তিনি প্রচুর পরিমাণে রসদ ও পানীয় জল সংগ্রহ করিলেন। পরে ঐ সমস্ত দ্রব্য ৩০,০০০ সহস্র উষ্ট্র পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া, ৫০০ শত মাইল দক্ষিণস্থিত আন্‌হাল্‌ওয়ারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মরুভূমি পার হইয়াই মাহ্‌মুদ জন-সমাকীর্ণ একটী নগর এবং তন্মধ্যে একটী প্রাচীন পার্ব্বতীয় দুর্গ ও বিস্তর দেবমন্দির, এবং পানীয় জলের সুন্দর সুন্দর ইন্দারা দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ সমস্ত দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া নগরবাসিগণকে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান করায়, তাহারা অসম্মতি প্রকাশ করিল; তখন সোল্‌তান রাগান্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে অনেককেই তরবারির আঘাতে বধ করিলেন। শেষে তথা হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া আন্‌হাল্‌ওয়ারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এবং জিল্‌কদ মাসের শেষভাগে তথায় আসিয়া পৌছিলেন।

আন্‌হাল্‌ওয়ারার রাজা ভীম সিংহ, মোসল্‌মানগণের আগমন বার্ত্তা পাইয়াই রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। তৎপরে আমিন-উদ্‌-দৌলা সোল্‌তান মাহ্‌মুদ, বালুকাময় মরুভূমির উপর দিয়া দুই শত মাইল দক্ষিণ—দক্ষিণ পশ্চিমে গুর্জ্জর দেশস্থিত আরব সাগরের

তীরবর্ত্তী ভারতের সর্ব্বপ্রধান হিন্দু তীর্থ সোমনাথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে ক্ষুদ্র বৃহৎ দেবমন্দির সকল ধ্বংস করিতে করিতে অগ্রসর হইবার কালে, একস্থানে ২০,০০০ সহস্র হিন্দু সেনা তাঁহার গতিরোধ করিল। বীরকেশরী অনায়াসে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া, এবং তাহাদের দেশ লুণ্ঠন করিয়া, সোমনাথ হইতে দুই দিবসের পথে দেবালওয়ারায় পৌছিলেন। সেই স্থানের অধিবাসীবৃন্দ ও সেনাগণ কর্ত্তৃক তিনি সোমনাথের দিকে অগ্রসর হইবার পথে আবার বাধা প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ দুর্ব্বল হিন্দু সেনাগণ, তৎকালীন জগতের অদ্বিতীয় বীরেন্দ্র মাহ্মুদের সুশিক্ষিত সৈন্যগণের নিকট প্রভঞ্জন-সম্মুখে ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

জিল্-হজ্জ মাসের মধ্যভাগে বৃহস্পতিবারে সোলতান মাহমুদ্ সোমনাথে গিয়া পৌছিলেন। এই সময় সমুদ্র-তীরে দুর্গ-প্রাকারের উপর হিন্দু সৈন্যগণ বসিয়া, মনে মনে এইবার তাহাদের দেবাদিদেব সোমনাথের দ্বারা মোস্‌লেম-সেনাগণের সমূলে ধ্বংস কল্পনা করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছিল। হঠাৎ শুক্রবার প্রাতে সোল্‌তানের কতকগুলি সৈন্য তাহা-দিগকে আক্রমণ করিল। মুষ্টিমেয় মোস্‌লেমের আক্রমণে, চির-দুর্ব্বল ভীরু প্রতিমা-পূজক সেনাবৃন্দ ভয়ে প্রাচীর পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গমধ্যে অবতরণ করিয়া লুক্কায়িত হইল। তখন দুর্দ্ধর্ষ তুর্কি ও আফ্‌গান যোদ্ধাগণ রজ্জু-নির্ম্মিত সিঁড়ি অবলম্বনে, দুর্গ-প্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক "আল্লাহো-আক্‌বর" রবের সহিত এস্‌লামের ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় মোস্‌লেম-সেনাগণ কর্ত্তৃক যে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা লেখনী মুখে বর্ণনা করা যায় না। একদল হিন্দু সেনা, সোমনাথের প্রস্তরময় মূর্ত্তির সন্নিকটে আসিয়া ভূপতিত হইয়া, তাহাদের সে পূজা অর্চ্চনার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র-সমীপে যুদ্ধ-জয় ভিক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু

তাহারা দেখিল—ইন্দ্রিয়-শক্তি-বর্জ্জিত পাষাণ মূর্ত্তির অন্তরেন্দ্রিয় তাহাদের প্রার্থনায় দ্রবীভূত হইল না। ক্রমে রাত্রি সমাগত হওয়ায় মোস্‌লেমগণ সে দিনকার মত রণে ক্ষান্ত হইলেন।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোস্‌লেম-বীরগণ পুনরায় তরবারি গ্রহণ করিলেন। এবার মন্দির-রক্ষী হিন্দু সেনাগণ ধর্ম্মার্থে প্রাণ দিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া, যে কোন প্রকারে মোসল্‌মানদিগকে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর হইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। তরবারির যুদ্ধে হিন্দু সেনাগণের স্থান তুর্কি ও আফ্‌গান অসি-ব্যবসায়ী বীরগণের বহু পশ্চাতে থাকায়, তাহারা যুদ্ধারম্ভেই পশ্চাৎ হটিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মন্দিরের দ্বারের দিকে পলাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মোস্‌লেম-বীরগণ অগ্রসর হইয়া ও সোমনাথের মন্দিরদ্বার সমীপে তাহাদিগকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিয়া, পৌত্তলিকগণের রক্তস্রোতে মন্দিরদ্বার ও প্রাঙ্গণ বিধৌত করিয়া দিলেন। দলে দলে হিন্দু সেনা বিগ্রহের সম্মুখীন হইয়া, সোমনাথসমীপে গললগ্ন-বস্ত্র হইয়া করজোড়ে করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল, এবং দ্বার-সান্নিধ্যে পুনরাগমন করিয়া শেষে মোস্‌লেম-অসি তলে মৃত্তিকা চুম্বন করিতে লাগিল। কতকগুলি মন্দির-রক্ষী সেনা নৌকাযোগে পলায়ন প্রত্যাশায় সমুদ্র বহিয়া যাইবার পথে, মোস্‌লেমগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কেহ ডুবিয়া মরিল, কেহ বা অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারাইল।

এই সময়ে ধর্ম্মোন্মত্ত বীর আমিন-উদ্দৌলা সোল্‌তান মাহ্‌মুদ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ হস্তে তাঁহার প্রকাণ্ড যুদ্ধ-কুঠারাঘাতে বিগ্রহের মস্তক চূর্ণ করিলেন।

সোমনাথ মূর্ত্তিটী একখণ্ড প্রস্তর হইতে খোদাই করিয়া বাহির করা অন্তঃশূন্য একটা পাঁচ হস্ত উচ্চ ও তিন হস্ত পরিধিবিশিষ্ট বিগ্রহ ছিল।

উহার নিম্নার্দ্ধ মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকিত। ভজনকক্ষ মধ্যে বাহিরের অলোক প্রবেশাধিকার না পাইলেও, আভ্যন্তরীন মণিমাণিক্যের উজ্জ্বল জ্যোতিতে ঘরটীকে সর্ব্বক্ষণ যেন জ্যোতির্ম্ময় করিয়া রাখিত।

সোল্‌তান বিগ্রহ ভগ্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই ঘরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলে, বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ করজোড়ে তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিল, এবং ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহার রাজকোষে কয়েক কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দিতে চাহিয়াছিল। বিপন্ন ব্রাহ্মণগণের এই কাতরোক্তিতে তাঁহার অধীনস্থ কয়েকজন ওমরাহ্, দয়াপরবশ হইয়া, সোল্‌তানকে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুরোধও করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ মাহ্‌মুদ তাহাতে উত্তর করিলেন যে—

"আমি সমস্ত অবস্থা বুঝিতেছি, কিন্তু রোজহাশরে (শেষ বিচারের দিন) আমি স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে পৌত্তলিকগণকে দেবমূর্ত্তি বিক্রয়কারী মাহ্‌মুদ অপেক্ষা, ঈশ্বরদ্রোহীগণের প্রধান দেবমূর্ত্তি ভগ্নকারী মাহ্‌মুদ বলিয়া অভিহিত হইতে বাসনা করি।"

সোল্‌তান এই দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে এত অধিক বহুমূল্য হীরক-আদি সযত্নরক্ষিত রত্ন পাইয়াছিলেন যে—ঐ সমস্ত রত্নের মূল্য ব্রাহ্মণগণের অঙ্গীকৃত স্বর্ণ মুদ্রার শতগুণ অধিক হইবে।

সোমনাথের মূর্ত্তির ভগ্ন অংশগুলির মধ্যে কিয়দংশ সোল্‌তান গজ্‌নীতে পাঠাইয়া দিয়া, অবশিষ্ট মক্কা, মদিনা ও অপরাপর মোসল্‌মান রাজত্বের প্রধান নগরসমূহে পাঠাইয়া দিলেন। গজ্‌নীতে এই বিগ্রহের অংশ জামে মস্‌জিদের প্রবেশদ্বারের চৌকাঠের নিম্নে গাঁথিয়া রাখা হইল। আজ পর্য্যন্ত ঐ বিগ্রহাংশ সেইস্থানে বর্ত্তমান আছে।

সোমনাথের মূর্ত্তির সন্নিকটে দুই শত ভারতীয় মনের ওজনের একটী সুবর্ণ নির্ম্মিত লম্বমান শিকলে একটী বৃহদায়তন ঘণ্টা দোদুল্যমান ছিল।

প্রহরে প্রহরে পূজা পাঠার্থে নূতন নূতন ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিবার জন্য এই ঘণ্টার শব্দ করা হইত। পার্শ্ববর্ত্তী তোষাখানায় বিস্তর স্বর্ণ-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি রক্ষিত ছিল, এবং তাহাদের মস্তকোপরি বহু মূল্যবান মণি-মুক্তার ঝালরযুক্ত চন্দ্রাতপ বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সমস্ত দ্রব্যসহ সোমনাথ ধ্বংস করিয়া গজ্‌নীপতি এত অধিক মণি-মাণিক্য পাইয়াছিলেন যে—পৃথিবীর কোন রাজা এত রত্ন কখনও একত্রে অবলোকন করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সেই সময়ের প্রথানুসারে দূরবর্ত্তী রাজ্যের রাজতনয়াগণ পর্য্যন্ত কুমারী অবস্থায় মন্দিরে আসিয়া, কিছুদিন ধরিয়া সোমনাথ দেবের মনস্তুষ্টির জন্য, তাহার নর্ত্তকী ও গায়ীকারূপে মন্দিরে অবস্থান করিতেন। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের 'সময়ে কখন কখন দূর-দূরান্তরের যাত্রীর সংখ্যা এখানে দুই লক্ষেরও অধিক হইত; এবং সকলেই মুক্ত হস্তে মূল্যবান দর্শনী প্রদানে বিগ্রহ দর্শন করিতেন।

সোমনাথ ধ্বংস ও এই মহাবিজয়ের সংবাদ পাইয়া খলিফা কাদের-বিল্লাহ সোলতান মাহ্‌মুদকে খোরাসান, হিন্দুস্থান, নিমরোজ ও খাওয়ারিজম্‌মের রাজাধিরাজ খেতাবে ভূষিত করিলেন ও তাঁহার পুত্রগণের উপর সোলতান উপাধি অর্পণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত সোলতান কাহফ-দ্দৌলত-অল্‌-এস্‌লাম্‌ (এস্‌লামের রাজ্য ও ধর্ম্ম রক্ষক) তাঁহার মাহ্‌মুদকে খলিফা, জ্যেষ্ঠ পুত্র আমীর মসুদকে শাহাব-দ্দৌলত-অ-জামা-উল্‌-মেল্লাত, মধ্যম আমীর মোহাম্মদকে জালাল-দ্দৌলত-অ-জামা-উল্‌-মেল্লাত এবং কনিষ্ঠ ইউসফ্‌কে আজাদ-দ্দৌলত-অ-মুঈদুল্‌-মেল্লাত উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

ষোড়শ অভিযান।

পর বৎসর ৪১৭ হিঃ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে সোলতান মাহমুদ ভারতে তাঁহার শেষ বা ষোড়শ অভিযান করিলেন। এই ষোড়শ বা সপ্তদশ আক্রমণে তিনি দুর্দ্দান্ত জাঠ্‌দিগকে সিন্ধু নদীর জলযুদ্ধে দস্তুর মত নাকানি-চোকানি খাওয়াইয়া রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শেষে হিঃ ৪১৯ সালের ২৩ রবিয়ল আখের তারিখে ১০২৮ খৃঃ ৩রা এপ্রিল, জগতের অদ্বিতীয় বীর ধর্ম্মপ্রাণ রাজাধিরাজ আমিন-দ্দৌলা, নেজাম-উদ্দীন কাহফ্‌-দ্দৌলত-আল্‌-এস্‌লাম সোলতান আবুল কাসেম মাহ্‌মুদ ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, ৬১ বৎসর বয়সে তাঁহার চিরপ্রিয় রাজধানীগজনী নগরে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। ধার্ম্মিক মোসল্‌মানগণ এখনও তাঁহার সুদৃশ্য সমাধি পরিদর্শন করা ধর্ম্মকার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন।

পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন দ্বারা সত্য সনাতন ঐশ্বরিক ধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ করাই তাঁহার জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। এবং সেই ধর্ম্মার্থে যুদ্ধ ব্যতীত বীরপুঙ্গব মাহমুদ যে অকারণে ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন মানবের প্রাণনাশ করেন নাই, একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। রাজ্য জয় গজনী অধিপতির অভিপ্রেত হইলে, তিনি ভারত দূরের কথা, সসাগরা পৃথিবীর অন্যূন অর্দ্ধাংশের রাজাধিরাজ বলিয়াও ঘোষিত হইতে পারিতেন। তিনি গুণীর গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার রাজসভা আলোকিত করিয়া থাকিতেন। (১। আল্‌-উৎবীকৃত কেতাবল্‌ এমিনী ২। আবু ওমর মেন্‌হাজদ্দীন কৃত তব্‌কতে নসিরী ৩। এব্‌নে আসির সম্পাদিত কামেলাতোত্‌ তওয়ারিখ ৪। রওজাতুস সাফা ৫। জমিওতত্‌ তওয়ারিখ ও ৬। হবিবোস্‌ সিয়ার)।

নবম সর্গ

সোলতান মাহ্‌মুদের মৃত্যুর সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মস্‌উদ্‌, পারস্যের হামাদান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত থাকায়, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে, ওমরাহ্‌বর্গ একমত হইয়া, মধ্যম যুবরাজ সোলতান মোহম্মদকে সিংহাসনারূঢ় করিলেন। কিন্তু এই নবীন যুবক অতিশয় নম্র প্রকৃতির থাকায়, এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বিবেচিত হইতে লাগিলেন। সাত মাস পরে মস্‌উদের বন্ধুবর্গ তাঁহাকে তাঁহার রাজত্ব হামাদান হইতে ডাকাইয়া আনিয়া মোহাম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জ্যেষ্ঠ মস্‌উদ্‌কে তাঁহার পিতৃ-সিংহাসনে বসাইলেন।

মাহ্‌মুদ পুত্র সোলতান মস্‌উদ, নাসের উদ্দীন নাম ধারণে গজনীতে আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তিনি একদিকে যেমন সাহসী বীর তদ্রূপ অপর পক্ষে মহান্‌ উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার শারীরিক বল এত অধিক ছিল যে,—তৎকালে রাজ্যমধ্যে কেহই তাঁহার নিত্য ব্যবহার্য্য যুদ্ধ-কুঠার ভূমি হইতে এক হস্তে উত্তোলন করিতে সমর্থ হইত না। সোলতান মস্‌উদ, শর নিক্ষেপ দ্বারা অনায়াসে একটী পূর্ণবয়স্ক হস্তী ভেদ করিতে পারিতেন।

পিতা তাঁহার এই জ্যেষ্ঠ পুত্র অপেক্ষা মধ্যম মোহাম্মদকে অধিক স্নেহ করিতেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি মস্‌উদকে ভয়ও করিতেন। শেষ জীবনে সোলতান মাহ্‌মুদ বাগ্‌দাদের খলিফাকে লিখিত অনুরোধ করিয়া

তাঁহার মৃত্যুর পর এই মধ্যম পুত্রের নামে খোতবা পাঠের অনুমতি পত্র আনাইয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া সোল্‌তানের দরবারের একজন ওমরাহ্‌ খোয়াজা আবু-নসর মেশ্‌কান, মাহ্‌মুদকে জিজ্ঞাসা করায় বাদশাহ্‌ উত্তর করিয়াছিলেন—

"আমি বিশেষরূপে অবগত আছি—কুমার মস্‌উদ সকল বিষয়ে কুমার মোহাম্মদ অপেক্ষা উপযুক্ত, এবং ইহাও সুনিশ্চিত যে আমার মৃত্যুর পর মস্‌উদই আমার এই বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। আমি সেই জন্যই আমার জীবিত কালে এই গরীব বেচারাকে সামান্য একটু মান দান করিতে ইচ্ছা করি।"

পিতার উক্তি ও তৎসহ খলিফার পত্রের মর্ম্ম কুমার মস্‌উদের কর্ণে প্রবেশ করায় তিনিও বলিয়াছিলেন যে—

"এ বিষয়ে কোনই চিন্তার কারণ নাই। নিশ্চয়ই লেখনী অপেক্ষা তরবারির ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অধিক!"

তৎপরে সোল্‌তান মাহ্‌মুদ ইরাক জয় করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র মস্‌উদকে ইরাকের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, এবং সেই সঙ্গে হিরাত ও খোরাসান তাঁহার শাসনাধীন করিয়া দিলেন।

ইস্‌পাহান জয় করিবার পর, মস্‌উদ্‌ নিজে রী, কাজ্‌উইন ও হামাদান এবং তারাম দেশ অধিকার ভুক্ত করিলেন। এই সকল বিজয়ের পর সোলতান মস্‌উদও পৃথক ভাবে বাগ্‌দাদের খলিফার নিকট হইতে সম্মান পাইয়াছিলেন।

সিংহাসনারোহণের পর হিঃ ৪২২ সালে তিনি প্রথমতঃ পারস্যে ও তৎপরে মাক্‌রাণে অভিযান করেন। দুই বৎসর ধরিয়া সোল্‌তান মস্‌উদকে পারস্য লইয়া এত অধিক বিব্রত হইতে হইয়াছিল যে, তিনি হিন্দুস্তানের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। পরে ৪২৬

হিজরীতে মস্‌উদ কাশ্মীরের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। পথে শুব্‌শুতি দুর্গ আক্রমণ করায়, দুর্গাধিপ এই অবস্থায় তাঁহার নিকট বহু উপঢৌকন দিতে স্বীকৃত হইয়া দূত প্রেরণ করিলেন। সোলতান মস্‌উদ দূতের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমতকালে দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ কতকগুলি মোসলমান্ সওদাগরের নিকট হইতে একখানি আবেদন পত্র পাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে—

"এই এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী সওদাগরের দল, ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে এই পথ দিয়া যাইবার কালে শুব্‌শুতি দুর্গ রক্ষক অন্যায় মতে তাহাদিগকে ধরিয়া, তাহাদের সমস্ত ধন সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দুর্গাধিপের অবস্থা এক্ষণে ততদূর স্বচ্ছল নহে। রসদ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। যদ্যপি মহামান্য সোল্‌তান আর সামান্য কয়েকদিন কেবল দুর্গাবরোধ করিয়া রাখেন, তাহা হইলে দুর্গাধিপকে শীঘ্রই আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

পত্র পাঠে সোল্‌তান অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, তৎক্ষণাৎ দুর্গ আক্রমণের অনুমতি প্রদান করিলেন। মোস্‌লেম সেনাগণ নিকটবর্ত্তী ইক্ষুক্ষেত্র হইতে ইক্ষু কাটিয়া তদ্দ্বারা দুর্গ পরিখা ভরাট করিতে লাগিল। তৎপরে দুর্গ-প্রাকার উল্লঙ্ঘনে দুর্দ্ধর্ষ মোস্‌লেম বীরগণ ক্রোধান্ধ হইয়া দুর্গাভ্যন্তরস্থ সমস্ত হিন্দু সেনাগণকে তরবারির আঘাতে বিনাশ করিলেন। সোল্‌তান মস্‌উদ অবরুদ্ধ মোস্‌লেম ব্যবসায়িগণকে কারামুক্ত করিয়া, তাহাদের প্রায় সমুদয় লুণ্ঠিত দ্রব্য তাহাদিগকে প্রত্যার্পণ করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। এই কার্য্য দ্বারা সোলতান একদিকে যেমন ভারতের মোসল্‌মানগণের পরম ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জ্জন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপর পক্ষে তেম্‌নি হিন্দুদিগের আতঙ্ক বর্দ্ধন করিলেন।

৪২৭ হিঃ ১০৩৪ খৃষ্টাব্দে সোল্‌তান পার্ব্বতীয় সওয়ালেক্ প্রদেশে

অভিযান করেন ; এবং পাঁচ দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর, তথাকার প্রসিদ্ধ অজেয় দুর্গ হান্‌সী অধিকার করিলেন। এই দুর্গ মধ্যে সোল্‌তান বিস্তর অর্থ পাইয়াছিলেন।

হান্‌সী দুর্গ জয়ের পর তথা হইতে সোলতান মস্‌উদ দিল্লীর ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী হিন্দু তীর্থ স্নুন্‌পথে যাত্রা করিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ দেবমন্দির ধ্বংস করিলেন। তৎপরে লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, জ্যেষ্ঠ পুত্র মউদুদ্‌কে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া গজনী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার পর সোল্‌তান মস্‌উদ আর ভারতে পদার্পণ করেন নাই। শেষ অবস্থায় তাঁহাকে মার্ভ ও সারাকৃশ দেশে সল্‌জুকদিগের বিদ্রোহ দমন করিতে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনবার তিনি সল্‌জুক্‌গণকে বিতাড়িত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ; কিন্তু চতুর্থবারে তেলিকানে তিন দিন ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর চতুর্থ দিবসে শুক্রবারে সোলতান মস্‌উদ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, খোরাসান সীমান্ত হইতে চিরকালের মত বিতাড়িত হইলেন। খোরাসান প্রদেশ সল্‌জুকগণের হস্তগত হইল।

অতঃপর আর একবার সোল্‌তান হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু পথে মার্গালী গিরিবর্ত্মে তাঁহার অধীনস্থ তুর্কি ও হিন্দি সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া কিরী দুর্গে আবদ্ধ করিল। তথায় ১০৪০ খৃষ্টাব্দে হিঃ ৪৩২ সালে তিনি বিদ্রোহী সেনাগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন।

মউদুদ

সোলতান মস্‌উদের অবর্ত্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মউদুদ, গজ্‌নীতে পিতার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা-স্বরূপ রাজকার্য্য চালাইতে ছিলেন। সোলতানের হত্যার সংবাদ পাইয়া মউদুদ, শাহাব-দ্দৌলা আবু সায়াদ

নাম ধারণে গজ্‌নীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ; এবং পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হিন্দুস্থানের দিকে ধাবিত হইলেন। হিন্দের অনেক রাজা ও শাসনকর্ত্তা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অনেক মাহ্‌মূদী ও মাসঊদী তুর্কি যাহারা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাঁহার নিকট আগমন করিয়া আত্ম-সমর্পণ করিতে লাগিল। সোল্‌তান মউদুদ তাঁহার খুল্লতাত মোহাম্মদকেই তাঁহার পিতৃ-হত্যার মূলীভূত হেতু সিদ্ধান্ত করিয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার সহিত যে সমস্ত তুর্কি ও তাজিক্ যোগ দিয়াছিল, তাহাদের সকলকে হত্যা করি-লেন। তৎপরে সোলতান মউদুদ গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নয় বৎসর রাজত্ব করিবার পর ৪৪১ হিজরীতে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সোলতান মউদুদের রাজত্ব শেষ হইবার কালে লাহোর ব্যতীত মাহ্‌মুদের অধিকৃত হিন্দুস্থানের প্রায় সকল রাজ্যই ক্রমে মোসল্‌মানগণের হস্তচ্যুত হইতে লাগিল। হিঃ ৪৩৫ সালে দিল্লীর রাজা, গজনীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতেছে দেখিয়া, পাঞ্জাবের সমুদয় হিন্দু রাজাগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, মোসল্‌মানগণকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

রাজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দিলেন যে,—

নগরকোটের দেব মন্দিরস্থ হিন্দুগণের পরমারাধ্য দেবতা, যাহা সোল্‌তান মাহ্‌মুদ অন্যায় মতে ভগ্ন করিয়াছিলেন ; সেই দেবতা রাজাকে স্বপ্নে এইরূপ প্রত্যাদেশ করিয়াছেন—

"হিন্দুগণের দেবতার অভিসম্পাতে গজনীতে এক্ষণে গৃহ বিচ্ছেদ লাগিয়া গিয়াছে। রাজা এই সময় সসৈন্যে নগরকোট যাইলে, দেবতা সাহায্য করিয়া ঐ দুর্গ মোসল্‌মানগণের হস্তচ্যুত করিয়া রাজাকে প্রত্যর্পণ

করিবেন; এবং রাজা দেব মন্দিরের মধ্যেই বিগ্রহ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইবেন।"

এই স্বপ্নঘটিত অলীক সংবাদ প্রচার করিয়া দিল্লীশ্বর বহু হিন্দু রাজার সহানুভূতি পাইলেন, এবং এইরূপে অনেক সৈন্য একত্রিত করিয়া রাজা নগরকোট আক্রমণে বহির্গত হইলেন।

নগরকোট সেই সময় একদল অল্পসংখ্যক প্রবল মোসলেম সেনার সেনা নিবাস ছিল মাত্র। কিন্তু রাজা উহাদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে সাহসী না হইয়া, উহাদের রসদ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, অধীনস্থ বহু হিন্দু সৈন্য দ্বারা দুর্গাবরোধ করিয়া রাখিলেন।

সম্পূর্ণ চারি মাস কাল অবরুদ্ধ থাকার পর, মোস্‌লেম সেনাগণ অগত্যা রাজার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল। রাজা পূর্ব্ব হইতেই নষ্ট বিগ্রহের অনুরূপ একটী মূর্ত্তি গোপনে প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়া ছিলেন। তিনি দুর্গে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে মন্দিরাভ্যন্তরে গমন করিয়া, যথাস্থানে সঙ্গোপনে ঐ মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া, যেন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এই ভাণ করিয়া, সমুদয় হিন্দু সেনাগণকে ডাকিয়া উহা দেখাইতে লাগিলেন।

অচিরে এই সংবাদ ভারতের সকল স্থানে প্রচার হইয়া পড়ায়, দলে দলে পৌত্তলিকগণ আসিয়া এই দেব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হিন্দু ভূপালগণ এই ব্যাপারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, দিল্লীশ্বরের সহিত যোগ দিয়া মোসল্‌মানগণকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

সোলতান মউদুদের পর তুর্কি সেনাপতি ও ওমরাহগণ এক সঙ্গে মস্‌উদ-পুত্র আলি ও মউদুদ-পুত্র মোহাম্মদ, এই দুই খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে একসঙ্গে গজনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। আবার এই দুই

জনই রাজকার্য্য পরিচালনের সম্পূর্ণ অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়, তাঁহারা দুই মাসের মধ্যে উভয়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, সোল্‌তান মাহ্‌মুদের কনিষ্ঠ পুত্র বাহাউদ্দৌলা আবদর-রসীদকে গজ্‌নীর মস্‌নদে বসাইলেন।

সোলতান আবদর-রসীদ বিদ্বান ও অল্প বয়সেই বহুদর্শী ছিলেন। তিনি একজন ঐতিহাসিক ছিলেন, এবং অনেক বিষয়ে আরও কয়েকখানি পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আবদুর-রসীদের রাজত্বকালে সল্‌জুকগণ খোরাসানের রাজা দাউদের সাহায্যে গজনী আক্রমণ করিবার জন্য খেপিয়া উঠিল।

দাউদের পুত্র আল্‌প আর্‌স্‌লান সেই সময়ের একজন ভীমপরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ যোদ্ধা ছিলেন। এই বীরকেশরী আল্‌প আর্‌স্‌লান বহু সৈন্য লইয়া তুর্কিস্থান হইতে বাহির হইলেন ও পিতা দায়ুদ সহ সিস্তানের পথ বাহিয়া বস্ত পর্য্যন্ত আসিলেন।

সোলতান আবদর-রসীদ, তদীয় পিতা সোলতান মাহ্‌মুদের সময়ের একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি তুঘ্‌রেলের অধীনে বহু সৈন্য দিয়া তাঁহাকে আল্‌প আর্‌স্‌লানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তুঘ্‌রেল, খামার উপত্যকার সম্মুখে তুর্ক সেনাগণকে পরাস্ত করিয়া, তথা হইতে বস্তে গিয়া, দাউদ সাহ্‌কে সিস্তানে তাড়াইয়া দিলেন। তৎপরে দাউদের মাতুল বেঘুকে পরাজিত করিয়া গজ্‌নী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গজনী নগরে আসিবার পর, এই মদগর্ব্বিত সেনাপতি তুঘ্‌রেল, ত্রিংশ বর্ষ দেশীয় সোলতান আবদর-রসীদকে হত্যা করিয়া, স্বয়ং গজ্‌নীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; কিন্তু এই অত্যাচারীর রাজত্বকাল চত্বারিংশ দিবসের অধিক দিন স্থায়ী হইল না। নওতিগীন নামক একজন সাহসী তুর্কী যোদ্ধা সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় অহঙ্কারী তুঘ্‌রেলকে হত্যা করিয়া তাহার মস্তক লইয়া সমস্ত নগরবাসীকে দেখাইয়া বেড়াইল।

তুঘরেলের পরিত্যক্ত সিংহাসন মসউদ-পুত্র ফোরোখ-জাদ, তাঁহার বার্ঘান্দ দুর্গের কারাবাস হইতে অসিয়া অধিকার করিলেন। দুর্দ্দান্ত সয়তান তুঘরেল তাহার অপঘাত মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব দিনে, সোলতান মসউদের দুই পুত্র ফরোখ্‌জাদ ও এব্রাহিমকে বারঘান্দা কারামধ্যে হত্যা করিবার জন্য ঘাতকসহ একদল সেনা প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু দয়ার্দ্র হৃদয় দুর্গাধিপ এক দিনের অবকাশ চাহিয়া, সেনাগণকে দুর্গদ্বারে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করায়, জগদীশ্বরের অপার মহিমায় কুমারদ্বয়ের প্রাণ রক্ষা হইল।

সোলতান ফরোখ্‌জাদ হিঃ ৪৪৩ সালের ৯ই জিল্‌কদ্‌ তারিখে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের অধিকৃত গজনীর রত্ন-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ন্যায় বিচার দ্বারা প্রজামণ্ডলীর পরিতুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি অতীব দয়ালু সম্রাট ছিলেন। সাত বৎসর রাজত্বের পর ৩৪ বৎসর বয়সে ফরোখ্‌জাদ ১০৫৯ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

দশম সোলতান, এব্রাহিম

ফরোখ্‌জাদের মৃত্যুর পর রাজ্যের প্রধানগণ এক মত হইয়া তদীয় ভ্রাতা ধার্ম্মিকপ্রবর বিদ্যোৎসাহী জাহির-দ্দোলা নসিরল-মেল্লাত রজি-উদ্দীন এব্রাহিমকে গজনীর রাজাধিরাজের সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইলেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সংবাদ পাইয়া সল্‌জুক রাজা দাউদ তাঁহার সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন এবং এই সময়ে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তদীয় পুত্র আল্‌ফ্‌ আরসলান ঐ সন্ধি সূত্র আরও দৃঢ় করিয়া গজনীপতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

সোলতান এব্রাহিম তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের অধিকৃত, রাজ্য সমূহে আশ্চর্য্যরূপে শান্তি স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার

রাজত্ব কালে মাহ্‌মুদী সাম্রাজ্য আবার উন্নত ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিল। ৬০ বৎসর বয়সে পরম সুখে দ্বিচত্বারিংশ বৎসর রাজত্ব করিয়া হিঃ ৪৯২ সালে সোল্‌তান এব্রাহিম মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

সোলতান তৃতীয় মস্‌উদ

এব্রাহিম-পুত্র আলাউদ্দীন মস্‌উদের রাজত্বকালে বাগ্‌দাদে আল্‌-মোস্‌তাজ্‌হার-বিল্লাহ্‌ খলিফা ছিলেন। সোলতান তৃতীয় মস্‌উদ খোরাসানের সল্‌জুক রাজা সোলতান সান্‌জারের ভগ্নী পরমা সুন্দরী মাহদ্‌-এরাক্‌কে বিবাহ করিয়া, উভয় রাজ্যের মধ্যে সখ্যতা বর্দ্ধন করেন।

মস্‌উদ, আমীর আজ্‌দদ্দৌলাকে হিন্দুস্থানের শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিয়াছিলেন। এই সম্রাটের রাজত্বকালে তাঁহার জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ হাজির তাঘাতিগীন সসৈন্যে গঙ্গা নদী পার হইয়া, মোস্‌লেম-বিজয়-পতাকা সোলতান মাহ্‌মুদ অপেক্ষা বহু দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সোলতান মস্‌উদের রাজত্বকাল শান্তির সহিত কাটিয়া গেল, সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া ১১১৫ খৃষ্টাব্দে ৫৭ বৎসর বয়সে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

সোলতান আবুল মালেক

মস্‌উদ পুত্র আরসলান আবুল-মালেক সিংহাসনারোহণ করিয়া নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি স্বীয় ভ্রাতাগণকে বন্দী করিয়া, মাতার বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। তাঁহার খুল্লতাত বাহ্‌রাম সাহ্‌ এই অবস্থা দর্শনে, খোরাসানে সোল্‌তান সান্‌জারের নিকট গিয়া আশ্রয় লইলেন। সোল্‌তান আবুল মালেকের গর্ভধারিনী মাহ্‌দ-এরাক, পুত্রের উপর ক্রমশঃ এত অধিক বিরক্ত হইয়া

পড়িয়াছিলেন যে,—শেষে তাঁহাকেও ভ্রাতা সান্‌জারের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

সোলতান সান্‌জার আশ্রিত বাহরামের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভাগিনেয় গজনী-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধে সম্রাট মাতা মাহ্‌দ-এরাকও পুত্রের বিরুদ্ধে ভ্রাতাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

খোরাসান-রাজ বহু-সংখ্যক সৈন্য লইয়া গজনী নগর-প্রান্তে শিবির সংস্থাপন করিলেন। এদিকে আরস্‌লান ত্রিংশ সহস্র অশ্বারোহী ১৬০টী হস্তী ও বহু পদাতিক সৈন্য সঙ্গে লইয়া, পিতৃব্য ও মাতুলকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া উভয় মোস্‌লেম-সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল; শেষে সিস্তানের শাসনকর্ত্তা আবুল-ফজলের অসীম বীরত্বে, গজ্‌নীর সেনাগণ পরাভূত ও বিতাড়িত হইল। সোলতান আরস্‌লান হিন্দুস্থানের দিকে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

সান্‌জার গজনী প্রবেশ পূর্ব্বক ৪০ দিন তথায় অবস্থান করিলেন ও মুঈজদ্দৌলা বাহ্‌রাম সাহকে হিঃ ৫১১ সালে গজ্‌নীর প্রসিদ্ধ সিংহাসনে বসাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরে এই ১১১৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে আরস্‌লান বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, অপহৃত রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির আশায়, সোল্‌তান বাহ্‌রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও শেষে নিহত হইলেন।

সোলতান বাহ্‌রাম সাহ

সোল্‌তান বাহ্‌রাম সাহ্‌কে উপর্য্যুপরি কয়েকবার হিন্দুস্থানে আগমন করিতে হইয়াছিল। ৫১২ হিঃ ২৭ রমজান তারিখে তাঁহাকে লাহোরে মোহাম্মদ বাহালিমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। যুদ্ধে সোলতান

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আরস্‌লানের ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ও লাহোরের শাসনকর্ত্তা বাহালিম্‌কে পরাজিত ও বন্দি করিলেন। শেষে নিজ দয়াবশতঃ বাহালিমের কাতরোক্তিতে সমস্ত বিবাদ ভুলিয়া গিয়া, আবার তাঁহাকেই লাহোরের মস্‌নদে বসাইয়া গজনী ফিরিয়া গেলেন।

পরবর্ত্তী বৎসর বিশ্বাসঘাতক বাহালিম পুনরায় মস্তক উত্তোলন করায়, সোলতানকে আবার তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিতে হইয়াছিল ও এবার তাহাকে দস্তর মত শিক্ষা দিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া তিনি নিরস্ত হইয়াছিলেন।

বাহ্‌রামের রাজত্ব কালে গোরের শাসনকর্ত্তা সায়ফদ্দীন অনেক সৈন্য সহ গজনী আক্রমণ করেন। সোলতান বাহ্‌রাম্ তাঁহাকে বাধা প্রদানে অক্ষম বিবেচনায় ভারত বর্ষের দিকে পলায়ন করিলেন। সায়ফদ্দীন বিনা বাধায় গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; কিন্তু অল্প দিন মধ্যে তিনি গজনীর সাধারণ প্রজাবর্গের বিরাগভাজন হইয়া পড়ায়, তাঁহারা সোলতান বাহ্‌রামকে ডাকাইয়া সায়ফদ্দীনকে ধরিয়া সোলতানের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই সময় সোলতান বাহ্‌রাম্ সাহ্ হঠাৎ তাহার স্বাভাবসিদ্ধ মমতা ভুলিয়া গিয়া অতিশয় নিষ্ঠুরতার সহিত সায়ফদ্দীনকে হত্যা করেন।

সায়ফদ্দীনের নিদারুণ হত্যার সংবাদ গোরে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে তদীয় সহোদর গোরের শাসনকর্ত্তা আলাউদ্দীন অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে গজনী আক্রমণ করিলেন। অচিরে গজনী নগর আলাউদ্দীনের হস্তগত হইল। আলাউদ্দীন অমানুষিক অত্যাচার দ্বারা গজনী নগর ধ্বংস করিলেন। শেষে অগ্নি-সংযোগে সোলতান মাহ্‌মুদের সুদৃশ্য নগর ছারখার করিয়া দিলেন। এই পাশবিক ব্যবহারের জন্য আলাউদ্দীন আজীবন জাঁহা-সোজ্ (জগৎ-দাহক) উপাধিতে ভূষিত

হইয়া রহিলেন। বাহরাম সাহ্ আবার হিন্দুস্থানে পলাইয়া গেলেন এবং গোরীগণের অপসারণের সংবাদ পাইয়া কিছুদিন পরে পুনরায় গজ্নীতে ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু এবারে আর বেশীদিন তিনি রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বসমেত ৪১ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

সোলতান বাহ্রাম সাহের পুত্র সোলতান আমিনদ্দৌলা খসরু সাহ্ ৫৫২ হিঃ ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি দেশ শাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন।

এই সময় গোরের সোলতান সৈয়দ গেয়াস-উদ্দীন মোহাম্মদ সাহ্ গজনীর সিংহাসন অধিকার করেন। সোলতান খস্রু লাহোরে পলাইয়া গিয়া তথায় সিংহাসন স্থাপন করিয়া ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

তৎপরে তাঁহার পুত্র তাজ-উদ্দৌলা সোলতান জাহান, লাহোরে কয়েক বৎসর, নামে মাত্র রাজত্ব করিবার পর হিঃ ৫৮৫ সালে প্রসিদ্ধ বীর-শার্দ্দূল শাহাব-উদ্দীন মোহাম্মদ গোরী কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া ফিরোজ-কোহ্ দুর্গে নীত হয়েন। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ সোলতান মাহ্মুদের বংশের রাজত্বের শেষ হইয়া, পারশ্য, হিন্দুস্থান, খোরাসান ও গজনী প্রভৃতি প্রদেশগুলি গোরের সোলতানগণের পদানত হয়—(তব্কতে নসিরী)।

দশম সর্গ

গোর বংশ

(হাসান নেজামি কৃত তাজুল মাসায়ের)

সায়ফদ্দীনের মৃত্যুর পর গোয়াসউদ্দীন গোরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হিঃ ৫৬৯ সালে তিনি গজনী নগরী অধিকার করিয়া স্বীয় ভ্রাতা মুঈজ্-উদ্দীন মোহাম্মদকে গজনীর সিংহাসনে বসাইয়া রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় হইতে সুপ্রসিদ্ধ স্বাধীন গজনী নগর তাহার এক কালের পদাশ্রিত গোরের অধীনস্থ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

এই মুঈজদ্দীন মোহাম্মদ গোরী, তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে হিঃ ৫৭১ সালে মুলতান আক্রমণ করিয়া উহা শত্রু-কবল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। তৎপরে হিঃ ৫৭৪ সালে ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ গোরী মরুভূমি পার হইয়া গুর্জরাটের নাহার-ওয়ালা প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে তথাকার রাজা বাসুদেবের বিপুল বাহিনীর নিকট মুঈজদ্দীনের মুষ্টিমেয় মোসলেম-সেনাদলকে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল।

পরবৎসর মুঈজদ্দীন পেশোওয়ার অভিযান করিয়া, কাশ্মীরের সীমা পর্য্যন্ত হস্তগত করেন। হিং ৫৭৮ সালে তিনি দেবাল রাজ্য আক্রমণ করিয়া সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড তাঁহার রাজ্যাধীন করিয়া লইলেন। ৫৮০ হিজরীতে লাহোরে আসিয়া সিয়াল্‌কোটে সোল্‌তান একটী সুদৃঢ়

দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ; এবং হোসায়েন কাবৃমিল্‌কে দুর্গ রক্ষক নিযুক্ত করিয়া রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মোহাম্মদ গোরী চলিয়া যাইবার পর, গজনবী বংশীয় শেষ রাজা সোলতান জাঁহান অনেক ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, সিয়াল্‌কোট দুর্গ অবরোধ করিলেন, কিন্তু অচিরেই তাঁহাকে হটিয়া আসিতে হইল।

এই সংবাদ পাইয়া মোহাম্মদ গোরী লাহোর যাত্রা করিলেন ও সোলতান জাঁহানকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। লাহোর এই বার সম্পূর্ণরূপে গোরাধিপতির রাজ্যে পরিণত হইল ; এবং মুলতানের শাসন কর্ত্তা আলি কাবৃমাথ্‌ লাহোর ও মুলতান উভয় স্থানের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক তব্‌কত নসিরী লেখক আবূ ওমর মেন্‌হাজ-উদ্দীনের পিতা মৌলনা আজুবাতো-জমান আফ্‌সাহল্‌-আজম সেরাজদ্দীন মেন্‌হাজ, হিন্দুস্থানের এই নব রাজত্বের প্রধান কাজী নিযুক্ত হইলেন।,

তৎপরে সোলতান মুইজদ্দীন মোহাম্মদ গোরী পুনরায় হিন্দুস্থানে প্রবেশ পূর্ব্বক লাহোরের এক শত মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে ও দিল্লীর ১৫০ মাইল উত্তরে স্থিত সাবৃহিন্দ দুর্গ আক্রমণ করিয়া উহা করায়ত্ত করিলেন, এবং কাজী জিয়াউদ্দীনের হস্তে উহা ন্যস্ত করিলেন। জিয়াউদ্দীন তোলাকি বংশের মাত্র ১২০০ শত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, তৎসাহায্যে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সোলতান মোহাম্মদ গোরী সাবৃহিন্দ জয়ের পর, গজনীর পথে অর্দ্ধেক দূর অগ্রসর হইতে না হইতে সংবাদ পাইলেন যে—আজ্‌মীরের রাজা পৃথ্বীরাজ ও দিল্লীশ্বর গোবিন্দ রায় ভারতের অন্যান্য অনেক রাজার সহিত মিলিত হইয়া, বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া সাবৃহিন্দ দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বীর-শার্দ্দূল মোহাম্মদ গোরী ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না

হইয়া, এই সমবেত হিন্দু-শক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার মুষ্টিমেয় মোস্‌লেম-সেনা লইয়া অগ্রসর হইলেন। মোহাম্মদ গোরী থানেশ্বর হইতে চতুর্দ্দশ মাইল দূরে সরস্বতী নাম্নী একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে—নদীর অপর পার্শ্বে হিন্দুগণের সমবেত রাজশক্তি, অন্যূন তিন সহস্র হস্তী, এক লক্ষ বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সেনা ও বহু পদাতিক সৈন্য লইয়া, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

অদম্য সাহসী দুর্দ্ধর্ষ মোস্‌লেম-বীর-সন্তানগণ ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া এবং যুদ্ধের ভাবী ফলাফল বিষয়ক চিন্তা বিন্দুমাত্র মনোমধ্যে উদিত হইবার অবসর না দিয়া, অমিত তেজে এই প্রকাণ্ড বাহিনীকে আক্রমণ করিল। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় সত্যধর্ম্মাবলম্বী বীরগণ অচিরে দেখিতে পাইল যে—সমুদ্র-বারির ন্যায় অসংখ্য বিধর্ম্মী সেনা দুই দিক হইতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে।

এই অবস্থা দর্শনে যুদ্ধব্যবসায়ী বীরগণ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ হটিয়া আসিয়া, তাহাদের প্রধান দলের সহিত মিলিত হইয়া বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান হইল। এই সময় সাগর-তরঙ্গের ন্যায় হিন্দুসেনা মোস্‌লেম-গণকে পুনরায় আক্রমণ করিল ও রাজা গোবিন্দ রায়, মহাসেনাপতি সোলতান মোহাম্মদ গোরীকে দেখিতে পাইয়া, রণমাতঙ্গ পৃষ্ঠে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।

বীর-কেশরী গোরীও ইহাই চাহিতেছিলেন, তিনি সিংহবিক্রমে রাজাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মুখবিবরে স্বীয় বর্শাফলক প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া, রাজার দুইটী দন্ত ভগ্ন করিয়া উহা তাঁহার গলনালীর মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন।

এই সময় মোহাম্মদ গোরীও বাহুতে গুরুতর আঘাত পাইয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় একজন সাহসী খিলিজী

বীর তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া, নিজ প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞানে তাঁহার পশ্চাতে তাঁহারই অশ্বোপরি ত্বরিতে উঠিয়া বসিলেন ও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সোল্‌তানের সেনাগণ তখন অধ্যক্ষহারা হইয়া প্রমাদ গণিতে লাগিল। তাহারা আর অধিকক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারিল না; ক্রমে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সোল্‌তানের দর্শন লাভ করিয়া মোস্‌লেম-সেনাগণ যেন প্রাণে শান্তি পাইল ও ক্রমে ক্রমে সকলে সমবেত হইয়া, পরে মোস্‌লেম-রাজধানী গজ্‌নীতে উপনীত হইল। (তব্‌কত নসিরী)

সোলতান মুঈজদ্দীন গজনী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ভ্রাতা গেয়াসউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গোর নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় হিন্দুস্থানের সমুদয় অবস্থা তাঁহার নিকট বিবৃত করিয়া জ্যেষ্ঠের অনুমতি লইয়া পর বৎসরেই ৫৮৮ হিঃ ১১৯২ খৃষ্টাব্দে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে আবার ভারতে প্রবেশ করিলেন।

মূঈনদ্দীন নামক এক ব্যক্তি যিনি এই অভিযানে সোল্‌তানের সঙ্গে ছিলেন তাঁহারই প্রমুখাৎ তব্‌কত নসিরীর ইতিবৃত্ত-লেখক অবগত হইয়াছিলেন যে—মোহাম্মদ গোরীর সহিত এইবার এক লক্ষেরও অধিক উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী বর্ম্মাবৃত সেনা ছিল।

সোল্‌তান সারহিন্দ দুর্গে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অবগত হইলেন যে—হিন্দু সেনাগণ দীর্ঘ ১৩ তের মাস কাল দুর্গাবরোধ করিয়া থাকায়, দুর্গাভ্যন্তরস্থ অত্যল্প সংখ্যক মোস্‌লেম-সেনা বাধ্য হইয়া শেষে তাহাদের নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়াছে; এবং শত্রু-সৈন্য সরস্বতী নদী-তীরে নারায়ণ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছে।

এবার ভারতের প্রায় সমুদয় হিন্দু রাজশক্তি সমবেত হইয়া, মোস্‌লেম-অসির বল পরীক্ষার্থে প্রস্তুত হইয়াছিল। তাঁহাদের সমবেত সৈন্য, সংখ্যায় অন্যূন তিন লক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র হস্তী ও তদুপরি অগণিত পদাতিক সেনা ছিল।

উভয় সেনা সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে স্বল্পায়তন ও স্বল্পসলিলা সরস্বতী নদী মাত্র ব্যবধান। যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ সোল্‌তান এই অবকাশে তাঁহার সৈন্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি তাঁহার সেনাগণের মধ্য হইতে অধিকাংশ, রণ-পতাকা ও হস্তীসহ পশ্চাতে রক্ষা করিয়া, ৪০,০০০ সহস্র বর্শাধারী অশ্বারোহী সেনাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে চারিজন উপযুক্ত সেনানীর অধীনে দিলেন ও সম্মুখ পশ্চাৎ দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে হিন্দু সেনা-গণকে প্রথমতঃ অনবরত শর নিঃক্ষেপে উত্যক্ত করিতে উপদেশ দিলেন।

মরুভূমির বালুকারাশি সম অগণ্য হিন্দুসৈন্য, অগ্রপশ্চাৎ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, মহাসেনাপতি সোল্‌তান মোহাম্মদ, যেন পলাইয়া যাইতেছেন এইরূপ যুদ্ধ কৌশল বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন। হিন্দু সেনাগণ ইহাতে অধিকতর উৎসাহিত হইয়া যেমন শ্রেণী ভঙ্গ করিয়া দ্রুতবেগে মোস্‌লেমগণের প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল, অম্‌নি সুচতুর রণ-পারদর্শী অপ্রতিমতেজাঃ সোল্‌তান গোরী, তাঁহার পৃথক-করিয়া-রাখা সমস্ত যুদ্ধ দুর্ম্মদ সৈন্য লইয়া অপরিণামদর্শী হিন্দু যোদ্ধাগণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সুশিক্ষিত আফ্‌গান ও তুর্কগণের বজ্র-মুষ্টি-ধৃত তরবারি ও ভল্ল সম্মুখে, তাহাদের অপেক্ষা শারীরিক ও মানসিক বলে দুর্ব্বল ক্ষীণকায় হিন্দুসেনাগণ সংখ্যায় তাহাদের চতুর্গুণ হইলেও, অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না।

অত্যল্প সময় মধ্যেই হিন্দুগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পরাজয়ের করাল মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতে লাগিল। এবং কিছুক্ষণ মধ্যে অধিকাংশই ভূতলশায়ী হইল, অবশিষ্ট পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

এই ঘোরতর যুদ্ধমধ্যে আজমীরেশ্বর পৃথ্বীরাজ তাঁহার গজপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বারোহণে সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে ছিলেন। কিন্তু অচিরেই মোস্‌লেমগণ সরস্বতী-তীরে তাঁহাকে ধৃত ও সংহার করিল। দিল্লীশ্বর গোবিন্দরায়ও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন; সোল্‌তান তাঁহার ভগ্ন দন্ত দুইটী দেখিয়া তাঁহার খণ্ডিত মস্তক চিনিতে পারিয়াছিলেন।

যুদ্ধাবসানে আজমীর, দিল্লী, সমস্ত সাওয়ালেক প্রদেশ, হংসী, সামানা ও কাহ্‌রাম, সোল্‌তান মোহাম্মদ গোরীর পদানত হইল ও বিজয়ী সেনাগণের হস্তে রাশীকৃত ধনরত্ন পতিত হইল।

মোহাম্মদ গোরী স্বয়ং আজমীরে গিয়া ঐ নগর অধিকার করিলেন। পৃথ্বীরাজপুত্র গোলা তাঁহাকে বিস্তর উপঢৌকন দিয়া, গোরের করদ রাজা হইয়া থাকিতে স্বীকৃত হওয়ায়, সোল্‌তান তাঁহাকে আজমীরে তাঁহার পিতৃসিংহাসনে বসাইয়া, তথায় যাহাদিগকে বন্দি করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়া, বিজয়ী সৈন্য লইয়া দিল্লীতে উপনীত হইলেন। আজ্‌মীরে সোল্‌তান কয়েকটী মস্‌জিদ ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন।

দিল্লীশ্বরের পুত্র, বিজয়ী বীরকে গোলার ন্যায় বহু ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করায়, তিনি দিল্লীর লুণ্ঠনাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক, স্বীয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ কোতব-উদ্দীনকে অনেক সেনাসহ কাহ্‌রাম ও সামানা দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া গজনী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে মোহাম্মদ গোরী ইন্দ্রপ্রস্থ-রাজধানীতে তাঁহার অনেক সৈন্য রাখিয়া গেলেন।

এই বৎসরই কোতব-উদ্দীন সসৈন্যে কাহরাম দুর্গ হইতে বাহির হইয়া মিরাট আক্রমণ করিয়া উহা হস্তগত করেন; তৎপরে গোবিন্দরায়ের পুত্রের নিকট হইতে দিল্লী নগরী হস্তচ্যুত করিয়া লইলেন। (হিঃ ৫৮৯ খৃঃ ১১৯৩) পরে তথা হইতে কোল দুর্গ (আধুনিক আলিগড়) দখল করিয়া সেইস্থানে কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন।

হিঃ ৫৯০ সালে সোল্‌তান মোহাম্মদ গোরী পুনরায় ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন; এবার যমুনা-তীরবর্ত্তী এটাওয়ায় পৌছান পর্য্যন্ত তিনি কোন স্থানে বাধা প্রাপ্ত হয়েন নাই। এই স্থানে কান্যকুব্জ-রাজ জয়চন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার পথরোধ করেন; কিন্তু সামান্য যুদ্ধের পর হিন্দুগণ সম্পুর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। সোলতান, কনোজ লুণ্ঠন করিয়া আসাই বা আসনি দুর্গ হস্তগত করিয়া তথা হইতে বিস্তর ধনরত্ন ও অন্যূন তিনশত রনকরেণু সংগ্রহ করিয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বারাণসী নগরী বিনা আয়াসেই মোসলেমগণের হস্তগত হইল। এই স্থানে ধর্ম্মপ্রাণ মোস্‌লেম সৈনিকগণ উত্তেজিত হইয়া, হিন্দুদিগের অনেক দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছিল।

বারাণসী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সোলতান, তাঁহার বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ ও পরে তাঁহার গৃহীত পোষ্যপুত্র কোতব উদ্দীনকে স্থায়ীভাবে তাঁহার ভারতীয় রাজ্যের প্রতিনিধি (সুবাদার) স্বরূপ দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া গজনীর পথে অগ্রসর হইলেন।

সোল্‌তান সিন্ধু নদী পার হইতে না হইতে মৃত আজমীর-রাজের জনৈক আত্মীয় হেমরাজ, পৃথ্বীরাজপুত্র গোলার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। গোলা অগত্যা কোতব উদ্দীনের আশ্রয় গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে কোতব, কতকগুলি সৈন্য লইয়া আজমীরে গিয়া তথায় গোলাকে মস্‌নদে বসাইয়া চলিয়া আসিলেন।

এই বৎসর কোতবউদ্দীন মোস্‌লেমগণের হিজরী ৫৭৪ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য গুজরাট আক্রমণ করিয়া ও তথাকার রাজা ভীম দেবকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া, তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠনপূর্ব্বক বিজয় গর্ব্বে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অতঃপর ৫৯৯ হিজরীতে সোল্‌তান মোহাম্মদ গোরী ভারতে শেষ পদার্পণ করেন, কিন্তু বিয়ানা দুর্গ অধিকার করার পরই তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। এই সময় সোল্‌তান মুঈজদ্দীন, তুস ও সারাখ্‌সের মধ্যবর্ত্তী পথে শুনিতে পাইলেন যে—তাঁহার অগ্রজ সোল্‌তান সৈয়দ গেয়াস উদ্দীন হিরাত নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

ভ্রাতার মৃত্যুর পর সোল্‌তান মুঈজদ্দীন মোহাম্মদ গোরী, গোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিন বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ভারতের বিষয় তাঁহাকে চিন্তাও করিতে হয় নাই। ভারতবর্ষের রাজত্ব, সোল্‌তান তাঁহার চিরবিশ্বস্ত সুবাদার কোতব উদ্দীনের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

১২০৬ খৃষ্টাব্দে সোল্‌তান মোহাম্মদ গোরী পার্ব্বতীয় কোখায় জাতির বিদ্রোহ দমন করিয়া গজ্‌নীর পথে ফিরিবার জন্য অগ্রসর হয়েন, কিন্তু পথিমধ্যে বিদ্রোহীগণের হস্তে, তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হয়। এই শেষ তিন বৎসর লইয়া; গাজী সৈয়দ সোল্‌তান মুইজদ্দীন মোহাম্মদ গোরী, মোট তেত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গজনীর ও গোরের সম্রাট মোহাম্মদ গোরী ও তাঁহার সেনাপতি দিল্লীশ্বর কোতব উদ্দীনের বিষয়, যাহা কিছু এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইতেছে; তাহার অধিকাংশ তাঁহাদের সমসাময়িক ঐতিহাসিক হাসান্‌ নেজামীর তাজুল্‌ মোয়াসির, এবং জগৎপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মেন্‌হাজউদ্দীন ওস্‌মানের তব্‌কতে নসিরী হইতে উদ্ধৃত হইল। শেষোক্ত ঐতিহাসিক তাঁহার

জীবনের অধিকাংশ সময় দিল্লীর সম্রাট-দরবারে কাটাইয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় হইতে আরম্ভ করিয়া গোয়ালিয়র, মাল্‌ওয়া কালিঞ্জর, গুজরাট, লাহোর প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান জনপদগুলি পরিদর্শন করিয়া, ঐ সমস্ত দেশের অবস্থা বিশেষরূপে তাঁহার প্রণীত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

একাদশ সর্গ

দিল্লী—ইন্দ্রপ্রস্থ

সোলতান কোতবউদ্দীন

কোতবউদ্দীন তুর্কিস্থানের অধিবাসী ছিলেন। বাল্যকালে, কুফার এমাম্ শ্রেষ্ঠ হজরৎ আবু হানিফার (রঃ) বংশধর কাজী জাফর্ উদ্দীন আবদুল আজিজ তাঁহাকে একজন ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ক্রয় করেন। তৎকালে কাজী সাহেব নিশাপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

কাজী আবদুল আজিজ বালক ভৃত্যকে স্বীয় পুত্রগণের সহিত লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। কোতবও অল্প দিন মধ্যে নিজের অসামান্য মেধা ও তৎসঙ্গে অশ্বারোহণ-কৌশল ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। আবদুল আজিজের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কোতব্‌কে গজনীর একজন দাস-ব্যবসায়ীর নিকট বহুমূল্যে বিক্রয় করিলেন। পরে উক্ত দাস-ব্যবসায়ী এই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ক্রীতদাসটীকে সোল্‌তান মুঈজ উদ্দীন মোহাম্মদকে উপহার দিয়া তৎপরিবর্ত্তে সোল্‌তানের নিকট হইতে বহু অর্থ পাইয়াছিলেন। কোতবের দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা অঙ্গুলিটী বাল্যকালেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এইজন্য সোল্‌তান আদর করিয়া তাঁহাকে 'আয়বক্' অর্থাৎ অঙ্গহীন বা প্রিয় পাত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কোতবউদ্দীনও সেই 'অঙ্গহীন' উপাধিতে আপনাকে

গৌরবান্বিত মনে করিয়া, তাঁহার স্থাপিত মোস্‌লেম-ভারত-বিজয়-স্তম্ভ দিল্লীর কোতব-মিনার গাত্রে স্বীয় উপাধি "আয়বক্" খোদিত করিয়া গিয়াছেন।

সোল্‌তান মুঈজ উদ্দীন মোহাম্মদ মধ্যে মধ্যে গীত বাদ্য ও উৎসবের আয়োজন করিতেন। একদা এইরূপ আনন্দোৎসবের পর ভোজনান্তে তিনি আনন্দিত চিত্তে দাসদাসীগণের মধ্যে বিস্তর ধন ও স্বর্ণ রৌপ্য বিতরণ করিয়াছিলেন। কোতব উদ্দীনও এই উপলক্ষে তাঁহার প্রাপ্য অংশ পাইয়াছিলেন। কিন্তু বাহিরে গিয়া তিনি তাঁহার প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ও সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্য তুর্কী সেনা, প্রহরী ও ফাররাসগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে সোল্‌তান এই সংবাদ পাইয়া ও কোতব উদ্দীনের মহানুভবতা উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকে একটী দায়িত্বপূর্ণ রাজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই প্রকারে দিনে দিনে তাঁহার উন্নতি হইতে হইতে শেষে ক্রীতদাস কোতব উদ্দীন, সোলতানের রাজকীয় অশ্বশালার তত্ত্বাবধায়ক পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় হইতেই ক্রমশঃ কোতবের পদোন্নতি হইতে লাগিল।

এই সময়ে খোয়ারিজম্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সোল্‌তান সাহেব বিরুদ্ধে মোহাম্মদ গোরী যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী কোতব উদ্দীনকে এক সময় অশ্বের খাদ্য সংগ্রহের জন্য অল্পমাত্র সঙ্গী লইয়া, সেনা-নিবাস হইতে কিছু দূরে যাইতে হইয়াছিল। সে সময়ে পথে শত্রুসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি, এই খণ্ড যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে বিপক্ষ হস্তে বন্দী হইয়া সোল্‌তান সাহের নিকট নীত হয়েন ও তথায় কারারুদ্ধ হইয়া থাকেন।

সোল্‌তান্ সাহের সহিত যুদ্ধে মোহাম্মদ গোরীর পরিশেষে জয় হইল। তখন বিজয়ী সেনাগণ কোতব উদ্দীনকে কারামুক্ত করিয়া শৃঙ্খলিত

অবস্থাতেই তাঁহাকে সোল্‌তান মুঈজউদ্দীনের সমীপে উপস্থিত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সোলতান, তাঁহার উপর কাহ্‌রাম দেশের শাসনভার অর্পণ করিলেন। এই স্থান হইতে কোতবউদ্দীন মিরাট্‌ জয় করেন ও পরে মিরাট্‌ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দিল্লী হস্তগত করেন।

মিরাট ও দিল্লী জয়-কালে মোসল্‌মান সেনাগণ ক্রুদ্ধ ও ধর্ম্মান্ধ হইয়া যে সকল দেবমন্দির ধ্বংস করিয়াছিল; কোতবউদ্দীন সেই সকল স্থানে একেশ্বর উপাসনার জন্য মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

এই সমস্ত যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত থাকা-কালে রণতম্বর হইতে তথাকার শাসনকর্ত্তা কেওয়াম-উল্‌-মুল্‌ক্‌ হাম্‌জা, সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে—মৃত আজমীর-পতির ভ্রাতা হিরাজ, বিদ্রোহী হইয়া পৃথ্বীরাজপুত্রকে তথা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে, এবং আজমীর-রাজ রণতম্বরে, আসিয়া তাহার নিকট আশ্রয় লওয়ায়, হিরাজ তাঁহার রাজ্য পর্য্যন্ত আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

এই সংবাদ পাইয়া কোতব উদ্দীন সেই সময়ের সৎসাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমীর সবিকুল্‌-মুল্‌ক্‌ নসর্‌ উদ্দীনের উপর তাঁহার অবর্ত্তমানে রাজ্যরক্ষার ভারার্পণ করিয়া, মরুদেশ ও পর্ব্বত উলঙ্ঘন পূর্ব্বক রণতম্বরন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হিরাজ, বীরপুঙ্গব কোতবউদ্দীনের আগমন সংবাদ পাইয়াই আজমীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। পৃথ্বীরাজপুত্র তাঁহার হৃত সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন ও উপঢৌকন স্বরূপ তিনি কোতবউদ্দীনকে অপরাপর বহু মূল্যবান দ্রব্যের সহিত তিনটী স্বুবর্ণ নির্ম্মিত বৃহদাকারের তর্‌মুজ পাঠাইয়া দিলেন।

কোতব উদ্দীন দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তাঁহার এই সমস্ত বিজয়-বার্ত্তা স্বহস্তে গোর-পতির নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। সোল্‌তান

মুঈজউদ্দীন গোরী, এই আনন্দ-সংবাদ পাইয়া কোতব উদ্দীনকে স্বীয় রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

গজ্‌নী পৌছিয়া কোতবউদ্দীন সম্রাটের হস্ত চুম্বনের অধিকার পাইয়াছিলেন; এবং সোলতান গোরী তাঁহাকে পৃথিবীর যাবতীয় রাজন্যবর্গের অপেক্ষা অনেক উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিয়া, বিস্তর মণিমুক্তা, মূল্যবান যুদ্ধাস্ত্র, খেল্‌য়াত ও দাস দাসী উপহার দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সোলতান প্রধান মন্ত্রী জিয়াউল্‌ মুল্‌কের উদ্যান-বাটীতে অতিশয় সমারোহের সহিত ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোতবউদ্দীন হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়ায়, সোলতান তাঁহাকে নিজপ্রসাদে লইয়া গিয়াছিলেন।

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কায়মানের শাসনকর্ত্তা তাজ-উদ্দীন এল্‌দাজ, কোতবের প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বহু অনুরোধে কয়েক দিবস স্বীয় রাজধানীতে অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। শেষে তাঁহার পরমা সুন্দরী কন্যাকে অনেক যৌতুকের সহিত কোতব উদ্দীনের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

কোতব উদ্দীন দিল্লী ফিরিয়া আসিয়া নগরের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইলেন।

১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কোতব উদ্দীন গজনীপতির পুনঃ ভারত-আগমনের সংবাদ পাইয়া, একটী হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণ বোঝাই করিয়া ও উৎকৃষ্ট একশত অশ্ব সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

এই অভিযানে কোতবউদ্দীন সম্রাটকে পঞ্চাশৎ সহস্র বর্ম্মধারী উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সেনা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং এই সৈন্য লইয়াই কোতবের সাহায্যে সোলতান, অনায়াসে কান্যকুব্জ ও বারাণসী জয় করিয়াছিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে সোলতান মোহাম্মদ গোরী থানগড় (আধুনিক বিয়ানা) দুর্গের নিকট দিয়া যাইবার কালে দুর্গের দিকে একবার চক্ষু ফিরাইলেন। দুর্গাধিপ কুঙার পাল সকলের সমক্ষে তাঁহার প্রসিদ্ধ দুর্গের দৃঢ়তা ও তাঁহার সেনাবলের অহঙ্কার করিতেন; কিন্তু সোল্‌তানের অধীনস্থ মোস্‌লেম বীরগণের অলোক-সামান্য দৃঢ়তা ও তেজোব্যঞ্জক আকৃতি দেখিয়া দুর্গাধ্যক্ষ মনে মনে প্রমাদ গণিতে লাগিলেন, এবং যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই সম্রাটের সমক্ষে আগমন করিয়া নিজের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে ভূপতিত হইয়া মৃত্তিকা চুম্বন করিলেন।

সোল্‌তান থানগড়ের রাজত্বে বাহাউদ্দীন তোঘরিল নামক একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, গোয়ালিয়রের দিকে অগ্রসর হইলেন। হিঃ ৫৯২।

গোয়ালিয়র দুর্গ তৎকালীন ভারতের দুর্গমালার মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি-শালী ও সংরক্ষিত দুর্গ ছিল। ইহা একটী উচ্চ পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। মোহাম্মদ গোরীর আজ্ঞা পাইয়া যখন তাঁহার বীর সেনাগণ একত্রে তাহাদের রক্তপিপাসু তরবারিগুলি শত্রুর চক্ষুর সমক্ষে উন্মুক্ত করিল; তখন তাহাদের উজ্জ্বল প্রভা বিদ্যুতের ন্যায় বিধর্ম্মীগণের চক্ষু ঝলসাইয়া দিতে লাগিল। পৌত্তলিকগণ দিব্য চক্ষে ঐ তীক্ষ্ণধার অসির চাকচিক্যের মধ্যে যেন কাল সর্পের সুতীক্ষ্ণ বিষদন্ত দেখিতে পাইয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া গেল।

রায় শশাঙ্ক পাল বহু উদ্যম এবং বহু চেষ্টা করিয়াও কোন মতে তাঁহার সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যে দিকেই তিনি ফিরিতে লাগিলেন, সেই দিকে দেখিতে পাইলেন যেন বিপদ করাল মুখ ব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছে। এই সময় এস্‌লামের রণ-উল্লাস "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি, ক্ষণে ক্ষণে

তাঁহার কর্ণ বধির করিতে লাগিল। রাজা শশাঙ্ক পাল ভয়ে বিহ্বল হইয়া সোলতানের অধীনতা স্বীকার করিলেন ও তাঁহার করদ রাজা হইয়া থাকিত বাধ্য হইয়া, তাহার নিদর্শন স্বরূপ দশটী হস্তীপৃষ্ঠে অনেক উপঢৌকন বোঝাই করিয়া সোলতান সমীপে পাঠাইয়া দিলেন।

সোলতান গোয়ালিয়র-রাজকে স্বীয় করদ রাজা মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়া, তথা হইতে গজনী প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কোতব উদ্দীন তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়া দিল্লী ফিরিয়া গেলেন।

১১৯৫ খৃষ্টাব্দে কোতব উদ্দীন আজমীরের বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া গুজরাটের নাহারওয়ালা প্রদেশের উন্নত অবস্থা দেখিয়া ও তথাকার রাজার আন্তরিক মোসলেম-বিদ্রোহিতার পরিচয় পাইয়া, তাহার রাজ্য আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন; এবং সেইদারুণ গ্রীষ্মের সময় একদিন প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সিংহ-বিক্রমে তাহার উপর আপতিত হইলেন। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পর হইতে গ্রীষ্ম ক্রমশঃ অসহ্য হইতে থাকায়, লৌহ-বর্ম্মাবৃত মোস্‌লেম সেনাগণ রণক্ষেত্রে আর তিষ্ঠিতে পারিল না, শেষে তাহাদিগকে আজমীরের পথে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতে হইল।

ইহার পরই কোতব উদ্দীন গজনীর মহোন্নত রাজাধিরাজ সোল্‌তান মোহাম্মদ গোরীর নিকট এই সমস্ত অবস্থা লিখিয়া রাজ্যশাসন ও বিস্তার কার্য্যে সম্রাটের অনুমতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সোলতান মহাপরাক্রমশালী রাজ-প্রতিনিধির এবম্বিধ নম্রতা দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, কোতব উদ্দীনের উপর তাঁহার অধীনস্থ হিন্দুস্থান-সম্বন্ধে যদৃচ্ছা শাসনের অনুমতি প্রদান করিলেন; তৎসঙ্গে তাঁহার সাহায্যার্থে জাঁহান পাহালওয়ান আসাফ উদ্দীন আরস্‌লান, নাসের উদ্দীন হোসায়েন, ইজ্জত উদ্দীন, এবং সরফ উদ্দীন মোহাম্মদ জারাহ্‌ নামক বিখ্যাত সেনাপতিগণের অধীনে বহু তুর্ক সেনা পাঠাইয়া দিলেন।

গজ্‌নী হইতে এই অদম্য সাহসী বীরবাহু মোস্‌লেম সেনাদল শীত ঋতুর প্রারম্ভেই আসিয়া, কোতব উদ্দীনের সৈন্যগণের সহিত যোগ দিল। তৎপরে বীর-কেশরী কোতব উদ্দীন, এই সেনা সম্ভার লইয়া ৫৯৩ হিজরীর সফর মাসের মধ্যভাগে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে নাহার-ওয়ালা দমনে বহির্গত হইলেন।

পালি ও নন্দুল পার্ব্বতীয় দুর্গ সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে—"জড়োপাসক" পেচকেরা তাহাদের গর্ত্ত ছাড়িয়া মোস্‌লেম সেনার আগমন-বার্ত্তা পাইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। তৎপরে অনুসন্ধান করিতে করিতে অবগত হইলেন যে—তাহারা তাহাদের দলপতি কর্ণরায় ও ভীম দেবের অধীনে, আবু পর্ব্বতের নিম্ন দেশে একটী গিরিবর্ত্মের প্রবেশ-দ্বারে অবস্থান করিতেছে।

এই স্থানে ইতি পূর্ব্বে জগৎ প্রসিদ্ধ বীর সোলতান মোহাম্মদ শ্যাম গোরী আহত হওয়ায়, কোতব এই স্থানটীকে অশুভ স্থান জ্ঞানে, হিন্দু সৈন্যগণকে তথায় আক্রমণ করিতে বিরত হইলেন।

বিধর্ম্মী জড়োপাসকগণ মোস্‌লেম-সেনাগণের এই দ্বিধা অবলোকন করিয়া, ইহা ভীরুতার লক্ষণ বিবেচনায় গিরিবর্ত্ম পরিত্যাগে ক্রমে মোস্‌লেম সেনার সম্মুখীন হইল, এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয় সেনা পপস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে থাকিল; কেহ কাহাকে আক্রমণ করিল না।

১৩ই রবিওল্ আউঅল্ শনিবার দিবা গতে রাত্রে, মোস্‌লেম সেনা শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া, প্রাতে বিধর্ম্মীগণের উপর বীর হুঙ্কারে নিপতিত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা পৌত্তলিক রক্তের নদী বহাইয়া, বেলা দুই প্রহরের মধ্যে, জড়োপাসকগণকে প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল। হিন্দুগণের অধিকাংশ নেতা মোস্‌লেম সেনা

হস্তে বন্দি হইল। এই সময় মধ্যে প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র হিন্দু সেনা, রণক্ষেত্রে মোস্‌লেম তরবারির আঘাতে ভূলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, অবশিষ্ট বিধর্ম্মীগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পার্ব্বত্য অরণ্যে ও পর্ব্বত-গুহায় লুক্কায়িত হইয়া জীবন রক্ষা করিল। রাজা কর্ণরায় ইতিমধ্যে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

বিধর্ম্মীগণের স্তূপাকার মৃত দেহে পর্ব্বত ও উপত্যকা ভূমি একাকার হইয়া গেল। এই যুদ্ধে মোস্‌লেম-সেনাগণ বিংশতি সহস্রাধিক হিন্দুসেনা বন্দি করিয়াছিলেন ও তৎসঙ্গে বহু হস্তী, অশ্ব ও যুদ্ধাস্ত্র তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল।

যুদ্ধাবসানে সুদৃশ্য নদ নদী ও উর্ব্বরা ক্ষেত্র পরিপূর্ণ নাহারওয়ালা রাজত্ব (অর্থাৎ নদী পরিপূর্ণ ভূভাগ) এবং সমস্ত গুজরাট প্রদেশ তেজস্বী মোস্‌লেম বীরগণের হস্তগত হইল। বিজয়ী মোস্‌লেম বীর কোতব উদ্দীন, গুজরাটের সুশাসনের বন্দোবস্ত করিয়া তথা হইতে আজমীরের ভিতর দিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৫৯৯ হিজরী ১২০২ খৃষ্টাব্দে কোতব উদ্‌দীন কালিঞ্জর আক্রমণে বহির্গত হইলেন। এই অভিযানে কোতব পুত্রাপেক্ষা প্রিয় পাত্র, তাঁহার জামাতা সাম্‌স-উদ্দীন আলতামাশ্‌কে তাঁহার সঙ্গে লইয়াছিলেন। কালিঞ্জর-রাজ পরমার, খোলা ময়দানে মোস্‌লেম যোদ্ধাগণের সহিত কিছুক্ষণ যুঝিয়া, শেষে জঙ্গল মধ্যে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন, কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই আবার কোতব উদ্দীনের নিকটে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। রাজার পূর্ব্বপুরুষগণ সোল্‌তান মাহ্‌মুদের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছিলেন, বশ্যতা স্বীকার করায় দিল্লীশ্বর কোতব উদ্দীনও তাঁহার প্রতি সমভাবে সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

রাজা পরমারের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার দেওয়ান অজদেব,

সিংহাসনারূঢ় হইয়া দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন ও ঐ বৎসরই ২০ রজব সোমবারে মোস্‌লেম-বাহিনীর সহিত যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, তদবধি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন।

এস্‌লাম সন্তানগণ সগর্ব্বে আবার কালিঞ্জরের প্রসিদ্ধ সুদৃঢ় দুর্গ হস্তগত করিল। এবার নগরের সমস্ত দেবালয়গুলি ভূমিসাৎ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থানে সুদৃশ্য মস্‌জিদ নিৰ্ম্মাণ আরম্ভ হইল। কিছুদিন মধ্যে পবিত্র আজান ধ্বনিতে এককালের ঘোর ঈশ্বর-বিদ্রোহী প্রতিমা পরিপূরিত কালিঞ্জর নগর মুখরিত হইয়া উঠিল। এই সময় পৌত্তলিকতার চিহ্নমাত্র কালিঞ্জরে অবশিষ্ট রহিল না। প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র বিধর্ম্মী পৌত্তলিক খোদা মন্দরানে, সমবেত হইয়া কেহ ইচ্ছায়, কেহ অনিচ্ছায় ও ভয়ে যখন পবিত্র এসলাম ধর্ম্মের শীতল ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের কৃষ্ণবর্ণে সমতল-ক্ষেত্র মসীময় বিবেচিত হইতে লাগিল। কোতব উদ্দীন কালিঞ্জরের বিজিত সিংহাসনে হাজ্‌বার-উদ্দীন হাসানুকে বসাইয়া, রোহিলখণ্ড প্রদেশের বাদাউনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সময় গজনীর অধীশ্বর সোল্‌তান মোহাম্মদ গোরী, কোতব উদ্দীনের নিকট পত্র প্রেরণ দ্বারা তাঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন অবগত করিলেন, এবং এই সঙ্গে অধিকতর আত্মীয়তার নিদর্শন স্বরূপ বারাণসী-জয়ে প্রাপ্ত অতীব সুদৃশ্য শ্বেত হস্তিটী তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কোতব উদ্দীন যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, গজনীপতি-প্রদত্ত এই হস্তীতে তিনি প্রায়ই আরোহণ করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সম্রাট কোতব উদ্দীনের অকস্মাৎ মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে ঐ শ্বেত হস্তীরও প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল।

হিং ৬০২ সালে কোতব উদ্দীন লাহোর যাত্রা করেন ও সেই বৎসর ১৮ জেল্‌কদ মঙ্গলবারে তিনি লাহোরের সিংহাসনে রাজাধিরাজরূপে

অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর সম্রাট গজনী গমন করিয়া ও রাজধানী সোলতান মোহাম্মদ গোরীর ভ্রাতুষ্পুত্র গেয়াস্‌-উদ্দীন মাহ্‌মুদ মোহাম্মদ শ্যামের হস্তচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনারূঢ় হইয়া, মাত্র চল্লিশ দিন তথায় অবস্থান ও রাজত্ব করিলেন; তৎপরে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হিঃ ৬০৭ সালে ১২১০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কোতব উদ্দীন লাহোরে অশ্বারোহণে চৌগান (পলো) খেলিবার কালে দৈবক্রমে অশ্ব হইতে পড়িয়া যান; সঙ্গে সঙ্গে অশ্বটীও তাঁহার উপর আসিয়া পড়ায়, জিনের লৌহ নির্ম্মিত উচ্চ ভাগটী সম্পূর্ণরূপে সম্রাটের বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইয়া তাঁহর মৃত্যু হয়।

কোতব উদ্দীন বিংশতি বৎসর কাল রাজত্ব করেন, তন্মধ্যে শেষ চারি বৎসর তিনি পারশ্য, ইস্পাহান,, গজ্‌নী ও আসমুদ্র ভারতের অর্দ্ধেকাংশের রাজাধিরাজ হইয়া দিল্লীর সিংহাসন আলোকিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে তদীয় সেনাপতি এখ্‌তিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজী বাঙ্গালা বেহার জয় করেন।

(তাজুল মায়াসীর)

দ্বিতীয় খণ্ড।

বাঙ্গালায় মোসল্‌মান রাজত্ব

নবদ্বীপ, লক্ষণাবতী (গৌড়), সুবর্ণগ্রাম, পাণ্ডুয়া,
খওয়াস্‌পুর-টাঁড়া, রাজমহল, ঢাকা ও
মুর্শিদাবাদ,—পলাসীক্ষেত্র
খৃঃ ১২০৩—১৭৫৭

প্রথম সর্গ

গাজী এখ্‌তিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজী।

বখ্‌তিয়ার বাল্যকাল হইতেই অতিশয় সাহসী, বুদ্ধিমান ও উদ্‌যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই তাঁহার জন্মস্থান ও আত্মীয় স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রথমতঃ গোর ও তথা হইতে ক্রমে গজ্‌নীতে আসিয়া সোল্‌তান সৈয়দ মুইজুদ্দীন মোহাম্মদ গোরীর শরণাপন্ন হন, এবং তথাকার রাজদরবারে দিওয়ানেআরজে (আরজীর দপ্তর খানায়) চাকুরী প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এই মসীজীবীর কার্য্য তাঁহার মনঃপুত না হওয়ায়, তিনি এই উপজীবিকা পরিত্যাগপূর্ব্বক গজ্‌নী হইতে হিন্দুস্থানে চলিয়া আসিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দিল্লীতেও লেখনী ধারণ ব্যতীত জীবিকা উপার্জ্জনের

অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি অধুনিক রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত বাদাউন নগরে গিয়া, তথাকার পরাক্রান্ত শাসনকর্ত্তা হেজ্‌বার উদ্দীন হাসানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার সেনাদলে ভর্ত্তি হইলেন।

কিছুদিন পরে বখ্‌তিয়ার অযোধ্যায় গিয়া মালেক হেসাম উদ্দীনের অশ্বারোহী সেনাদলে মিশিয়া, কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহ দমনে অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশ করায়; তাঁহার নিকট হইতে সাল্‌মাত ও সাহ্‌লাস্ত নামক দুইটী গ্রামের জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সময় হইতেই বখ্‌তিয়ারের উন্নতির সূত্রপাত্র হইল। এখান হইতে তিনি বেহার ও মুঙ্গেরে কয়েকটী ক্ষুদ্র অভিযান করিয়া অশ্ব ও যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া খিলিজী বংশের অনেক লোক দলে দলে তাঁহার পতাকার নিম্নে আসিয়া জুটিতে লাগিল। ক্রমে বখ্‌তিয়ার খিলিজীর বীরত্ব কাহিনী দিল্লীর সোল্‌তান কোতব উদ্দীনের কর্ণগোচর হওয়ায়, গুণগ্রাহী সম্রাট গুণের পরিচয় পাইয়া, বখ্‌তিয়ার খিলিজীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ খেল্‌য়াত, কটীবন্ধ ও তরবারি উপহার পাঠাইয়া দিলেন।

বখ্‌তিয়ার খিলিজী, স্বভাবসুন্দর তুর্ক জাতির মধ্যে অতিশয় কদাকার-দর্শন ছিলেন; এবং তাঁহার জীবনের প্রারম্ভকাল হইতে সকল স্থানেই উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের চক্ষুশূল হইবার ইহাও তাঁহার একটী প্রধান কারণ ছিল। তাঁহার এই কদর্য্য চেহারা ও অসুষ্ঠু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আরও কদর্য্যতা বৃদ্ধি করিয়াছিল তাঁহার বাহু যুগল। হাত দুইখানি তাঁহার এতাধিক অপরিমিত লম্বা ছিল যে—বখ্‌তিয়ার সোজা হইয়া দাঁড়াইলে তাঁহার হস্তের অঙ্গুলি তাঁহার জানুসন্ধির অনেক নীচে আসিয়া পৌছিত।

দিল্লীশ্বরের উৎসাহ পাইয়া বখ্‌তিয়ার পূর্ণতেজে বেহার আক্রমণ করিলেন। ৬৯৬, হিঃ ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ—

এই অভিযানে বীরপুঙ্গব বখ্‌তিয়ার খিলিজী মাত্র দুইশত অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে বিহার দুর্গের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্য মধ্যে নেজাম উদ্দীন ও শামস্‌-উদ্দীন নামক দুই ভ্রাতা ছিলেন। তবকতে নসিরী ইতিবৃত্তলেখক আবু-ওমর মেন্‌হাজুদ্দীন খৃষ্টীয় ১২৪৩ সালে লক্ষণাবতী নগরে উক্ত শামস্‌-উদ্দীনের মুখে মগধ আক্রমণ-সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বীয় ইতিহাসে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"যখন এই মাত্র দুইশত মোস্‌লেম অশ্বারোহী, অদম্য সাহসী বীরকেশরী বখ্‌তিয়ারের অধীনে বিহার দুর্গদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন মগধ-রাজ তাঁহার সমুদয় সৈন্য লইয়া, অতি অল্পক্ষণের জন্য দুর্দ্ধর্ষ এসলাম সন্তানগণকে বাধা প্রদান করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শেষে মগধ-রাজ এই মুষ্টিমেয় বীরগণের শৌর্য্য বীর্য্য দর্শনে ভীত হইয়া নির্লজ্জভাবে রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। পূর্ব্বভারতের বিদ্যাভ্যাসের কেন্দ্র বিহার, তখন বিনা আয়াসেই মোস্‌লেমগণের হস্তগত হইল। বখ্‌-তিয়ারের সেনাগণ দুর্গ প্রবেশে লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিল। মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণগণ যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল; এই সময়ে তাহাদের মধ্যে অনেককেই যে উত্তেজিত সেনাগণের তরবারির নিম্নে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয় নাই তাহা নহে। পরে রাশীকৃত পুস্তক, বিজেতাগণের হস্তগত হওয়ায়, তাঁহারা তখন এই দুর্গটীকে একটী প্রকাণ্ড পাঠাগার বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও ওই সমস্ত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তকের পরিচয় বুঝাইয়া দিবার জন্য একজনকেও পাওয়া গেল না। তখন দুর্গ ও নগর উভয়ই জনশূন্য। হিন্দি ভাষায় বিহার শব্দের অর্থ মহৎ বিদ্যালয় বা বিশাল মঠ।

মগধ-বিজয়ের পর বহু ধন রত্ন লইয়া বখ্‌তিয়ার দিল্লীতে কোতব

উদ্দীনের দরবারে পৌছিলেন, এবং তথায় দিল্লীশ্বরের নিকট যথেষ্ট সমাদর ও অভ্যর্থনা পাইলেন। কিন্তু দিল্লীশ্বরের দরবারের ওম্‌রাহ্‌গণের ইহা ভাল লাগিল না। বখতিয়ার খিলিজী তাহাদের চক্ষুশূল হইলেন; তখন তাহারা এই তেজস্বী নবীন সেনাপতির ধ্বংসের জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। শেষে সকলে পরামর্শ করিয়া একদিন সাম্রট-সমীপে মোহাম্মদ বখতিয়ারের অসীম বীরত্ব ও সাহসের প্রশংসা করিতে করিতে, সেনাপতি মত্ত হস্তীর বল ধারণ করেন—একবাক্যে সকলে বলিয়া উঠিল। তাহারা ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া একদিন কথা প্রসঙ্গে সম্রাটের নিকট বখতিয়ারের একটী মত্ত হস্তীসহ যুদ্ধ দর্শনাভিলাষ প্রকাশ করিয়া, সম্রাট সকাশে অনুরোধ করিল।

সম্রাট কোতবউদ্দীন, মোহাম্মদ বখতিয়ারের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ তাঁহার পিলখানা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দান্ত ও বলশালী হস্তী আনিবার আদেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক মহাকায় উচ্ছৃঙ্খল বারণ, শ্বেত প্রাসাদের সম্মুখস্ত বৃহৎ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেনাপতি বখতিয়ার খিলিজী গাত্রাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক কোমর বাঁধিয়া, মাত্র একটী যুদ্ধ কুঠার হস্তে হস্তীকে আক্রমণ করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার শুণ্ডে এরূপ প্রচণ্ডবেগে কুঠারাঘাত করিলেন যে,—হস্তী চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল।

চতুর্দ্দিকের ধন্য ধন্য শব্দে ও করতালিতে প্রাঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠিল। কোতবউদ্দীন নিজ হস্তে সেনাপতিকে নানা উপঢৌকনে পরিতুষ্ট করিয়া, সভাস্থ ওম্‌রাহগণকে স্বীয় কার্য্যের অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

বখতিয়ার খিলিজীর সম্মুখে ধনরত্নের ঢেরী লাগিয়া গেল; কিন্তু মহানুভব সেনাপতি উহাতে দৃক্‌ক্ষেপও না করিয়া, বরং নিজ হইতে

আরো কিছু উহাতে দিয়া, সমস্ত ধনরত্ন সম্রাট প্রাসাদের দাস-দাসীগণের ও দীন-দুঃখীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন।

এইবার হিঃ ৫৯৯ সালে ১২০২ খৃষ্টাব্দে এখ্‌তিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার, দিল্লীশ্বর সোল্‌তান কোতবউদ্দীনের নিকট হইতে খেলয়াত ও মগধের শাসন-কর্ত্তৃত্বের সনন্দ পাইলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

বেহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নব-অধিকৃত রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিতে তাঁহার ৫৯৯ হিজরী কাটিয়া গেল। এই সময়ে মধ্যে লোক প্রেরণ করিয়া তিনি বাঙ্গালার ও উহার তৎকালীন রাজধানী নবদ্বীপের সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন।

বাঙ্গালার মসনদে সেই সময় নবদ্বীপে বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন উপবিষ্ট ছিলেন। এদিকে বখ্‌তিয়ার খিলিজীর বেহার-বিজয়-বার্ত্তা ঘোষিত হওয়ায়, মগধ দেশ, লক্ষণাবতী বিভাগ, বঙ্গদেশ ও কামরূপ বিভাগ, তাঁহার নামে প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

নদীয়ার রাজা রায়লক্ষণ সেনের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে—

রাজা লক্ষণ বা লাক্ষণের অশীতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নবদ্বীপের সিংহাসনে বসিয়া সমস্ত বাঙ্গালা দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব লক্ষণ সেনের মৃত্যুকালে তদীয় মাতা পূর্ণ গর্ভবতী ছিলেন; এই জন্য পূর্ব্বতন রাজা লক্ষণ সেনের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায়, রাজসভাসদ্‌গণ গর্ভবতী রাণীকে সিংহাসনে বসাইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে রাজ মুকুট রক্ষা করিয়া, তাঁহাকেই রাজ-সম্মান প্রদান করিলেন।

ক্রমে রাণীর প্রসবের সময় অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। তখন তিনি রাজধানীর সমুদয় জ্যোতির্ব্বিদকে আহ্বান করিয়া, ঐ লগ্নে পুত্র প্রসূত হইলে, পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি কি প্রকার হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

জ্যোতির্ব্বিদগণ চিন্তা ও তর্ক-বিতর্কের পর একমত হইয়া বলিলেন যে,—এই মুহূর্ত্তে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সেই সন্তানের ভবিষ্যৎ বড়ই অমঙ্গলকর হইবে ও সেই পুত্র কোন মতে রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু আর পাঁচ দণ্ড কাল পরে পুত্র প্রসূত হইলে, সেই পুত্র রাজা হইয়া অশীতি বৎসর রাজত্ব করিবে।"

"রাজমাতা এই সংবাদ শুনিয়া, তাঁহার উরুদ্বয় একত্রে কঠিন ভাবে বন্ধন করিয়া ও মস্তক নিম্নদিকে রাখিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজ্ঞীর অনুমতি মত সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করা হইল। দুই ঘণ্টা কাল এই অবস্থায় থাকার পর, যখন জ্যোতিষীগণ—"এই সুপুত্র জন্মিবার উপযুক্ত সময়" প্রকাশ করিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজ্ঞীর ইঙ্গিত ক্রমে তাঁহাকে নামাইয়া দেওয়া হইল ও তাঁহার উরুদ্বয় বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। পরক্ষণেই লাক্ষণেয় বা লক্ষণ জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু পুত্র প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র মাতৃহারা হইল। দারুণ যন্ত্রণায় রাণীর প্রাণবায়ু প্রসবের সঙ্গেই বহির্গত হইয়া গেল।

লক্ষণ একজন পরম দয়ালু ও ন্যায় বিচারক রাজা ছিলেন। দিল্লীশ্বর কোতবউদ্দীনের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণও অতীব মহৎ ও উদার ছিল

মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার, সোল্‌তান কোতবউদ্দীনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণে বেহারে আসিয়া, মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। অচিরে লক্ষণ সেন তাঁহার বাহুবলের পরিচয় পাইলেন। ক্রমে বখ্‌তিয়ার খিলিজীর বল-বীর্য্য বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িলে, রাজ্যের জ্যোতির্ব্বিদগণ ও ব্রাহ্মণ মণ্ডলী রাজা লক্ষণ সেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অবগত করিলেন যে,—

"ব্রাহ্মণগণের বহু পুরাতন গ্রন্থসমূহে তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, তাঁহাদের দেশ শেষে তুর্কীদিগের অধিকারভুক্ত হইবে; আর সেই

সময়ও প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, ওদিকে তুর্কীরাও মগধ জয় করিয়াছে ও সম্ভবতঃ পর বৎসর বাঙ্গালা আক্রমণ করিবে।"

এই কথা বলিয়া সেই সময়ের স্বদেশ-হিতৈষী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাহাদের চির-স্বাধীন রাজাকে মোসল্‌মানগণের সহিত ভয়ে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে উপদেশ দিলেন।

রাজা লক্ষণ তখন ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"যে মহাবীর বাঙ্গালা দেশ জয় করিবেন, তাঁহার কোন বিশেষ লক্ষণ আপনারা অবগত হইয়াছেন কি?"

ব্রাহ্মণ—"মহারাজ! আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি যে—সেই বীরপুরুষের বাহুদ্বয় অস্বাভাবিক দীর্ঘ, এমন কি সরলভাবে দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহার হস্তদ্বয় তাঁহার হাঁটুর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত অবতরণ করিবে।"

ব্রাহ্মণগণের উক্তি শুনিয়া রাজা লক্ষণ, মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের অবয়বের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে বর্ণনা শুনিবার জন্য গোপনে দূত প্রেরণ করিলেন। পরে দূতমুখে তাঁহার করি-শুণ্ড-সন্নিভ আজানুলম্বিত বাহু যুগলের বর্ণনা অবগত হইয়া, বৃদ্ধ রাজা আতঙ্কে জড়সড় হইতে লাগিলেন।

এই ব্যাপারের পর হইতে, ক্রমে রাজ্যের বহুতর ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ তথা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরীধামে গিয়া জগন্নাথের মন্দিরের নিকট আশ্রয় লইলেন; অনেকে কামরূপের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজা লক্ষণ, অতিশয় ভীত হইলেও তাঁহার রাজ্য ও রাজধানীর মমতা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

পর বৎসর ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজী বেহার হইতে পূর্ব্বাভিমুখে বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরে রাজধানী নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইলে, তাঁহার বীর সৈন্যগণের মধ্য হইতে

সপ্তদশ জন অশ্বারোহী মাত্র সঙ্গে লইয়া তিনি রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বখ্‌তিয়ার এই সময় কাহারও প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করিয়া নীরবে বিনা বাধা-বিঘ্নে বরাবর অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

নগরবাসিগণ এই সমুন্নত বপু দৃঢ়কায় সুগৌরাঙ্গ অশ্বারোহিগণের সুঠাম তেজঃপুঞ্জ ব্যাপক বদন মণ্ডলে পুরুষোচিত দৃঢ়তার অভিনব চিহ্ন প্রকটিত দেখিয়া, ভয়ে গোপনে থাকিয়া তাঁহাদিগকে অনিমেষ লোচনে অবলোকন করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের অপরূপ রূপ ও তেজস্বিতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। প্রাসাদ-দ্বারের প্রহরী ক্ষুদ্রকায় বঙ্গীয় সেনাগণ, এই অষ্টাদশ জন বিশালদেহ মোস্‌লেম-অশ্বারোহীকে দেখিয়া সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল।

এই প্রকারে প্রাসাদ-দ্বারে উপনীত হইয়া, এই সামান্য সেনা কয়জন কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিতেই, চতুর্দ্দিক হইতে ভীতি-বিহ্বল সকরুণ চিৎকার-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ রাজা এই সময় স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত ভোজন-পাত্রে নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া মাধ্যাহ্নিক আহারে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ বাহিরের এই ভয়াবহ বিকট করুণ চীৎকার ধ্বনির দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল, এবং তৎসঙ্গেই দেখিলেন,—মোহাম্মদ বখ তিয়ার প্রাসাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্মুখেই নিকটস্থ কয়েকজন প্রহরীকে তরবারি মুখে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন।

এই অবস্থা দর্শনে রাজা লক্ষণ স্বীয় স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক, প্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করিলেন। অচিরে তাঁহার সমস্ত ধন রত্ন, তৎসঙ্গে স্ত্রী, কন্যা ও অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ, বিজয়ী মোস্‌লেম সেনাগণের হস্তে পতিতা হইলেন। বিস্তর হস্তী ও রাজার রত্নাগারের সমস্ত রত্ন বখ্‌তিয়ার খিলিজীর হস্তগত হইল। বখ্‌তিয়ারের

পশ্চাৎ পরিত্যক্ত সেনাগণ নগর মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, তিনি রাজধানী অধিকার করিয়া রাজসিংহাসন দখল করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ রাজা গঙ্গাগর্ভ দিয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিয়া উড়িষ্যাভিমুখে চলিয়া গেলেন, এবং তথায় জগন্নাথ ধামে পৌঁছিয়া অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

নবদ্বীপ অধিকারের পর বীর বাহু বখ্‌তিয়ার যে স্থানে ভাগীরথী পার হইয়াছিলেন, নদীয়া জেলার শান্তিপুরের অনতিদূরে সেই স্থান অদ্যাবধি "বখতিয়ার ঘাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কালে কালে গঙ্গা তথা হইতে অনেক সরিয়া আসায়, ঐ স্থান একটী ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

বখ্‌তিয়ার খিলিজী নবদ্বীপ লুণ্ঠণ ও ধ্বংস করিয়া, তথা হইতে লক্ষণাবতী নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই স্থানের নাম করণ হইল গৌড়। এই গৌড় নগর গঙ্গার পূর্ব্ব পার্শ্বে রাজমহল হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে মালদহ জেলায় অবস্থিত। স্থানটী বহুপূর্ব্বে বঙ্গদেশের পুরাতন রাজধানী ছিল; এবং ইহার পরে মোগল সম্রাট হুমায়ুন, এই নগরের পুনঃসংস্কার করিয়া ইহার নাম জেন্নাত-আবাদ রাখিয়াছিলেন!

তৎকালে গঙ্গানদী গৌড়ের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। এক্ষণে উহা ভয়ানক জঙ্গলময় হইয়া, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হইয়াছে! গঙ্গাও এক্ষণে উহার পশ্চিমে চারি মাইল হইতে স্থানে স্থানে বার মাইল সরিয়া পড়িয়াছে।

গৌড়ের ভগ্নাবশেষ হইতে অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন, গঙ্গা-তীরবর্ত্তী এই অতীব সমৃদ্ধিশালী মোস্‌লেম-বাঙ্গালার রাজধানী, অন্যূন ১৫ মাইল দীর্ঘ ও তিন মাইল প্রস্থ স্থান ব্যাপিয়া বিরাজমান ছিল। এখনও নিবিড় অরণ্য মধ্যে কৃষ্ণ মর্ম্মর-নির্ম্মিত কারুকার্য্য-খচিত মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ, এবং মধ্যে মধ্যে অত্যুচ্চ অর্দ্ধভগ্ন তোরণ ও

বৃহদায়তন জলাশয় সকল বিদ্যমান আছে। বঙ্গ-বেহার একত্রিত হওয়ায়, রাজধানী লক্ষণাবতী এই যুক্ত প্রদেশের কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল।

গৌড়ে রাজধানী স্থাপিত করিয়া, মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজী নানা স্থানে মস্‌জিদ, বিদ্যালয় ও পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করাইলেন। বঙ্গ-বেহার জয়ের পর বখ্‌তিয়ার খিলিজী ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে নিজকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া আজীবন দিল্লীশ্বরের করদ রাজা হইয়া রহিলেন। বঙ্গ-বিজয়ের পর বখ্‌তিয়ার খিলিজী দিল্লীশ্বর এই জয়ের নিদর্শন, কোতব উদ্দীনকে বহু হস্তী ও প্রচুর ধন রত্ন উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। (তবকত-নসিরী)।

অত্যল্পকাল মধ্যে সমস্ত বঙ্গদেশে মোসল্‌মান শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া, এবং প্রত্যেক প্রধান প্রধান ঘাঁটিগুলিতে আবশ্যক মত সৈন্য রক্ষা করিয়া; এই যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাবীর বখ্‌তিয়ার, হিমালয়ের পরপারে তিব্বত ও তাহার উত্তর পশ্চিমে পূর্ব্ব-তুর্কীস্থান, জয়ের আশা মনোমধ্যে পোষণ করিতে লাগিলেন। এই সঙ্কল্প-সাধন জন্য তিনি দশ সহস্র কষ্টসহিষ্ণু উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন; এবং প্রসিদ্ধ সেনাপতি মোহাম্মদ শেরাণ খিলিজীর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, ঐ সমস্ত অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে উত্তরের পার্ব্বতীয় প্রদেশ অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় মহাবীর বখ্‌তিয়ার পথের উভয় পার্শ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি করায়ত্ত করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কোচ্‌ ও মিচ জাতীয় রাজা, বখ্‌তিয়ারের শরণাপন্ন হইয়া, আলি নাম ধারণে এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই অভিযানে উক্ত কোচ রাজা আলি, বখ্‌তিয়ার খিলিজীর পথ প্রদর্শক হইয়া, তাঁহাকে বর্দ্ধন নগর পর্য্যন্ত পৌছিয়া দিয়াছিলেন।

এই বর্দ্ধন নগরের প্রান্তদেশে বৃহৎ ও সুপ্রশস্ত নদ ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত

দেখিয়া, মোস্‌লেম সেনাগণকে দশদিন ধরিয়া নদের উপরের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। শেষে তাঁহারা একটী পর্ব্বতসঙ্কুল অপ্রশস্ত স্থানে দ্বাবিংশতি খিলানযুক্ত একটী বহু পুরাতন প্রস্তরময় সেতু দেখিতে পাইয়া, তৎসাহায্যে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া গেলেন।

যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ সুনিপুণ সৈন্যাধ্যক্ষ বখ্‌তিয়ার খিলিজী, এই সেতু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন তুর্কী ও একজন খিলিজী নেতার অধীনে উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য রক্ষা করিয়া, কামরূপ রাজের রাজ্য মধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা এই সংবাদ পাইয়া ও পূর্ব্ব হইতেই বিজয়ী মোস্‌লেম সেনাগণের অসাধারণ রণ-কৌশলের পরিচয় পাইয়া, ভয়ে মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন; এবং তৎসহ ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন যে—কিছু দিন তাঁহার রাজত্বে অপেক্ষা করিলে, তিনিও মোসলমানগণের সহিত তিব্বত অভিযানে যোগ দিতে পারিবেন।

বখ্‌তিয়ার, রাজার উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া পূর্ণতেজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎপরে পঞ্চদশ দিবস ক্রমান্বয়ে যাইবার পর, মোস্‌লেম-সেনাগণ তাহাদের ইপ্সিত উপত্যকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে একটী প্রকাণ্ড তিব্বতীয় দুর্গ ছিল। দুর্গ মধ্যস্থ সেনাগণ দুর্গ-প্রাকারের উপর হইতে মোস্‌লেমগণের উপর শর নিক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। শেষে সমস্ত দিন যুদ্ধের পর এসলামের সেনাগণ জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু বখ্‌তিয়ার যুদ্ধফল সমালোচনা করিয়া দেখিলেন যে,—মাত্র জন কয়েক বিপক্ষ সেনা বন্দি করা ভিন্ন তাঁহারা এই যুদ্ধে আর কোন প্রকারেই লাভবান হ'ন নাই।

তৎপরে ঐ সকল বন্দির মুখে যখন বখ্‌তিয়ার খিলিজী অবগত হইলেন যে, ১৫ মাইল দূরে কুরুমপত্তন নগরে অন্যূন সাড়ে তিন লক্ষ ধনুকধারী

তুর্ক সেনা অবস্থান করিতেছে, তখন তিনি ঐস্থান আক্রমণ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে বিবেচনায় তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

তিব্বত হইতে কামরূপ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তাঁহাদিগকে পথে ৩৫টী ক্ষুদ্র-বৃহৎ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; এবং ঐ প্রদেশের লোকেরা সেই সময় মোসল্‌মানগণকে বিপদে ফেলিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের গ্রামগুলিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে প্রত্যাবর্ত্তন কালে সেনাগণের আহার ও অশ্বের খাদ্যাভাবে তাঁহাদের কষ্টের অবধি রহিল না। অধিকাংশ সময় তাহাদিগকে ঘোড়ার মাংস খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছিল।

তৎপরে কামরূপের ভিতর দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সেই প্রস্তরময় সেতুর নিকট গিয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজী দেখিলেন যে, কামরূপ-রাজ ঐ সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; এবং অবগত হইলেন যে তৎপূর্ব্বে তাঁহার নিযুক্ত দুইজন মোসলমান সেনানী পরস্পর বিবাদ করিয়া তথা হইতে উভয়েই সরিয়া পড়িয়াছিল। অশ্বারোহী সেনাসহ খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় সেতু, কামরূপের রাজা কর্ত্তৃক এইরূপে ভগ্ন হইয়াছে দেখিয়া মোস্‌লেম-বীর ক্রোধান্ধ হইয়া নিকটবর্ত্তী হিন্দুদিগের একটী প্রকাণ্ড দেবালয় ধ্বংস করিলেন ও তন্মধ্যস্থ বিগ্রহ সকল ভূমিসাৎ করিলেন।

সেই সময় কামরূপ-রাজ মোস্‌লেম সেনাগণকে বিপন্ন দেখিয়া, তাহা-দিগকে চতুর্দ্দিক হইতে অবরুদ্ধ করিবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সুচতুর বখ্‌তিয়ার এই অবস্থা প্রতিবিধানে তাঁহার সেনাগণকে উৎসাহিত করিয়া, তাহাদিগকে ভীমবেগে জড়োপাসকগণের উপর গিয়া পড়িয়া, বিধর্ম্মী-গণকে নরকে প্রেরণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিক-রক্তে মন্দির-প্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইল। অবশিষ্ট হিন্দু সেনাগণ যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

অতঃপর সেনাপতি নদী পার হইবার জন্য বৃক্ষ ছেদন দ্বারা ভেলা প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন, এমন সময় নদের একস্থান দিয়া অশ্বারোহীগণ হাঁটিয়া পার হইতে পারিবে এইরূপ জনরব উঠায়, সেনাগণ সেই স্থানে গিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইবার উপায় দেখিতে লাগিল ও পূর্ব্ববর্ত্তী অনেকে নদের ঐ অগভীর স্থান দিয়া পরপারে যাইতে কৃতকার্য্যও হইল। কিন্তু হঠাৎ ভীষণ স্রোতে নদী গর্ভস্থ বালুকারাশি অপসারিত হওয়ায়, বিস্তর মোস্লেম সেনাকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল।

শেষে অবশিষ্ট অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ বখ্তিয়ার খিলিজী ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া আসিয়া, মোস্লেম ধর্ম্মে নব-দীক্ষিত কুচবেহারের রাজা আলি মিচের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তথা হইতে দেবকোটে পৌছিয়া সেনাপতি কঠিন পীড়িত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে ৬০২ হিজরী ১২০৫ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ বঙ্গ-বিজেতা গাজী মোহাম্মদ এখ্তিয়ার উদ্দীন বখ্তিয়ার খিলিজী কঠিন পীড়িতাবস্থায়, তাঁহার পূর্ব্ব সহচর ও অধীনস্থ কুনি দেশের শাসনকর্ত্তা, বিশ্বাসঘাতক আলি মর্দ্দান খিলিজীর ছুরিকাঘাতে রোগ শয্যায় ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। বখ্তিয়ারের মৃতদেহ দেবকোট হইতে বেহারে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করা হইল।

এই স্থান হইতে আমরা এক প্রকার ভারতের অন্যান্য দেশ ও মোস্লেম বিজীত আফগানিস্তান, পারস্য, ইরাক, মিসর এবং ইউরোপের মোস্লেম অধিকৃত স্থানগুলির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, কেবল আমাদের জন্মভূমি বাঙ্গালা ও তাহার পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী বেহার ও উৎকলের মোস্লেম কীর্ত্তি সকল লিপিবদ্ধ করিতে থাকিব। তবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সহিত যে যে স্থানে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিবে, সেই সকল বিষয় বাধ্য হইয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে উল্লেখ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় সর্গ

সেরাণ

মালেক ঈজ্জদ্দীন মোহাম্মদ সেরাণ খিলিজী, মগধ আক্রমণ কালে মহারথী বখ্‌তিয়ারের সহিত তাঁহার সেনা শ্রেণীভুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। তৎপরে মগধ হইতে যে মাত্র অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী নবদ্বীপে আসিয়া, রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজ্য অধিকার করেন, তন্মধ্যে এই মহাবীর সেরাণ অন্যতম।

নবদ্বীপ বিজয়কালে রাজার সৈন্যগণ, অনেকগুলি হস্তী লইয়া পলাইয়া জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। মহাবীর সেরাণ এই সংবাদ পাইয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া, অরণ্য মধ্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এ দিকে তিন দিন তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজী, তাঁহার এই অদম্য সাহসী বীরের প্রাণের আশঙ্কা করিতে ছিলেন। হঠাৎ চতুর্থ দিবসে সংবাদ পাইলেন যে—মহারথী সেরাণ বঙ্গরাজের ত্রিশটী বিপুলকায় যুদ্ধ হস্তী চালকসহ ধৃত করিয়া অসীম সাহস প্রদর্শনে অরণ্য মধ্যে একাকী তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। তখন মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার, সেরাণের সাহায্যার্থে কয়েক জন অশ্বারোহীকে পাঠাইয়া দিলেন। অচিরে ঐ হস্তীযুথ বিজয়ী বীর সমীপে আনীত হইল।

বখ্‌তিয়ার খিলিজীর মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াই সেরাণ, রাজধানী গৌড়

হইতে দেবকোটে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে আলিমর্দ্দান ঘটিত সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, তাহার এই বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য মর্দ্দানের রাজধানী নারকোটীতে গমন করিলেন; এবং আলি মর্দ্দানকে তথায় গ্রেফ্‌তার করিয়া, নগর কোতওয়াল ইস্‌পাহানীর জিম্মায় বন্দি করিয়া রাখিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় সমস্ত মোসলেম সেনাপতিগণ এক মত্‌ হইয়া মোহাম্মদ সেরাণকে বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত করেন। (তব্‌কত-নসিরী)

এদিকে আলি মর্দ্দান কোতওয়ালকে (নগরের প্রধান বিচারক) উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করিয়া, দিল্লী পলাইয়া গিয়া, সম্রাট কোতব উদ্দীন সমীপে বাঙ্গালার সেরাণ ঘটিত সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন।

সম্রাট, তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া সেরাণের সিংহাসনারোহণে অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া, সমস্ত বাঙ্গালা দেশটীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শাসন কর্ত্তার অধীনে অর্পণ করিবার জন্য, অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা কায়মাজ্‌ রুমীর উপর লিখিত পরওয়ানা পাঠাইয়া দিলেন; এবং সৈন্য-সামন্ত লইয়া তাঁহাকে অচিরে বাঙ্গালায় যাইতে আদেশ করিলেন।

সম্রাট প্রতিনিধির আগমনবার্ত্তা পাইয়া, বখ্‌তিয়ার খিলিজীর নিযুক্ত গঙ্গোত্তরী খণ্ডের শাসনকর্ত্তা হেশাম-উদ্দীন খিলিজী অগ্রবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেবকোটে গেলেন। কায়মাজ এই ব্যবহারে হেশাম-উদ্দীনের উপর সন্তুষ্ট হইয়া, দেবকোটের শাসনভার তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিয়া, অপর দিকে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

এই সময় মোহাম্মদ সেরাণ কয়েক জন খিলিজী বংশীয় যোদ্ধার সহিত পরামর্শ করিয়া, দেবকোট আক্রমণে প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, সম্রাট প্রতিনিধি কায়মাজ্‌কে সসৈন্যে দেবকোটে ফিরিয়া আসিতে হইল।

তখন উভয় দলে যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল তাহাতে সেরাণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া কুচবেহারে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

তৎপরে কায়মাজ রুমী বাঙ্গালা দেশটীকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক খণ্ডে এক জন খিলিজী শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

মালেক আলাউদ্দীন আলি-মর্দান খিলিজী

আলি-মরদান যে সময় দিল্লীতে গিয়া সোল্‌তান কোতব উদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা পরিচয় দিতে ছিলেন, সেই সময় সোল্‌তান গজ্‌নী যাইবার বন্দোবস্তে নিযুক্ত ছিলেন। আলি-মর্দান সোলতানের সহিত তাঁহার দেহরক্ষী রূপে গজ্‌নী যাইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। কোতব উদ্দীনও তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

এই সময় হইতে আলি-মর্দান, দিল্লীশ্বরের সুদৃষ্টিতে পড়ায়, গজনী হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোতব উদ্দীন তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। (হিঃ ৬০৫ সাল)

হিঃ ৬০৭ সালে সোলতান কোতব উদ্দীনের মৃত্যুর পর আলি মর্দান, আলাউদ্দীন খিলিজী নাম গ্রহণে দিল্লীর অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। এই সময় হইতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নিষ্ঠুরতা ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, দুই বৎসর মধ্যেই ১১১২ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি খিলিজী ওমরাহ্ মিলিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়া, মালেক হেশাম-উদ্দীন আওজ্‌কে তাঁহার শূন্য সিংহাসনে বসাইলেন।

সোল্‌তান গেয়াস-উদ্দীন

এই প্রসঙ্গে এই নূতন বঙ্গেশ্বরের একটু পূর্ব্ব পরিচয় দেওয়া আবশ্যক—গোরের সম্ভ্রান্ত খিলিজী বংশে হেশাম্‌-উদ্দীনের জন্ম। বয়োপ্রাপ্তে তিনি একদিন জবল্‌স্থানের পার্ব্বতীয় প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষার্থ অশ্বতর পৃষ্ঠে মালামাল বোঝাই করিয়া তুর্কীস্তানের দিকে যাইবার কালে, পথিমধ্যে দুইজন দরবেশের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হেশাম্‌-উদ্দীন তাঁহার স্বাভাবিক দয়ার্দ্র হৃদয় বশতঃ ফকির দুই জনকে আহার্য্য ও পানীয় দিয়া পরিতৃপ্ত করেন। তৎপরে দরবেশদ্বয় পরস্পর অস্পষ্ট ভাবে কি বলাবলি করিয়া, আওজের দিকে ফিরিয়া বলিলেন যে—

"বাবা তুমি হিন্দুস্থানে যাও, তথায় মোস্‌লেম রাজত্বের শেষ সীমা আমরা তোমাকে অর্পণ করিলাম।"

এই কথা শ্রবণের পর হেশাম্‌-উদ্দীন আর অন্য কোন স্থানে না গিয়া, পত্নী সমভিব্যাহারে ভারতে আসিলেন; এবং দিল্লীতে আসিয়া সোল্‌তান কোতব উদ্দীনের সুদৃষ্টিতে পড়িলেন। তৎপরে বাঙ্গলায় আসিয়া সামান্য পদ হইতে ক্রমোন্নত হইয়া, দিল্লীশ্বরের মৃত্যুকালে গঙ্গোত্তরী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ কালে তিনি সোল্‌তান গেয়াস উদ্দীন নাম ধারণ করিলেন। এই অসীম দয়ালু শাসন কর্ত্তার অধীনে বঙ্গদেশ খুবই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

রাজধানী লক্ষণাবতী নগরে তিনি একটী সুদৃশ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ও গঙ্গার উভয় তীরস্থ তাঁহার সময়ের এই সুবৃহৎ গৌড় নগরটীকে বৃহৎ

বৃহৎ অট্টালিকা শ্রেণী, সুদৃশ্য মস্‌জিদ, পাঠাগার, পান্থশালা, প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করিয়া তিনি ইহাকে অমরাবতী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক মেন্‌হাজ-উদ্দীন হিঃ ৬৪১, ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে এই লক্ষণাবতী নগরে উপস্থিত হইয়া, নগরের শোভা দর্শনে ও তৎসঙ্গে সোলতান গেয়াস-উদ্দীনের অপূর্ব্ব দানের বর্ণনা শ্রবণে, যাহা তিনি তাঁহার ইতিহাস তব্‌কত নসিরীতে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে—সোল্‌তান একদিকে যেমন বিদ্যোৎসাহী ও অসীম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, অপর দিকে তেমনি হিন্দু-মোসল্‌মান নির্ব্বিশেষে অপরিসীম দান ও সুবিচার দ্বারা রাজ্যের প্রজাগণকে সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন।

দেশের উন্নতির দিকে সর্ব্বক্ষণই সোল্‌তানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি অতি বৃহৎ বিস্তীর্ণ জলাভূমির উপর দিয়া সেতু নির্ম্মাণ দ্বারা ও তদুপরি প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া সেই সময় দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া ছিলেন। রাজধানী হইতে গঙ্গার উভয় পার্শ্বে এইরূপ দুইটী সেতুর উপর দিয়া আট দশ দিনের পথ চলিয়া যাইবার উপযোগী রাস্তা, একটী বীরভূম জেলার নাঘোর পর্য্যন্ত ও অপরটী দেবকোট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বঙ্গাধিপতির দানসত্রের বিবরণ শ্রবণে, দিল্লীশ্বর সোলতান সৈয়দ শামস্‌-উদ্দীন আল্‌তামাশ্‌কেও পর্য্যন্ত তাঁহার সুখ্যাতি করিতে, এবং তিনি যে সর্ব্বপ্রকারে "সোল্‌তান" নাম ধারণের উপযুক্ত, তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতঃপর ঐ মহানুভব বাদশাহ্‌, স্বয়ং মালেক হেশাম উদ্দীনকে সোল্‌তান গেয়াস-উদ্দীন নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে কামরূপ, ত্রিহুট ও উড়িষ্যা খণ্ডের রাজগণ বঙ্গেশ্বরের, অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নিয়মমত রাজস্ব প্রদান করিতেন।

সোল্‌তান গেয়াস-উদ্দীন দশ বৎসরকাল নির্ব্বিবাদে রাজ্য শাসন করার পর, দিল্লীর কর প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিতে থাকায়, দিল্লীশ্বর

আল্‌তামাশ্‌, ১২২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে সসৈন্য যাত্রা করিয়া পথে বিনা বাধায় বেহার প্রদেশ হস্তগত করিলেন। এই অবস্থা দর্শনে সোলতান গেয়াস-উদ্দীন গঙ্গা পার হইয়া, তাঁহার রাজ্য আক্রমণে বাধা প্রদান করণার্থ বহু সৈন্য ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ রসদবাহী নৌকা লইয়া সম্রাটের সম্মুখীন হইলেন। শেষে গেয়াস উদ্দীনের বন্ধুবর্গের মধ্যস্থতায় দিল্লীশ্বর সন্ধি-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও মালেক আলাউদ্দীনকে বেহারের মস্‌নদে বসাইয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পর বৎসরেই সোলতান গেয়াস, মগধ আক্রমণ করিয়া আলাউদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করেন ও সম্রাট সেনাগণকে বেহার হইতে বিতাড়িত করিলেন।

সম্রাট আল্‌তামশ্‌ এই সংবাদে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, স্বীয় পুত্র নাসির-উদ্দীন মাহ্‌মুদের অধীনে বহু সৈন্য বঙ্গের রাজধানী লক্ষণাবতীতে প্রেরণ করিলেন।

এই সময় বঙ্গেশ্বর গেয়াস-উদ্দীন, পূর্ব্ববঙ্গে কয়েকটী বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত থাকায়, তাঁহার সিংহাসন অনায়াসে কুমার নাসির উদ্দীনের হস্তগত হইল। সোলতান এই সংবাদ পাইয়াই রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অসীম সাহসের সহিত সম্রাট সেনার উপর নিপতিত হইলেন। এই যুদ্ধে বঙ্গেশ্বর গেয়াস-উদ্দীন স্বয়ং আদ্যন্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে ও তাঁহার প্রিয় সেনাগণের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া, তাহাদিগকে উৎসাহিত ও তৎসঙ্গে নিজের বাহু বল প্রদর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। শেষে যুদ্ধ-কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে দেখাইতে অধীনস্থ কয়েকজন বীর সেনানীর সহিত রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

অতঃপর যুবরাজ নাসির উদ্দীন মাহ্‌মুদ, পিতার নামে বাঙ্গালা-বেহার শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত

রাজত্ব করিয়া হিঃ ৬২৬ সালে লক্ষণাবতী নগরে দেহত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে খিলিজীগণ বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালার মস্‌নদ পুনরধিকার করে। সম্রাট, পুত্র নাসির-উদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াই দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষণাবতী পৌছিয়া বিদ্রোহীগণকে দমন করিয়া, ৬২৭ হিজরীতে মালেক্ আলা-উদ্দীনকে গৌড়ের সিংহাসন প্রদান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এক্ষণে বঙ্গ-বেহারের বিষয় কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখিয়া, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কিঞ্চিৎ বিবরণ যথাসাধ্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব।

তৃতীয় সর্গ

দিল্লীশ্বর সোলতান শামস্‌উদ্দীন আবুল মোজাফ্‌ফর আল্‌তামাশ্‌।

আল্‌তামাশের পিতা এয়ালাম খান তুর্কী স্থানের আলবরি বংশীয় একজন প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। তাঁহার এই কনিষ্ঠ পুত্র আল্‌তামাশ্‌ দেখিতে অতীব সুশ্রী ছিলেন, এবং বালকের প্রখর বুদ্ধির জন্য পিতা, সকল পুত্রাপেক্ষা আল্‌তামাশ্‌কে অধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এই কারণে হিংসাপরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ দ্বারা আল্‌তামাশ্‌কেও মিসরের হজরৎ ইউসফের অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল।

ভ্রাতাগণ একদিন পিতৃ অনুমতি লইয়া আল্‌তামাশ্‌কে ঘোড়দৌড় দেখাইতে আনিয়া, তাহাকে একজন অশ্ব ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়া যায়। অশ্ব ব্যবসায়ী তাহাকে বোখারায় লইয়া গিয়া তথাকার প্রধান বিচারকের নিকট বিক্রয় করে। এই দয়াশীল বিচারপতি আল্‌তামাশ্‌কে পুত্রের ন্যায় যত্নের সহিত বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন।

সম্রাট তাঁহার এই প্রভু সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে একদিন উল্লেখ করিয়াছিলেন যে—

এই বিচারক পরিবারে অবস্থান কালে তিনি একদিন প্রভুর জন্য আঙ্গুর কিনিতে গিয়া মূল্য হারাইয়া ফেলেন। অগত্যা তিনি পয়সা হারাইয়া পথে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন; এমন সময় একজন ফকির সেই

মূল্যের আঙ্গুর কিনিয়া বালকের হস্তে দিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে—"যখন তুমি ধনশালী হইবে তখন সর্ব্বদা দরিদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিও।"

বাস্তবিক পক্ষে সৈয়দ আল্‌তামাশের ন্যায় পরহিতৈষী, পর-দুঃখকাতর ও বিদ্যানুরাগী এবং বয়োঃজেষ্ঠের মর্য্যাদা রক্ষাকারী সম্রাট, কুত্রাপি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।

আল্‌তামাশের বিচারপতি প্রভুর লোকান্তর প্রাপ্তির পর, জনৈক হাজী বোখারি, তাঁহাকে কিনিয়া লইয়া জামাল উদ্দীন চাশ্‌ত্‌কে বিক্রয় করে ও সেই ব্যক্তি এই ক্রীতদাসের দৈহিক সৌন্দর্য্য, বল ও গুণের পরিচয় পাইয়া, অধিক মূল্য পাইবার প্রত্যাশায় তাহাকে রাজধানী গজনী নগরে বিক্রয় করিতে আনয়ন করে।

সোল্‌তান মঈজ-উদ্দীন মোহাম্মদ শ্যাম, এই সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট বালকটীকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রায় ক্রয় করিতে চাহিলেন। কিন্তু জামাল উদ্দীন তাহাতে সম্মত না হওয়ায় সোল্‌তান, গজনী নগরে তাহার বিক্রয় এক কালীন বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। তৎপরে জামাল বালককে লইয়া বোখারায় গেলেন, এবং তিন বৎসর পরে পুনরায় তাহাকে গজ্‌নীতে লইয়া আসিলেন। এই সময় কোতব উদ্দীন, নাহারওয়ালা ও গুজরাট জয় করিয়া গজ্‌নী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

তিনি বালকের দৈহিক সৌন্দর্য্য দর্শনে, তাহাকে কিনিবার প্রস্তাব করিলেন। শেষে সোলতানের বিনানুমতিতে কেহ তাহাকে কিনিতে পারিবে না শুনিয়া, কোতাব উদ্দীন, সোলতান মোহাম্মদ গোরীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। সোলতান তাঁহার পূর্ব্বাদেশ প্রত্যাহার না করিয়া, রাজ-প্রতিনিধির প্রতি তাঁহার রাজধানীর বাহিরে গিয়া দাস-ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ক্রীতদাস ক্রয় করিবার আদেশ দিলেন। সেই মত বিক্রেতা বালকটিকে হিন্দুস্থানে আনয়ন করিয়া, কোতাব উদ্দীনকে বিক্রয় করিয়া গেল।

এই রূপে আল্‌তামাশ্‌ তাহার বাল্য জীবন হইতে সোলতান কোতব-উদ্দীনের নিকট পুত্র নির্ব্বিশেসে লালিত পালিত হইয়া, শেষে তাঁহার অশ্বারোহী সেনা দলে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় হইতেই দিনে দিনে আল্‌তামাশের পদোন্নতি হইতে লাগিল।

গোয়ালিয়র অধিকারের পর কোতব উদ্দীন তাঁহাকেই ঐ স্থানের আমীর মনোনীত করেন। আল্‌তামাশ্‌ তৎপরে স্বীয় বাহুবলে বারাণ দেশ জয় করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই আল্‌তামাশের বীরত্ব ও প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সোলতান তাঁহাকে বাদাউন প্রদেশ প্রদান করিলেন।

ইহার অল্পদিন পরে সোলতান মোহাম্মদ গোরী আন্দখোদের যুদ্ধে ক্ষিতা ও কোক্কার জাতিগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া, পুনরায় উহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে, তাঁহার অনুমতিক্রমে কোতব উদ্দীন হিন্দুস্থান হইতে সেনা লইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন। এই অভিযানে শাম্‌সদ্দীন আল্‌তামাশ্‌ও তাঁহার বাদাউন সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হ'ন। ঘোরতর যুদ্ধের সময় শাম্‌সদ্দীন অশ্বারোহণে ঝেলম্‌ নদীস্রোতে অবতরণ পূর্ব্বক পলাতক শত্রুগণকে যে প্রকারে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, গুণগ্রাহী বীর সম্রাট শত মুখে তাহার গুণ কীর্ত্তন, করিতে লাগিলেন ও শেষে অধীনস্থ ভারতের, শাসনকর্ত্তা কোতব উদ্দীনের দ্বারা একখানি ছাড়পত্র লিখাইয়া লইয়া, তম্মুহূর্ত্ত হইতে আল্‌তামাশের দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিলেন।

কোতব উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সেনাপতি আলি এস্‌মাইল, ওমরাহের সহিত পরামর্শ করিয়া, বাদাউন হইতে আল্‌তামাশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শাম্‌সদ্দীন আল্‌তামাশ ৬০৭ হিঃ ১২১০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি স্বীয় ভুজবলে দিল্লীর সমস্ত শত্রুকে একে একে পরাভূত করিয়াছিলেন। সম্রাট ১২১৭ খৃষ্টাব্দে

লাহোরের অধিপতি বিদ্রোহী নাসিরউদ্দীন কাবচাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন।

১২২৫ খৃষ্টাব্দে গৌড় দমনের পর বৎসর সম্রাট মধ্য ভারতের প্রসিদ্ধ দুর্গ রণতম্বর (রণ-স্তম্ভ-ভ্রমর অর্থাৎ যুদ্ধ স্তম্ভের ভ্রমর) জয় করিতে বহির্গত হইলেন। কথিত আছে যে—ইতিপূর্ব্বে সপ্ততিতম বারেরও অধিক এই দুর্ভেদ্য দুর্গ বিভিন্ন রাজশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন শক্তিই ইহা জয় করিয়া রক্ষা করিতে পারে নাই। কয়েক মাস কাল অবরোধের পর দুর্গ মোসল্‌মানগণের হস্তগত হইল। পর বৎসর হিঃ ৬২৪ সালে সম্রাট, সওয়ালেকের পার্ব্বতীয় দুর্গ-মন্দির আক্রমণ করিলেন। এই দুর্গ জয়ে বিপক্ষের অনেক ধন রত্ন মোস্লেম সেনাগণের হস্তে পড়িল।

তৎপরে সোলতান আল্‌তামাশ্‌ মুলতান ও উচ্‌ পদানত করিয়া সমস্ত সিন্ধু দেশ ও সমুদ্র তীরবর্ত্তী দেবাল পর্য্যন্ত শাসনাধীনে আনায়ন করিলেন। এই অভিযানে তবকত-নসিরী লেখক আবু ওমর মেন্‌হাজ-উদ্দীন সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন। অতঃপর সম্রাটের দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তনের পর ৬২৬ হিজরীর রবি-উল-আউয়ল্‌ মাসের ২রা তারিখে, দিল্লীশ্বরের জন্ত এস্‌লাম জগতের রাজধানী বাগ্‌দাদের খলিফার নিকট হইতে সম্রাট, এবং তাঁহার পুত্রগণের জন্ত উপাধি ও বহু মূল্যবান খেলয়াত আসিয়া পৌছিল।

এই সমস্ত আনন্দময় বিষয়ক কথোপকথন ও বাদানুবাদ চলিতে থাকা কালে, বঙ্গের রাজধানী লক্ষ্ণাবতী হইতে সম্রাট তনয় কুমার সৈয়দ নাসির উদ্দীন মাহ্‌মূদের মৃত্যুর নিরানন্দময় সংবাদ ও তৎসঙ্গে খিলিজীগণের পুনঃ বিদ্রোহবার্ত্তা আসিয়া সম্রাট-অন্তঃপুর ও হাস্যময়ী দিল্লী নগরী শোকে ম্রিয়মান্‌ করিয়া তুলিল।

৬২৯ হিজরীতে সম্রাট গোয়ালিয়রে অভিযান করেন। রাজা দেববল্‌ দেব আত্ম সমর্পণ করার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বেই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সম্রাট-

সৈন্য পূর্ণ একাদশ মাস কাল দুর্গাবরোধ করিয়া রহিল। এই অভিযানেও ঐতিহাসিক মেন্‌হাজ উদ্দীন সম্রাট সৈন্য সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন। তিনি সম্রাট শিবিরে ঈদ-আল্‌-আজ্‌হা নামাজের পর খোত্‌বা পাঠের অনুমতি পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। ৬৩০ হিজরীর ২৬ সফর মঙ্গলবার প্রসিদ্ধ গোয়ালিয়র দুর্গ মোসলমানগণের হস্তগত হইল। রাজা দেববল্‌ দেব রাত্রি যোগে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

মেন্‌হাজ উদ্দীন গোয়ালিয়র নগরের প্রধান কাজীর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

১২৩৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের সৈন্যগণ মালওয়া আক্রমণ করিয়া ঐ দুর্গ ও ভিল্‌সা নগর পদানত করে। এই ভিল্‌সা নগরে তিন শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ম্মিত দুই শত দশ হস্ত পরিমাণ উচ্চ একটি দেব মন্দির ছিল। ভিল্‌সা হইতে মোস্‌লেম সেনাগণ উজ্জয়িনী নগরে অভিযান করিয়া ও তথাকার মহাকালের মন্দির ধ্বংস করিয়া, মহাকালের প্রতিমূর্ত্তি এবং ১৩১৬ বৎসর পূর্ব্বের উজয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের প্রতিমূর্ত্তি দিল্লীতে লইয়া আসিল।

২৬ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, ৬৩৩ হিজরী ২০ সাবান তারিখে সম্রাট আবুল মোজাফ্‌ফর আল্‌তামাশ্‌ দিল্লীতে জ্বর রোগে ইহধাম ত্যাগ করিলেন ও কোতবমিনারের সন্নিকটেই সমাধিস্থ হইলেন।

আলতামাশের মৃত্যুর পর তাঁহার মধ্যম পুত্র রোকন্‌-উদ্দীন ফিরোজ শাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করার পর, তাঁহার স্বাভাবিক দানশীলতা ও নম্রতা ক্রমশঃ বিপরীত দিকে চালিত হইয়া তাঁহাকে অদ্বিতীয় অহিতাচারী ও লম্পট করিয়া তুলিল; এবং তিনি এই অসৎ স্বভাবের বশবর্ত্তী হওয়ায় দিল্লীর রাজকোষ শূন্য হইতে আরম্ভ হইল। দিল্লীশ্বরের এই অবস্থা দর্শনে তাঁহার সভাসদগণ ও প্রজামণ্ডলী সকলেই তাঁহার উপর দারুণ অসন্তুষ্ট হইয়া, মাত্র সাত মাস কাল সিংহাসনাধিকারের পর, তাঁহাকে

ও তাঁহার সকল অনর্থের মূলীভূত রাজমাতা শাহ্‌তোর্‌কান্‌কে বন্দী করিয়া, সোল্‌তান আল্‌তামাশের সুযোগ্যা জ্যেষ্ঠা কন্যা রেজিয়াকে ৬৩৪ হিজরীর রবি-ওল্‌-আউয়ল্‌ মাসে দিল্লীর রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় করিলেন।

সোল্‌তানা রেজিয়া সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা রাজ্ঞী ছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় প্রখর বুদ্ধিমতী, ন্যায়বতী, উদার ও সুবিচারিকা ছিলেন। এই সঙ্গে সৈন্য চালনায় পরামর্শ দানেও তাঁহার ঈশ্বরদত্ত অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এক কথায় কেবল পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ ব্যতীত রাজাধিরাজের যত প্রকার গুণাবলী থাকিতে হয়, সোল্‌তানা রেজিয়াতে তাহার কোনটীরই অপ্রতুল ছিল না। তাঁহার মাতা মৃত সম্রাটের প্রধানা মহিষী ছিলেন; এবং সোল্‌তান আল্‌-তামাশের বরাবরই ইচ্ছা ছিল যে—তাঁহার পর তাঁহার সিংহাসনে যেন তাঁহার এই সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা কন্যা বসিতে পারেন।

রেজিয়ার সিংহাসনারোহণে কেবল মাত্র পুরাতন মন্ত্রী নেজামল-মুল্‌ক জোনায়দী অসন্তুষ্ট ছিলেন; এবং তিনি সম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ হইতে বিস্তর লোক ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, দিল্লীর বাহিরে আসিয়া বিদ্রোহের ধ্বজা উন্মুক্ত করিলেন। এই সময় অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা নাসির-উদ্দীন তাবাসী স্বীয় সেনা সহ সোল্‌তানার সাহার্য্যার্থ আসিতে থাকা কালে তিনি বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক বন্দি ও নিহত হন।

এই অবস্থা দর্শনে সোল্‌তানা রেজিয়া স্বয়ং নগরের বাহিরে গিয়া, যমুনার কূলে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তৎপরে দুই একটী খণ্ড যুদ্ধের পর বিদ্রোহীগণের মধ্যে অনেকেই ক্রমশঃ সোল্‌তানার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিল। অবস্থা দেখিয়া প্রধান বিদ্রোহী নেজাম-উল্‌ মুল্‌ক পলায়ন করিয়া শেষে বারদারের পার্ব্বত্য উপত্যকায় প্রাণ হারাইলেন।

অতঃপর সোল্‌তানা রেজিয়ার ক্ষমতা অপ্রতিহত ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অচিরে তিনি লক্ষণাবতী হইতে দেবাল পর্য্যন্ত

সমস্ত নরপতির নিকট হইতে রাজাধিরাজের সম্মান প্রাপ্ত হইলেন ও সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল।

সম্রাট শামসদ্দীনের মৃত্যুর পর, হিন্দুগণ আবার একত্র হইয়া রণতম্বর দুর্গ আক্রমণ করিয়া উহা অবরোধ করিয়া থাকে। সোল্‌তানা রেজিয়া এই সংবাদ পাইয়া সেনাপতি কোতব-উদ্দীন হাসান্‌ গোরীকে দুর্গোদ্ধারে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি কোতব তথায় পৌছিয়া দুর্গাভ্যন্তরস্থ মোসল্‌মানগণকে দুর্গের বাহিরে আসিতে বলিয়া, দুর্গ মধ্যস্থ অনেক পুরাতন স্মৃতি ধ্বংস করিয়া দিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই সময় রাজ্ঞীর অশ্ব-শালার তত্ত্বাবধায়ক আমীর জামাল-উদ্দীন ইয়াকুতকে অনেকের সেই অধিকার অবহেলা করিয়া সোল্‌তানা, তাঁহার দেহরক্ষিগণের নায়কের পদে উন্নীত করায়, তুর্কী সেনানী ও ওমরাহ্‌-গণের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল।

সোল্‌তানা রেজিয়া পুরুষবেশে হস্তী আরোহণে প্রায়ই ভ্রমণে বাহির হইতেন।

১২৩৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরের শাসনকর্ত্তা মুঈজদ্দীন কবির খান বিদ্রোহী হইয়া উঠায়, সোল্‌তানা রেজিয়া তাহাকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং সসৈন্যে লাহোর যাত্রা করিলেন। মুঈজদ্দীন সোল্‌তানার আগমণ বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রার্থী হইল। এই সন্ধির পর সোল্‌তানা অবগত হইলেন যে—সারহিন্দের মালেক্‌ আল্‌তুনিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে ও তাঁহার নিজ দরবারের বহু ওম্‌রাহ উক্ত বিদ্রোহীকে সাহায্য করিতেছে। এই সংবাদ প্রাপ্তে তিনি হিঃ ৬৩৭ সালের ৯ই রমজান বুধবারে বহু সৈন্য লইয়া সার্‌হিন্দের বিদ্রোহ দমন করিতে গেলেন। তথায় তুর্কগণ প্রথমতঃ তাঁহার দেহরক্ষী সেনাগণের

অধ্যক্ষ আমীর জামাল-উদ্দীন ইয়াকুতকে নিহত করিয়া, সোল্‌তানাকে বন্দি করিল ও তাঁহাকে সারহিন্দ দুর্গে অবরোধ করিল।

ইত্যবসরে মুঈজউদ্দীন বাহ্‌রাম শাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তখন মালেক্‌ আল্‌তুনিয়া দুর্গ মধ্যস্থ বন্দিনী সোল্‌তানা রেজিয়াকে মুক্ত করিয়া, তাঁহার সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া, উভয়ে নব সম্রাটের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই যুদ্ধে মালেক ও রেজিয়া উভয়েই বন্দী হইয়া ৬৩৮ হিজরীর ২৪ রবি-ওল্‌-আউয়ল্‌ তারিখে নিহত হইলেন।

সোল্‌তানা রেজিয়া তিন বৎসর ছয় দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বাহ্‌রামের পর আলাউদ্দীন মসুদ শাহ্‌ দিল্লীর বাদশাহ্‌ হইলেন। তৎপরে সোলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ হিঃ ৬৪৪ সালের ২৩ মোহারুরম ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে ১০ জুন রবিবারে দিল্লীর সিংহাসনারোহণ করিলেন।

এই সোলতান-মোয়াজ্জম নাসের উদ্দীন, পরলোকগত সোলতান আলতামাশের কনিষ্ট পুত্র। ইহার প্রধান সেনাপতি খাঁন আজম্‌ উলুগ্‌ খান একজন বিচক্ষণ রণপণ্ডিত ছিলেন। সিংহাসনারোহণের প্রথম বৎসরেই সম্রাট এই প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে কনোজের নিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত নন্দন নগরের বিদ্রোহী হিন্দুদিগকে দমন করিতে প্রেরণ করেন। দুই দিবস যুদ্ধের পর উলুগ খান নন্দন নগর রসাতলে দিয়া, এবং প্রধান বিদ্রোহী রাজা উপাধিধারী দল্‌কী মাল্‌কীকে বন্দি করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই আক্রমণের ফলে সেনাপতি উলুগ্‌ খান, অপরাপর লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে ১৫০০ শত উৎকৃষ্ট অশ্ব পাইয়াছিলেন। রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে সম্রাট, স্বীয় কন্যার সহিত সেনাপতি উলুগ্‌ খানের পুত্রের বিবাহ দিলেন।

মল্‌ওয়ার রাজা বিদ্রোহী জাহির দেবকে দমন করিবার জন্য সম্রাট, ৬৪৭ হিজরীর ২৫ সাবান তারিখে সেনাপতি সহ সসৈন্যে

গোয়ালিয়র, চান্দেরী, বাজাওয়াল্ এবং মাল্ওয়ার ভিতর দিয়া গমন করিয়া মাল্ওয়ার দুর্গ আক্রমণ করিলেন। রাজার অধীনে দুই লক্ষ পদাতিক ও পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সেনা থাকা সত্ত্বেও খান আজম উলুগ্ খান, অসীম বিক্রম প্রদর্শনে অল্পকাল মধ্যে রাজ সৈন্যগণকে হতাহত ও বিতাড়িত করিয়া দুর্গ অধিকার করিলেন।

সম্রাটের একাদশ বৎসর রাজত্ব কালে ১২৫৫ খৃঃ অযোধ্যার নওয়াব কত্লু খান বিদ্রোহী হইয়া উঠায়, তাঁহার বিরুদ্ধে সম্রাট প্রধান সেনাপতি উলুগ্ খানকে প্রেরণ করিলেন। কত্লু কালিঞ্জরে পলায়ন করিয়া তথা হইতে মেবারের পর্ব্বত-সঙ্কুল উপত্যকায় ভ্রমণ করিতে করিতে যোধপুর হইতে ৮৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আবু পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী শাড়ু দেশে গিয়া, তথাকার হিন্দু রাজা দেও পালের আশ্রয় গ্রহণ করিল। উলুগ্ খান ৬৫৫ হিঃ রবি-উল্-আউয়ল্ মাসে ঐ রাজ্য আক্রমণ করিয়া হিন্দু সেনাগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। রাজা দেওপালের সেনাগণ, সুশিক্ষিত সম্রাট সৈন্যের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল দেখিয়া, উলুগ খান, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে নিধন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত বেষ্টিত সামুর উপত্যকায় সামুর দুর্গ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিলেন। ইতিপূর্ব্বে এই সামুর উপত্যকা ভূমি কখনও এস্লামের অসি দর্শন করে নাই। এই যুদ্ধে দিল্লীশ্বরের সেনাগণ এত অধিক হিন্দু সেনা বধ করিয়াছিল যে—তাহা বর্ণনার বাহিরে ও গণনার বহির্ভূত।

সোলতান নাসির-উদ্দীন ১২৬০ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

নাসের-উদ্দীনের মৃত্যুর পর, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ খান-আজম্ উলুগ্ খান, সোল্তান গেয়াস-উদ্দীন বোল্বান নাম-ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ইনি অতিশয় মৃগয়া প্রিয় ছিলেন ও এক-একবার সৈন্য-সামন্ত লইয়া মৃগয়া করিবার ছলে, বাগ্‌দাদের নিকটবর্ত্তী হলাকু দেশের জঙ্গল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেন।

পঞ্চদশ বৎসর রাজত্বের পর সোলতান গেয়াস্‌-উদ্দীন বঙ্গদেশে তোঘ্‌রেলের বিদ্রোহী হওয়ার সংবাদ পাইলেন। এই শাসনকর্ত্তা তোঘ্‌রেল্‌কে গেয়াসই লক্ষণাবতীর মস্‌নদে বসাইয়াছিলেন। তোঘ্‌রেল জাজ্‌ নগর (টিপারা) আক্রমণ করিয়া উক্ত দেশ লুণ্ঠনে বিস্তর ধনরত্ন ও হস্তী পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কিছুমাত্র দিল্লীতে সম্রাট সকাশে প্রেরণ না করিয়া সমস্তই আত্মসাৎ করিলেন। তৎপরে তোঘ্‌রেল সোলতান মুগীসউদ্দীন নাম ধারণে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

সম্রাট প্রথমতঃ আমীর খাঁনের অধীনে তোঘ্‌রেলকে দমন করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। সেনাপতি আমীর খান সরযু (গাগ্‌রা নদী) পার হইয়া লক্ষণাবতীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকা কালে, তোঘ্‌রেল বহু সংখ্যক হিন্দু ও মোস্‌লমান সৈন্য এবং হস্তিসহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন ও আমীর খানের সেনাদলকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন।

পর বৎসর সোল্‌তান গেয়াস-উদ্দীন লক্ষণাবতী আক্রমণের জন্য অধিক সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সম্রাট সেনা এবারও পরাজিত হইল!

এইবার সম্রাট স্বয়ং তোঘ্‌রেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন; এবং গঙ্গা ও যমুনা বক্ষে বহু নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সম্রাট তাঁহার এই অভিযানে দিল্লী হইতে সামানায় আসিয়া, তথাকার শাসনকর্ত্তার পুত্র বাকারা খানকে সেনা সহ নিজ সমভিব্যাহারে লইলেন।

এইরূপে বৃহৎ বাহিনীসহ দিল্লীশ্বর স্বয়ং বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন সংবাদ পাইয়া, বঙ্গেশ্বর তোঘ্‌রেলও তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। দারুণ বর্ষায় সোলতানের বাঙ্গালায় পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। তৎপরে সোলতান গেয়াস-উদ্দীন জাজ্‌ নগরের পথে অগ্রসর হইয়া, লক্ষণাবতী হইতে ৪০ ক্রোশ দূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। দিল্লীশ্বরের রাজধানীর (গৌড়ের) দিকে আগমন সংবাদ পাইয়া, তোঘ্‌রেলও সসৈন্যে জাজ্‌ নগরের দিকে গমন করিলেন। উভয় পক্ষে যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে বঙ্গেশ্বর তোঘ্‌রেল পরাজিত হইয়া আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

তখন সোলতান গেয়াস উদ্দীন কয়েক দিবস মাত্র গৌড়ে অবস্থান পূর্ব্বক, এই ঐতিহাসিক (তওয়ারিখে ফিরোজ শাহী লেখক) জিয়াউদ্দীন বারনীর মতামহ, সেপাহ্‌সালার হেশাম-উদ্দীন ওকিলদারকে লক্ষণাবতীর সামরিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং পলাতক তোঘ্‌রেলের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

সোল্‌তান সোনার গাঁয়ে উপস্থিত হইয়া তথাকার রাজা দানুজ রায়কে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিলেন ও পলাতক তোঘ্‌রেলের উপর লক্ষ্য রাখিতে অনুমতি করিয়া, নিজে যে কোন প্রকারে হউক তোঘ্‌রেলের রক্ত দর্শনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

সম্রাটসেনা জাজ্‌ নগর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াও তোঘরেল্‌কে ধৃত করিতে পারিল না। পরে এক সময় ঐ নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে তোঘরেলের সৈন্য-শিবির দেখিতে পাইয়া সম্রাট সেনাপতি মোকাদ্দের, ভীম বেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তোঘ্‌রেল জিন শূন্য অশ্বারোহণে কিছু দূর পলাইয়া গিয়া, শেষে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। মোকাদ্দেরও

অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নদীগর্ভে তরবারির আঘাতে বঙ্গেশ্বরের শিরশ্ছেদন করিলেন।

তৎপরে সোল্‌তান গেয়াস-উদ্দীন. বাক্কারা খানকে বঙ্গ-বেহার ও যুক্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চতুর্থ সর্গ

সোলতান নাসির-উদ্দীন বাকারা খান

নাসির উদ্দীন ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিশেষ সুখ্যাতির সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

এই সুবেদার বাকারা খান ও তৎপুত্র দিল্লীশ্বর কায়কোবাদের সরযূতীরে অভিনব মিলন সম্বন্ধে আমি আমার ঐতিহাসিক, কাহিনী "জান্‌কী বাঈ" গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছি। বঙ্গেশ্বর নাসিরউদ্দীন ফিরোজ শাহ্‌ পরবর্ত্তী মহা প্রতাপান্বিত বীর-কেশরী সম্রাট আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে, কিছু দিন শান্তির সহিত বাংলার মসনদে উপবিষ্ট ছিলেন।

এই স্বদেশ-প্রেমিক সুবাদারের রাজত্ব কালে গ্রন্থকর্ত্রীর শ্বশুর বংশের পূর্ব্বপুরুষ আনওয়ার-উদ্দীন খান, স্বীয় নমাঙ্কিত "আনওয়ারপুর পরগনায়" (জেলা ২৪ পরগনার অন্তর্ভূত) জায়গীর প্রাপ্তে দিল্লী হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন।

তৎপরে ৬৯৯ হিঃ ১২৯৯ খৃঃ সোলতান আলাউদ্দীন খিলিজী বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল লইয়া রাজধানী লক্ষণাবতী বা গৌড় নগর, নাসির উদ্দীনের শাসনাধীনে ও পূর্ব্ববঙ্গে সোনার গাঁ (আধুনিক ঢাকা নগর হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণ ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে প্রায় সমস্তই নদী গর্ভে লীন হইয়া

গিয়াছে) রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহা বাহাদুর খানের শাসনাধীনে দিলেন। বাহাদুর খান দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত নম্রতার সহিত পূর্ব্ববঙ্গের কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন।

১৩১৭ খৃষ্টাব্দে কুমার মোবারক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করায়, বাহাদুর খান নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক নিজকে সমস্ত বাংলা দেশের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং নিজ নাম বাহাদুর খানের পরিবর্ত্তে বাহাদুর শাহ্ দিয়া মুদ্রাঙ্কণ করিলেন।

সম্রাট অগত্যা ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে বাহাদুরের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে বাধ্য হইলেন। ত্রিহুতে পৌঁছিবার পর সিংহাসনচ্যুত রাজা নাসির উদ্দীন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সম্রাটকে অনেক ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়া, তাঁহার অপহৃত রাজ্য লক্ষণাবতী পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

বাহাদুর শাহ্ ক্ষমা চাহিয়া প্রাণ ভিক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু সম্রাট তাঁহার রাজত্ব তাঁহার করে প্রত্যার্পন না করিয়া, বিরাম খাঁনের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই অভিযানে সম্রাট ত্রিহুট অধিকার করিয়া তথায় একটি বিভিন্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও আহমদ খাঁনকে ঐ নব রাজ্যের অধিপতি নির্ব্বাচিত করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৩২৫ খৃষ্টাব্দে নাসির-উদ্দীন বাক্কারাখানের মৃত্যুর পর সম্রাট মোহাম্মদশাহ্, কাদের খানকে লক্ষণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এই নব নিযুক্ত সুবেদার ও সোনার গাঁয়ের সুবেদার বিরাম খান উভয়ে চতুর্দ্দশ বৎসরকাল নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই সময় ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে বিরাম খানের মৃত্যু হয় ও সম্রাট দক্ষিণাপথের অধিকাংশ জয় করিয়া, দিল্লী হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া, রাজা রাম দেবের পুরাতন রাজধানী দেবগিরি—তৎকালীন দৌলতাবাদে—প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে মৃত

শাসনকর্ত্তা বিরামের পার্শ্বচর জনৈক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ফখর্‌উদ্দীন, সম্রাটের বিনানুমতিতে সোনারগাঁ অধিকার করিয়া, সোলতান সেকেন্দার নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

সম্রাট এই সংবাদ শ্রবণে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা কাদেরখানকে সেকেন্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া, উহাকে সোনার গাঁয়ের সিংহাসনচ্যুত করিবার আদেশ প্রেরণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর ফখর্ উদ্দীন সেকেন্দার পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অরণ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই গুপ্তঘাতক দ্বারা কাদের খানকে হত্যা করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেনানীগণকে প্রচুর অর্থের প্রলোভনে বশীভূত করিয়া, পুনরায় ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীন রাজা হইয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

দিল্লীর সিংহাসন এই সময় খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় ফখর উদ্দীন বা সোলতান সেকেন্দার, স্বীয় রাজধানী সুবর্ণগ্রাম হইতে আসিয়া গৌড় আক্রমণ করিলেন; কিন্তু বিরামের সেনাপতি আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক পরাভূত ও নিহত হইলেন। এই আলাউদ্দীন সম্রাটের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া মাত্র দেড় বৎসর কাল রাজত্ব করার পর স্বীয় বৈমাত্রের ভ্রাতা হাজি ইলিয়াস কর্ত্তৃক নিহত হন।

সোলতান শামস্-উদ্দীন হাজী ইলিয়াস।

হাজী ইলিয়াস, তৎপরে সোলতান শামস্ উদ্দীন নাম গ্রহণে বঙ্গের সিংহাসনারোহণ করিয়া নম্রতা প্রদর্শন দ্বারা সাধারণের এত অধিক প্রিয়-পাত্র হইয়া পড়িলেন যে, অচিরে সকলেই তাঁহার ভ্রাতৃ-হত্যার বিষয় ভুলিয়া গেল।

শামস্-উদ্দীন নিজ রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে রাজ্য

বৃদ্ধির আশায় জাজ্‌ নগর (আধুনিক টিপারা রাজ্য) আক্রমণ করিলেন এবং ঐ রাজ্য জয় করিয়া বহু হস্তী ও ধনরত্ন লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একাদশ বর্ষকাল নির্ব্বিবাদে বাঙ্গালার সিংহাসনে স্বাধীন রাজা রূপে রাজত্ব করার পর, বারাণসী প্রদেশের এক অংশে অনধিকার প্রবেশের জন্য সম্রাট ফিরোজ শাহ ৭৫৪ হিজরীর শেষ ভাগে ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে বহু সৈন্য লইয়া বাংলা আক্রমণ করিলেন।

এই সময় সোলতান শামস্‌-উদ্দীন মালদহের নিকট পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং তিনি স্বীয় পুত্রকে রাজধানীতে রাখিয়া সসৈন্যে একদালী দুর্গে যাত্রা করিলেন।

সম্রাট পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী যেস্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম এখনও ফিরোজাবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ্‌ স্বয়ং এই স্থান হইতে অশ্বপৃষ্ঠে যাইয়া পাণ্ডুয়া আক্রমণ করিয়া শামস্‌-উদ্দীনের পুত্রকে বন্দি করিলেন' ও রাজধানী অধিকার করিলেন।

পরে পাণ্ডুয়া হইতে সম্রাট সৈন্য একদালী দুর্গ আক্রমণ করিল। কিছুদিন অবরোধের পর বঙ্গেশ্বর সম্রাটের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে অনেক হস্তী ও বিস্তর উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন, এবং তাঁহার রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন ৭৫৫ হিঃ।

গৌড় নগরের ঠিক মধ্যস্থলে সম্রাট ফিরোজ শাহ, বাঙ্গালা বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ স্বীয় নামাঙ্কিত যে বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন; সেই ফিরোজ-মিনার এখনও অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় মস্তক উত্তোলন করিয়া সম্রাটের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

৭৫৭ হিঃ ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর সোলতান শামস্‌-উদ্দীন স্বীয়

দূত তাজদ্দীন সহ সম্রাট-সমীপে কতকগুলি হস্তী পাঠাইয়া দিয়া বন্ধুত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন। সম্রাট তদ্বিনিময়ে রাজদূত সায়েফ-উদ্দীন দ্বারা বঙ্গেশ্বরকে অনেকগুলি আরব ও তাতার দেশীয় উৎকৃষ্ট ঘোটক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সায়েফ-উদ্দীন বিহারে পৌছিয়া শামস্-উদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আর অগ্রসর হইলেন না।

ইলিয়াস হাজী. সোলতান শামস-উদ্দীন নাম ধারণপূর্ব্বক ষোল বৎসর পাঁচ মাস কাল বাংলায় স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি গৌড় হইতে পাণ্ডুয়ায় আসিয়া নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। শামস্-উদ্দীনের রাজত্বকালে বাংলার সীমা সমস্ত বিহার প্রদেশ ও গণ্ডক নদী পার্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সেকেন্দার সাহ

তিন দিবস অতিবাহিত হইতে না হইতে অমাত্যবর্গ, ইলিয়াস পুত্র সেকেন্দার শাহকে পিতৃ সিংহাসনে বসাইলেন। প্রজাবর্গের হিত সাধনই এই নব নৃপতির জীবনের প্রধান ব্রত ছিল।

সেকেন্দার দিল্লীশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার দরবারে বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; এমন সময় ৭৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ, বঙ্গদেশে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিবার আশায় সৈন্যসহ যাত্রা করিয়াছেন, অবগত হইয়া তিনি উপঢৌকন প্রেরণে ক্ষান্ত হইলেন।

প্রবল বর্ষার জন্য সম্রাটকে জাফরাবাদে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল এই সময়ের মধ্যে বঙ্গেশ্বর দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া দূত প্রেরণ করায়, সেকেন্দারশাহ তাচ্ছিল্যতা প্রদর্শনে প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন।

বর্ষার শেষে সম্রাট সসৈন্যে পাণ্ডুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতার আদর্শে বঙ্গেশ্বরও ৭৬১ হিজরীর ১৬ জমাদিয়ল্‌ আউয়ল তারিখে দুর্ভেদ্য একদালী দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন। অবশেষে ৪৮টী হস্তী ও অনেক অর্থ ও রত্নাদি উপঢৌকন দিয়া, এবং বাৎসরিক কর দিতে স্বীকৃত হওয়ায় সম্রাট বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

১৩৬১ সালে সেকেন্দার সাহ রাজধানী পাণ্ডুয়ায়, সুবিখ্যাত এবং বাঙ্গলা দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন নির্ম্মাণ আদিনা মস্‌জিদের সুদৃশ্য কার্য্য আরম্ভ করিলেন। আমরা যে জমিমাপের সেকেন্দারী গজের নাম শুনিয়া থাকি, তাহা এই সেকেন্দার শাহের প্রবর্ত্তিত মাপ।

সোলতান সেকেন্দার শাহের দুইটী পত্নী ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে অনেকগুলি সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রথমা মহিষীর একমাত্র পুত্র গেয়াস-উদ্দীনের উপর হিংসা করিতেন। সোলতান সেকেন্দার এই ব্যবহারের বড়ই বিরোধী ছিলেন। তত্রাচ জ্যেষ্ঠ পুত্র গেয়াসের মনে নানারূপ ভয়ের সঞ্চার হওয়ায়, তিনি মৃগয়ায় বাহির হইবার ভান করিয়া স্বর্ণগ্রামে চলিয়া গিয়া তথায় অনেক সৈন্য সংগ্রহ করেন। তৎপরে কুমার গেয়াস-উদ্দীন তাঁহার সংগৃহীত সেনা লইয়া পাণ্ডুয়ার দিকে আসিতে থাকা কালে, পিতা সন্দেহ পরবশ হইয়া পুত্রকে আক্রমণ করিলেন।

এই সংঘর্ষে গেয়াস-উদ্দীন তাঁহার সেনাগণকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে—যেন কোন মতে যুদ্ধে তাঁহার পিতা আহত না হ'ন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে সেকেন্দার শাহ্‌ সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। এই সময় পুত্র গেয়াস, পিতার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন এবং পিতার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। রাজ-পিতা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। (১৩৬৭ খৃষ্টাব্দ)

সোলতান গেয়াস-উদ্দীন আবল-মোজাফ্‌ফর আজম্‌ শাহ্‌

পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গেয়াস-উদ্দীন, আজম্‌ শাহ্‌ নাম ধারণ করিয়া পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সোলতান গেয়াস-উদ্দীনের ন্যায় ন্যায়-বিচারক রাজা বঙ্গের সিংহাসনে কুত্রাপি অধিষ্ঠিত হন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি নিজে যেমন সুবিচারক ছিলেন তেমনি ন্যায় বিচারের মর্য্যাদাও রাখিতেন।

এক সময় সোলতান গেয়াস-উদ্দীন ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করিতে থাকা কালে, হঠাৎ তাঁহার হস্ত-নিক্ষিপ্ত একটী তীর এক বিধবার পুত্রের গাত্রে বিদ্ধ হয়। বিধবা তৎক্ষণাৎ কাজী-উল্‌-কোজ্জাত কাজী সেরাজ উদ্দীনের এজলাসে উপস্থিত হইয়া বঙ্গেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। ' বিচারক সোলতান গেয়াস উদ্দীনের মান রক্ষা অপেক্ষা আইনের ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, বঙ্গেশ্বরের নামে সমন বাহির করিলেন।

সোলতান ধর্ম্মাধিকরণের সমন পাইয়া একখানি ক্ষুদ্র তরবারি বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া কাজীর এজলাসে উপস্থিত হইলেন। কাজী ধর্ম্মাধিকরণের আসনে উপবিষ্ট থাকাবস্থায় তাঁহার প্রতি রাজোচিত কোন বিশেষ সম্মান প্রদর্শন না করিয়া, প্রথমতঃ সোলতানকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলিলেন। পরে অনুমতি সূচক স্বরে সোলতানের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন যে,—"আপনি অর্থের দ্বারা বা যে কোন প্রকারে পারেন বিধবাকে সন্তুষ্ট করুন; নতুবা আইনের কঠোর দণ্ড আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

তখন সোলতান বহু অর্থ দিয়া বিধবাকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং বিধবাও কাজীর নিকট সেই মত দরখাস্ত দাখিল করিয়া তাহার অভিযোগ উঠাইয়া লইল। অতঃপর বিধবার মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করণান্তে কাজী সেরাজ-উদ্দীন

বিচারাসনে হইতে নামিয়া সোলতান গেয়াস-উদ্দীনকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তখন বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তরবারি বাহির করিয়া উহা প্রদর্শনে সোলতান, কাজী সেরাজ উদ্দীনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—

"আপনার ন্যায়-বিচারে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখিলে এই তরবারি আজ আপনার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিত। এক্ষণে আমি পরম দয়ালু খোদাতাআলাকে ধন্যবাদ দিতেছি ও মনে মনে অহঙ্কৃত হইতেছি যে আমার রাজত্বে আপনার ন্যায় ন্যায়-বিচারক বিদ্যমান আছে, এবং আমার এমন একজন বিচারপতি আছেন যে ন্যায় বিচারের নিকট তিনি কোন পার্থিব শক্তির মর্য্যাদাই রক্ষা করেন না"।

তখন কাজী সাহেব বিচারাসনের নিম্ন হইতে একগাছি বেত্র বাহির করিয়া বলিলেন—

"আমি পরম করুণাময় আল্লাহতাআলা সমীপে শপথ করিয়া বলিতেছি যে যদি আপনি শাস্ত্রের ও আইনের বিধান ও আমার আদেশানুযায়ী দণ্ড গ্রহণ করিতে দ্বিরুক্তি করিতেন; তাহা হইলে এই বেত্রাঘাতে আপনার পৃষ্ঠদেশ এতক্ষণ কাল ও নীল বর্ণ ধারণ করিত।"

সোলতান কাজীর উপর যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া, এই ন্যায়বান বিচারককে প্রচুর অর্থ দানে সন্তুষ্ট করিলেন।

সোলতান গেয়াস-উদ্দীন নিজে যথেষ্ট বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দরবারে বিদ্বানের খুবই সমাদর ছিল। সোলতান তাঁহার সহপাঠী প্রসিদ্ধ ধাম্মিক ও সিদ্ধপুরুষ কোতব-উল্‌-আলমের সহিত, বীরভূম জেলার নাগর নগরের সংসার বিরাগী মহাজ্ঞানী হামিদ উদ্দীনের নিকট একত্রে ধর্ম্মজ্ঞান ও পরমার্থ-তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই মহা সিদ্ধপুরুষ হামিদউদ্দীন পরে বীরভূমের বহু জড়োপাসক হিন্দুগণকে পবিত্র এসলামের ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছিলেন।

পঞ্চম সর্গ

রাজা গণেশ

সোলতান গেয়াস্‌-উদ্দীনের রাজত্বকালে ভেতুড়িয়া পরগণার জনৈক ব্রাহ্মণ জমিদার গণেশ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি গেয়াস-উদ্দীনের রাজ সভায় প্রবেশ করিয়া যোগ্যতা প্রদর্শনে ক্রমে রাজস্ব বিভাগের অমাত্যের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সোলতান-পুত্র সায়েফ-উদ্দীনের পর তিনি নিঃসন্তান থাকায়, ওম্‌রাহগণ তাঁহার পোষ্যপুত্র শামস-উদ্দীনকে রাজা মনোনীত করিলেন। কিন্তু এই সম্পূর্ণ অক্ষম শাসনকর্ত্তাকে অধিক দিন রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই।

১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া, অপরাপর সমস্ত মোসলমান ওমরাহগণের সাহায্যে শামস-উদ্দীনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া পাণ্ডুয়ায় আসিয়া বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার চতুর্দ্দিকের পদস্থ মোসলমান ওম্‌রাহগণ এতাধিক প্রভূত বলশালী যে—তাঁহাদের সঙ্গে সামান্য দ্বন্দ্ব করিলে তাঁহার সিংহাসনচ্যুত হওন অনিবার্য্য। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া রাজা গণেশ সমুদয় আফ্‌গান ও তুর্কী ওম্‌রাহগণকে প্রভূত ভূসম্পত্তি দানে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তৎসহ তিনি ধার্ম্মিক এবং বিদ্বান মোস্‌লেমগণের জন্য বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিলেন।

এইরূপে রাজ্যের সমুদয় মোসল্‌মানগণের সহিত যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিয়া রাজা গণেশ, সাত বৎসরকাল শান্তির সহিত রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন।

ক্রমে নানা প্রকার সদ্ব্যবহার প্রদর্শনে রাজা গণেশ, মোসল্‌মানগণের নিকট নিজ আত্মাকে এরূপ অনুগ্রহভুক্ত প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে—তাঁহার মৃত্যুর পর মোসলমানেরা তাঁহাকে এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী বিবেচনায় তাঁহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিতে চাহিয়াছিল।

প্রবাদ আছে যে রাজা গণেশ হিন্দু মোসলমানের মধ্যে সখ্যতা বৃদ্ধি করণ কল্পে, নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া হিন্দুগণের মধ্যে সত্যপীরের পূজা প্রচলিত করেন। পরে হিন্দুরা উহার সত্যনারায়ণ নাম করণ করিয়াছেন।

গণেশের সময় কোন মুদ্রা প্রচলিত হয় নাই। তাঁহার রাজত্বকালে যে মুদ্রা প্রচলিত ছিল তাহাতে বায়েজিদ শাহের নামাঙ্কিত দেখা যায়। এই কারণে অনেকে রাজা গণেশের মোসল্‌মান নাম বায়েজিদ বিবেচনা করিয়া থাকেন।

সোলতান জালাল-উদ্দীন মোহাম্মদ শাহ্‌

রাজা গণেশের জীবিতাবস্থায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু ওরফে জিতমল্ল, পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধ পুরুষ কোতব-উল্‌-আলমের নিকট এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জালাল উদ্দীন নাম গ্রহণ করেন।

সিংহাসনারোহণের পর সোলতান জালাল-উদ্দীন মোহাম্মদ শাহ, মোসলমান ধর্ম্মের একজন মহা উদ্যোগী শিষ্য হইয়া পড়িলেন; এবং সুবর্ণগ্রাম হইতে প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম যাজক সেখ জাহেদকে আনয়ন করিয়া তাঁহার পরামর্শ মত সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য, এমন কি রাজ কার্য্য পর্য্যন্ত চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

সোলতান জালাল উদ্দীন পাণ্ডুয়া হইতে পুনরায় গৌড়ে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া গিয়া বহু অর্থব্যয়ে লক্ষ্মণাবতীর পুনঃ সংস্কার করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে জালাল, পূর্ণ উদ্যমে তাঁহার রাজত্বের মধ্যে চতুর্দ্দিকে এসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকায়, অনেক পৌত্তলিক জড়োপাসনা পরিত্যাগ করিয়া, পবিত্র এসলাম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। জালাল উদ্দীন গৌড়ে ও রাজ্যের সর্ব্বত্র বিস্তর মসজিদ ও বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন। এখনও পর্যান্ত তাঁহার ঐ সমস্ত বৃহৎ কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ গুলি স্থানে স্থানে "জালালী" নামে অভিহিত হইয়া সোলতান জালাল-উদ্দীনকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

জালালের রাজত্বকালে দিল্লীর সিংহাসন সোলতান চতুর্থ মোহাম্মদের দুর্ব্বল হস্তে ন্যস্ত থাকায়, তিনি বিনা বাধা বিঘ্নে অষ্টাদশ বর্ষকাল স্বাধীন ভাবে বঙ্গের সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

দিল্লীশ্বরের এই দুরবস্থার সময়ে হিঃ ৮০১ সালে ভারতের মোগল সম্রাটগণের পূর্ব্ব পুরুষ তৈমুরলঙ্গ, ভারত আক্রমণ করিয়া সম্রাটকে অধিকতর বিপন্ন করিয়াছিলেন। এই বিপ্লবের সূচনায় বাঙ্গলা দেশের ন্যায়, আজীম শাহের অধীনে গুর্জ্জর প্রদেশ, দেলাওয়ারের অধীনে মালব খণ্ড ও কর্ণাট হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অযোধ্যা প্রদেশ, জৌনপুরে খাজে জাহানের অধীনে "স্বাধীন-পূর্ব্ব-রাজত্ব" নামে এক নূতন রাজ্য, খেজের শাহের অধীনে লাহোর, দেবালপুর ও মুলতান প্রদেশ; এবং গালেবের অধীনে সামানা প্রদেশ, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশ গুলিই দিল্লীর অধীনতা শৃঙ্খল কর্ত্তন করিয়া, এক একটী স্বাধীন মোসলমান রাজ্যে পরিণত হইল।

সোলতান জালাল-উদ্দীন যথার্থ ন্যায় বিচারের সহিত অষ্টাদশবর্ষ কাল রাজত্ব করার পর গৌড় নগরে ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

আহম্মদ শাহ

জালাল-পুত্র আহম্মদ শাহ হিঃ ৮১২ সালে ১৪০ খৃঃ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজা সুবিচার দ্বারা অচিরে হিন্দু মোসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি পিতার ন্যায় তেজস্বী ছিলেন না দেখিয়া জোনপুররাজ সোলতান এব্রাহিম, বহু সৈন্য লইয়া বাংলা আক্রমণ করিলেন।

বঙ্গেশ্বর এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জোনপুর রাজের সহিত প্রতিযোগিতা করা তাঁহার ক্ষমতাতীত বিবেচনা করিয়া, তৈমুর-পৌত্র শাহ্ রোখের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। দিল্লীর অবস্থা সে সময় এতাধিক শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, শাহ-রোখ পারস্য দেশে হেরাতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকিলেও, তিনি হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইতেন।

তাতার সম্রাট শাহ-রোখ, বঙ্গেশ্বরের দূতকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি ভয় প্রদর্শক একখানি পত্র লিখিয়া হাজী আবদুল করিমের হস্তে উহা সোলতান এব্রাহিমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন: দুর্দ্দান্ত-প্রতাপ তাতার সম্রাটের এই ভীতি প্রদর্শক পত্র প্রাপ্তি মাত্র জোনপুর রাজ এব্রাহিম, বঙ্গদেশীয় সমুদয় বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন ও তদবধি আর কখনও বাঙ্গলা আক্রমণের চিন্তা করেন নাই।

হাজী আবদুল করিমের সহিত তাতার রাজ, মৌলানা আবদর রহিম নামক একজন দূতকে গৌড়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিছু দিন গৌড়ে অবস্থান করিয়া এই উভয় দূত একত্রে প্রত্যাবর্ত্তন পথে, অর্ণবপোতারোহণে অর্দ্ধচন্দ্র উপসাগরের মধ্য দিয়া হেরাত যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু কালিকাট বন্দরের নিকট জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়

তাঁহাদিগকে তথাকার শাসনকর্ত্তা জামোরিণের নিকট আত্ম-পরিচয় দানে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। শাসনকর্ত্তা, প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট শাহ্-রোখের নাম শ্রবণে তাঁহাদিগকে অতি যত্নের সহিত আশ্রয় দিয়া, পরে স্বীয় দূত সমভিব্যবহারে হেরাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আহম্মদ শাহ্ আঠার বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪২৬ খৃষ্টাব্দে ৮৩০ হিঃ মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। সোল্‌তান আহম্মদ্ শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ সাধু বদর-উদ্দীন বা পীর বদরের মৃত্যু হয়। এখনও নৌকার মাঝিরা নদীতে কোন বিপদে পতিত হইবার সম্ভাবনা দেখিলে এই পীর বদরের নাম উচ্চারণ করিয়া বিপদ উদ্ধারের প্রত্যাশা করিয়া থাকে।

ষষ্ঠ সর্গ

ইলিয়াস্ সাহীবংশ

আহম্মদ সাহের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায়, ওমরাহ্‌গণ হাজী ইলিয়াস্ সোল্‌তান শামসউদ্দীনের বংশধর জনৈক যুবককে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইলেন।

এই নব শাসন কর্ত্তার নাম হইল সোল্‌তান নাসের-উদ্দীন আবুল মোজাফ্‌ফার মাহ্‌মুদ সাহ্‌। মাহ্‌মুদের রাজত্ব কালে দিল্লীর সহিত জৌনপুরের যুদ্ধ চলিতে থাকায়, তিনি শান্তির সহিত ৮৩০ হিঃ হইতে ৮৬২ হিজরী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন ও এই সুদীর্ঘ সময় মধ্যে রাজধানীর অবস্থা অনেক উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

তৎপরে সোল্‌তান-কুমার রোকণ-উদ্দীন বারবাক্ সাহ্‌ বঙ্গদেশ শাসন কালে, আফ্রিকা হইতে কাফ্রি আনাইয়া তাঁহার সেনাদল পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গীয় সেনাদলের মধ্যে আট হাজার উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ও পদাতিক নিগ্রো পল্‌টন ছিল। এই কাফ্রিগণ ক্রমশঃ সোলতানের বিশ্বাসভাজন হইয়া উচ্চ পদে উন্নীত হইতে লাগিল। বঙ্গের উদাহরণে সেই সময় দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের রাজাগণও আবিসীনীয় সৈন্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ বর্ষ কাল সুখ্যাতির সহিত ও যত্ন সহকারে প্রজা পালন করিয়া, বারবক্ সাহ, ১৪৭৪ সালে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইউসফ সাহের উপর রাজ্য-ভার

অর্পণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। সোল্‌তান বার্‌বকের প্রস্তুত সিংহদ্বার এবং দুর্গ প্রকার ও সুগভীর গড়, অদ্যাপি গৌড়ে বিদ্যমান আছে। রোকণ-উদ্দীনের শাসনকালে একজন প্রসিদ্ধ পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারি ও ঐতিহাসিক রাজধানী লক্ষণাবতী নগরে আসিয়া, তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা হইতে অবগত হওয়া যায় যে—তৎকালে গৌড়ের লোক সংখ্যা অন্যূন দ্বাদশ লক্ষ ছিল। এই সময়ে সম্রাট্‌ বহ্‌লুল লোদী দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

শামস-উদ্দীন ইউসফ্‌ সাহ্‌

এই নব শাসনকর্ত্তা একজন অতি ধীর প্রকৃতি, ধর্ম্মপরায়ণ, বিচক্ষণ, বিদ্বান ও আইনজ্ঞ নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে বিচারকগণ যাহাতে সুবিচার করেন ও কোন মতে অবিচার প্রশ্রয় না পায়, তৎপ্রতি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। প্রতি সপ্তাহে সমস্ত আদালতের বিচার সম্বন্ধীয় বিবরণ তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইত ও তিনি নিজে সেই সমুদয় কাগজ-পত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া, তন্মধ্যস্থ যাবতীয় কূট সমস্যাগুলি মীমাংসা করিয়া দিতেন। বিচারকগণ সর্ব্বক্ষণ তাঁহার ভয়ে থরহরে কম্পবান থাকিতেন।

ইউসফ্‌ সাহ্‌ যাবতীয় প্রজা-মণ্ডলীর নিকট অতি সুখ্যাতির সহিত সাড়ে সাত বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া তাহাদের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন হিঃ ৮৮৭।

সোল্‌তান ফতেহ্‌ সাহ্‌ ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রবল প্রতাপশালী হাব্‌সী, বারিক কর্ত্তৃক ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে নিহত হ'ন। তাঁহার নিধনের পর উক্ত হাব্‌সী, সোলতান সাহ্‌জাদা নাম ধারণে গৌড়ের সিংহাসনারোহণ করিলেন। কিন্তু আট মাসের মধ্যেই এই মদ্যপায়ী

হাব্‌সী শাসনকর্ত্তা আর একজন আবিসীনীয়, মালেক্ আন্‌দিল কর্ত্তৃক রাজ-অন্তঃপুরে নিহত হইয়াছিল।

অতঃপর ওমরাহগণ ও মালেক আন্‌দিল স্বয়ং মৃত সোলতান ফতেহ্ সাহের মহিষীকে, তাঁহার দুই বৎসরের পুত্রের অভিভাবক স্বরূপ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু উক্ত মোস্‌লেম রমণী কোন মতে এই পুরুষোচিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, জনসাধারণে আন্দিল্‌কে ফিরোজ সাহ্ নাম দিয়া রাজাসনে বসাইলেন। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দ।

ফিরোজ সাহ আন্‌দিল

সোল্‌তান ফিরোজ সাহ্ আন্‌দিল ইতিপূর্ব্বে ফতেহ্ সাহ্ ও সোল্‌তান সাহ্‌জাদার সেপাহ্-সালার নিযুক্ত থাকিয়া, যথেষ্ট বীরত্বের ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি প্রথমাবস্থায় সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার তিন বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে তিনি গরীব দুঃখীগণকে প্রচুর অর্থ বিতরণে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। একদা তিনি প্রধান মন্ত্রীর উপর রাজকোষ হইতে এক লক্ষ টাকা বিতরণের আদেশ প্রদান করেন। মন্ত্রী, রাজ-ধনাগার হইতে এককালে এত অর্থ বিতরণার্থে বাহির করিতে ইতস্ততঃ করিয়া, একত্রে এক লক্ষ টাকার সমষ্টি দেখিলে সোল্‌তানের মত পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে ভাবিয়া, তাঁহার দরবারে আসিবার পথপার্শ্বে ঐ টাকা গাদা দিয়া রাখিয়াছিলেন। দরবারে আসিবার কালে পথপার্শ্বে এত টাকা দেখিয়া ফিরোজ সাহ্ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, মন্ত্রী উত্তর দিলেন যে—"জাঁহাপানার আদেশ মত ঐ টাকাগুলি দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতে হইবে।" তাহাতে সোল্‌তান—"এই কয়টী মাত্র টাকা"

বলিয়া বিতরণার্থে উহার সমষ্টি দ্বিগুণিত করিবার অনুমতি দিয়া গেলেন। অনন্তর মন্ত্রীকে বাধ্য হইয়া দুই লক্ষ টাকা বিতরণ করিতে হইল।

ফিরোজ সাহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসের উদ্দীন মাহ্‌মুদ সাহ্‌ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন ও একবৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রভূত ক্ষমতাশালী প্রধান অমাত্য হেব্‌জ খাঁনের ক্রীড়া পুত্তলী হইয়া থাকার পর, মন্ত্রীর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া জনৈক ক্ষমতাশালী ওমরাহ্‌ সিদ্দী বাদার-দেওয়ান সাহায্যে তাহাকে হত্যা করেন। অল্পদিন মধ্যে সিদ্দী বাদার, মাহ্‌মুদ সাহকেও হত্যা করিয়া হিজরী ৯০০ সনে আবু নসর্‌ মোজাফ্‌ফর সাহ্‌ নাম ধারণে গৌড়ের মসনদ অধিকার করিলেন।

আবু নসর্‌ মোজাফ্‌ফর সাহ্‌

মোজাফ্‌ফরের ন্যায় নৃশংস অত্যাচারী আর কোন মোসল্‌মান নরপতি বাঙ্গলার সিংহাসন কলঙ্কিত করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মোজাফ্‌ফরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ৯০৩ হিজরীতে (১৪৯৭ খৃঃ) রাজ্যের সর্দ্দার ও ওমরাহ্‌গণ, মন্ত্রী সৈয়দ হোসেনের অধীনে সোল্‌তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন, এবং তাঁহাকে রাজধানীর মধ্যেই এক প্রকার অবরোধ করিয়াছিলেন। সেই সময় মোজাফ্‌ফর সাহের অধীনে পাঁচ সহস্র উৎকৃষ্ট অবিসীনীয় যোদ্ধা এবং ২৫০০০ হাজার আফ্‌গান ও বাঙ্গালী পল্টন থাকায়, তিনি চারি মাস কাল শত্রুগণের সহিত সমভাবে যুঝিতে লাগিলেন।

এই সময় দুর্দ্দান্ত সোলতান নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রত্যহই যুদ্ধে বন্দিদিগকে তিনি স্বহস্তে তরবারির আঘাতে নিহত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে স্বীয় সৈন্যগণকে শত্রুগণের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত

মনে করিয়া, সোলতান মোজাফ্‌ফর তাঁহার সমুদয় সৈন্যসহ নগরের বাহিরে আসিয়া, সৈয়দ হোসেনকে আক্রমণ করিলেন। তখন নগর প্রান্তে যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল, তাহাতে নিষ্ঠুরাবতার মোজাফ্‌ফর রণক্ষেত্রে নিহত হইলেন। গৌড় প্রান্তর রুধির সিক্ত কর্দ্দমে ও অন্যূন ২৬০০০ সহস্র যোদ্ধার মৃতদেহে এক অতি বীভৎস আকার ধারণ করিল।

সপ্তম সর্গ

হোসায়েন সাহি বংশ

সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসায়েন সাহ্

অত্যাচারী মোজাফ্‌ফারের নিধনের পর সোলতান আলাউদ্দীন ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

এই মক্কা নিবাসী সদ্বংশজাত প্রসিদ্ধ সৈয়দ হোসায়েন, সামান্যঅবস্থায় বাঙ্গলায় আসিয়া ক্রমে প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হইয়া ছিলেন; এবং মোজাফ্‌ফর সাহের বধের পর সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছামতে বাঙ্গলার সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হোসায়েন সাহ্ প্রথমেই অবিসীনীয়গণকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি সমস্ত হাব্‌সীগণকে তাঁহার সেনাদল হইতে বরখাস্ত করিলেন। তাহারা অন্য কোথায়ও স্থান না পাইয়া শেষে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে যাইতে বাধ্য হইল ও তথায় সিদ্দি নামে পরিচিত হইতে লাগিল।

আলাউদ্দীন গুণীর আদর করিতেন। তিনি অনেক সদ্বংশজাত কর্ম্ম-দক্ষ ব্যক্তিকে, হিন্দু-মোসল্‌মান্‌ নির্ব্বিশেষে রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অতঃপর তাঁহার দেশ জয়ের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তখন তিনি প্রভূত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আসাম ও কামরূপ অভিযান করিলেন।

অচিরে উক্ত প্রদেশদ্বয়ের হিন্দু রাজাগণকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া, তিনি স্বীয় পুত্রকে বিজীত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জৌনপুরের রাজা সাহ্ হোসেন, দিল্লীশ্বর সম্রাট সেকেন্দার সাহের সৈন্যগণের নিকট পরাভূত হইয়া বাঙ্গলায় আসিয়া, সোল্‌তান আলাউদ্দীনের আশ্রয় প্রার্থী হইলেন। সোল্‌তান তাঁহার উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া, তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত তাঁহার জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন। উক্ত রাজার সমাধি এখনও পর্য্যন্ত গৌড়ের প্রান্তভাগে বিদ্যমান আছে।

১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সেকেন্দার লোদি বেহার জয় করিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন; কিন্তু তোগ্‌লকপুর পর্য্যন্ত পৌছিয়া অবগত হইয়াছিলেন যে—বঙ্গেশ্বর-পুত্র কুমার দানিয়েল্, সন্ধির জন্য তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, সম্রাটের নিকট আগমন করিতেছেন।

সম্রাট স্বভাবতই শান্তিপ্রিয় ছিলেন। সে কারণ আর অগ্রসর না হইয়া, দুইজন ভদ্র বংশীয় রাজ দূতকে কুমারের উদ্দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত উভয় পক্ষীয় রাজদূত, পাটনা জেলাস্থ বাড় নগরে মিলিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই এই সন্ধি সর্ত্তে সম্মত হইলেন যে—দিল্লীশ্বর আর বাঙ্গলা আক্রমণ করিবেন না, এবং বেহার তিরহুত ও সারণ প্রভৃতি যে সমস্ত জেলা ইতি পূর্ব্বে জৌনপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ও যাহা এক্ষণে সম্রাটের অধিকারে আছে উহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে; উহার কোন অংশ বঙ্গেশ্বর তাঁহার নিজের বা আশ্রিত জৌনপুর রাজার জন্য দাবি করিতে পারিবেন না। বঙ্গেশ্বর ও দিল্লীশ্বর, অতঃপর কেহ কাহারও শত্রুর সহ মিলিত হইয়া কাহারও বিপক্ষতাচরণ করিবেন না।

সন্ধি পত্র স্বাক্ষরের পর হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সোল্‌তান হোসায়েন সাহ্ নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই হোসায়েন সাহের রাজত্ব কালে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, বৈষ্ণবগণের ধর্ম্মগুরু (নিমাই) চৈতন্য দেবের প্রেমে, বঙ্গীয় হিন্দু নর-নারী উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেকে তাহাদের চিরাভ্যস্থ মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণু-প্রেমে মাতিয়া, এই দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশতী বৎসর বয়ক্রম কাল পর্য্যন্ত চৈতন্যদেব সংসারী ছিলেন; এবং প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার এই পত্নীর নাম ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। এই সহধর্ম্মিনীকে পরিত্যাগ করিয়া তৎকালের বিশ্বম্ভর মিশ্র (চৈতন্য) ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কাটোয়ায় গিয়া, কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম গ্রহণ করিলেন। তৎপরে চৈতন্যদেব পুরুষোত্তম (পুরী) গিয়া, বিস্তর নগরবাসীকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ক্রমে তথা হইতে দক্ষিণাপথ ভ্রমণের পর বরাবর উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সাধের দ্বারকা নগর প্রভৃতি বেড়াইয়া, বঙ্গের রাজধানী গৌড়ে উপস্থিত হ'ন।

এই সময় গৌড়েশ্বর সোল্‌তান আলাউদ্দীন হোসায়েন সাহ, একদিন প্রাসাদের ছাদ হইতে গঙ্গার শোভা দেখিতেছিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে—অনেক লোক দল বাঁধিয়া নাচিতে নাচিতে ও তারস্বরে গাহিতে গাহিতে একজন সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গঙ্গা তীরস্থ পথাবলম্বনে অগ্রসর হইতেছে। এই অবস্থা দর্শনে সোল্‌তানের সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তির উদ্রেক হওয়ায়, তিনি সহর কোতওয়াল্‌কে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে—সন্ন্যাসীর প্রতি যেন কোন অত্যাচার না হয়; তিনি যথেচ্ছা নগর মধ্যে ভ্রমণ করিতে পারিবেন।

চৈতন্যদেব জীবনের শেষকাল জগন্নাথ ক্ষেত্রেই যাপন করিয়াছিলেন। সোল্‌তান হোসায়েন সাহের যেমন রাজ্য বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি ছিল, তদ্রূপ রাজ্যের উন্নতির দিকেও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ইঁহার রাজত্ব কালে বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে বহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয় খনন, পান্থশালা নির্ম্মাণ ও বড় বড় রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। গৌড়ের বিশাল সাগর-দিঘী, সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসায়েন সাহের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। মানব হস্ত খোদিত এই অপূর্ব্ব জলাশয়ের তুলনা জগতে বিরল। গভীরতা, পরিচ্ছন্নতা এবং জলের স্বচ্ছতায়, সাগরদিঘির স্থান এখনও পর্য্যন্ত কোন বৃহদায়তন নৈসর্গিক হ্রদের নিম্নস্তরে নহে। গৌড়ের অপর সুস্বাদু স্বচ্ছ-সলিলা বৃহদায়তন পিয়াস্‌-ওয়ারী দিঘী, সাগরের পূর্ব্বে কাটান হইয়াছিল। হোসায়েন সাহ্‌ গৌড় হইতে জগন্নাথ ধাম পর্য্যন্ত সুপ্রসস্ত রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করেন; এবং এই পথের পার্শ্বে দূরে দূরে অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন।

সোল্‌তান শান্তির সহিত প্রজামণ্ডলী ও সর্ব্বসাধারণের প্রিয় পাত্র হইয়া ২৩ বৎসর সুশাসন করার পর ১৫২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রিয় লক্ষণাবতী নগরে দেহ রক্ষা করিলেন।

নাসের্‌ উদ্দীন আবুল মোজাফ্‌ফর নসরৎ সাহ্‌

পিতার মৃত্যুর পর তাহার অষ্টাদশ পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নসরৎ সাহ্‌, আবুল মোজাফ্‌ফর নাম ধারণে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নসরৎ অতিশয় দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন। সিংহাসনারোহণের পরই তিনি ভ্রাতাগণের পিতৃ নির্দ্ধারিত বৃত্তি দ্বিগুণিত করিয়া দিলেন।

এই সময় প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট বাবরের ভারত আক্রমণে, মোগল পাঠানে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। বঙ্গেশ্বর এই সুযোগ পাইয়া দিল্লীশ্বর সেকেন্দার

লোদির সহিত পিতৃ সন্ধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক ত্রিহুত রাজ্য আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজার প্রাণ নাশ করেন, এবং তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া স্বীয় ভগ্নীপতি আলাউদ্দীনকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন। তৎপরে সোল্‌তান, হাজীপুর অধিকার পূর্ব্বক অপর পিতৃ-জামাতা সেনাপতি মখ্‌দুম আলমের প্রতি ঐ রাজ্যভার ন্যস্ত করেন। পরে তথা হইতে গঙ্গা পার হইয়া মুঙ্গের দুর্গ অধিকার করিয়া, সেনাপতি কোতব খানকে মুঙ্গেরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পানিপথের যুদ্ধে মোগল বীর মহাপরাক্রান্ত বাবর, দিল্লীশ্বর এবরাহিম লোদীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া, দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। পাঠান রাজত্বের এই সমূহ বিপদের সময় বহুসংখ্যক ওম্‌রাহ্‌, এমন কি সম্রাট এবরাহিম লোদীর সহোদর মাহ্‌মুদ লোদী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে আসিয়া গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সোল্‌তান নসরৎ সকলেরই পদোপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে দিল্লীশ্বর এবরাহিম লোদীর একটী বয়স্থা কন্যা, খুল্লতাত মাহমুদের সহিত গৌড়ে আসিয়াছিল। মাহমুদ লোদী, ঐ সম্রাট-নন্দিনীকে সোল্‌তানের করে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই রাজকীয় বিবাহে গৌড় নগরে কিয়দ্দিবস সমারোহের পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল।

১৫২৯ খৃষ্টাব্দে মাহ্‌মুদ লোদী অনেক বঙ্গীয় ও আফ্‌গান সেনা সংগ্রহ করিয়া পৈতৃক সম্রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্রাট বাবরও সেই সময় আগ্রা পরিত্যাগে ক্রমশঃ পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গঙ্গাতীরে চিদেরির নিকটে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। মোগল সেনা-গণের অসীম ক্ষমতা, বিশেষতঃ মোগল অশ্বারোহীগণের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণের ফলাফল চিন্তা করিয়া, তাহারা গঙ্গা পার হইতে থাকা কালেই, বঙ্গীয়

সেনাগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ও সোন নদী উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত মাহ্‌মুদ লোদীর সেনাগণ আর পশ্চাৎ দিকে ফিরিল না।

সোল্‌তান নস্‌রৎ সাহ বঙ্গীয় সেনাগণের এই অবস্থা শ্রবণে সম্রাটের নিকট বহু উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সোন ও গঙ্গার সঙ্গম স্থান মুনীর নগরে সন্ধি পত্র সাক্ষরিত হইল। এই সন্ধির প্রধান সর্ত্ত হইল যে—বঙ্গেশ্বর অতঃপর মাহ্‌মুদ লোদীকে আর কোন সাহায্য করিবেন না।

৯৩৭ হিঃ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্‌ জহীর-উদ্দীন মোহাম্মদ বাবের, আগ্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

সম্রাটের মৃত্যুর পর পাঠানগণ আর একবার সম্রাট পুত্র হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। মাহ্‌মুদ এইবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জৌনপুরের মোগল শাসনকর্ত্তা জোনায়েদ বারলাস্‌কে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিলেন। অপর দিক হইতে গুর্জ্জর রাজ সোলতান বাহাদুর, ক্রমশঃ দেশ জয় করিতে করিতে মিন্দু দুর্গ অধিকারের পর চত্বারিংশ সহস্র সৈন্য লইয়া অগ্রার প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শেষ জীবনে সোল্‌তান নসরৎ শাহ্‌ হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া বড়ই অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে সাধারণের দারুণ অসন্তোষভাজন হইয়া পড়ায়, একদিন গৌড়ে তাঁহার পিতৃ সমাধি দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকা কালে, সমভিব্যাহারী একজন হাব্‌সী তাঁহাকে হত্যা করে। (১৫৩৩ খৃঃ ৯৪০ হিজরী)।

নসরৎ শাহ্‌ গৌড় নগরে বিখ্যাত স্বর্ণ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন; এবং রাজপ্রাসাদ সম্বলিত দুর্গাভ্যন্তরে সুপবিত্র কদম্‌-রসুল রক্ষা করিয়া, তাহার উপর সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই কদম-রসুল সৌধাভ্যন্তরে যে পরম পবিত্র মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পদচিহ্ন অঙ্কিত

একখণ্ড প্রস্তর রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে শাহ্ জালাল নামক একজন সাধু পুরুষ আরব দেশ হইতে অতি যত্নের সহিত পাণ্ডুয়ায় আনয়ন করেন। তৎপরে সোল্তান হোসায়েন শাহ্ উহা একখানি মণি-মাণিক্য-খচিত বস্ত্রাবৃত করিয়া গৌড়ে আনয়ন করিয়াছিলেন।

গেয়াস-উদ্দীন মাহ্মুদ শাহ্

নস্রতের ভ্রাতা তৃতীয় মাহ্মুদ শাহ্ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে গেয়াস-উদ্দীন নাম ধারণে বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রথমেই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্কে নিহত করিয়া তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক করেন। তাঁহার এই নিষ্ঠুর আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহার ভগ্নীপতি হাজিপুরের শাসনকর্ত্তা মখ্দুম-আলম্ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়া, প্রসিদ্ধ বীর সের আফ্গানের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করিলেন। শের আফ্গান স্থর, সেই সময় বেহারের শাসনকর্ত্তা মাহ্মুদ লোহানির নাবালক পুত্র জেলাল লোহানির অভিভাবক নিযুক্ত ছিলেন। এই শের আফগান স্থর পরে ভারত সম্রাট হুমায়ূনকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

মাহ্মুদ শাহ্ তাঁহার অধীনস্থ মুঙ্গেরের শাসনকর্ত্তা কোতব খাঁনকে বেহার আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই সময় শের শাহ্ স্থর সন্ধির প্রস্তাব করা সত্ত্বেও কোতব. তাঁহার অধীনস্থ বঙ্গীয় সেনাগনকে শেরের মুষ্টিমেয় আফ্গান সেনা অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে ক্ষমতাশালী বিবেচনা করিয়া, সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইতিমধ্যে কোতব খাঁন তীর বিদ্ধ হইয়া হস্তী পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, তাঁহার সৈন্যগণ নায়ক বিহীন হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগে পলায়ন করিতে লাগিল।

এই যুদ্ধের ফলে বহু যুদ্ধোপকরণ ও বিস্তর রণহস্তী শেরের হস্তগত হইয়াছিল।

বঙ্গেশ্বর এই পরাভবে অপমানিত হইয়া, বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কোতব পুত্র এব্রাহিম খাঁনকে শের শাহ্‌ সুরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিতে রহিলেন। এমন সময় দৈবনির্ব্বন্ধন বশতঃ বেহারের বালক শাসনকর্ত্তা জালাল-উদ্দীন, স্বীয় অভিভাবক শের শাহের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া, অনেক অনুচর সহ আসিয়া বঙ্গেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করায়, মাহ্‌মুদ শাহ্‌ এই দুর্দ্দান্ত আফ্‌গানের বিরুদ্ধে অভিযানের যথেষ্ট উপকরণ পাইয়া বসিলেন।

শের অবস্থা দেখিয়া বেহার দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুর্গ প্রাকার যথেষ্ট প্রশস্ত হইলেও উহা সামান্য মৃত্তিকা নির্ম্মিত থাকায়, বাঙ্গালী সেনাগণের ঐ দুর্গ সহজে অধিকার করিবার আশা হইতেছিল। তাহারা সেনাপতির আদেশ ক্রমে দুর্গের চতুর্দ্দিক অবরোধ করিয়া রহিল। কিছুদিন অবরোধের পর সেনাপতি এবরাহিম, বঙ্গেশ্বরের নিকট আরও সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ঐ সহকারী নরবল পৌছিবার পূর্ব্বেই শের, তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ অল্প সংখক আফ্‌গান সৈন্য লইয়া দুর্গ মধ্যে হইতে বাহির হইলেন ও প্রচণ্ড বেগে বাঙ্গালী সেনাগণের উপর পতিত হইয়া, অত্যল্পকাল মধ্যে তাহাদের সেনাপতিকে হত্যা করিলেন; এবং সমস্ত বাঙ্গালী পল্টনকে জালাল উদ্দীন সহ বেহার হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। জালাল পুনরায় গৌড়ে আসিয়া সোল্‌তানের আশ্রয় লইলেন। (১৫৩৫ খৃষ্টাব্দ)

এই যুদ্ধাবসান হইতেই বঙ্গেশ্বরের সিংহাসন টলিতে লাগিল। পর বৎসর হিঃ ৯৪৩ সনে, শের চুনারের প্রসিদ্ধ পার্ব্বতীয় দুর্গ অধিকার করিয়া সসৈন্যে বঙ্গদেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাজমহল ও সাহেব গঞ্জের নিকটবর্ত্তী তেলিয়াগড়ি ও শিকরিগলির গিরিবর্ত্মদ্বয় অতিক্রম

করিবার সময় আফ্‌গান সেনাগণকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে তথায় বাঙ্গালী সেনাগণকে পরাজিত করিয়া, শের বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন। সোলতান মাহ্‌মুদ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজধানী গৌড়ের দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। এই সময় সম্রাট হুমায়ুন বেহারে উপস্থিত থাকিয়া, চুনারদুর্গ অধিকারের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন।

শেরশাহ্‌ স্বীয় পুত্র জালাল ও সেনাপতি খওয়াস্‌ খান্‌কে গৌড়ে রাখিয়া বেহার গমন করিলেন। অচিরে দুর্গ মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের অভাব হওয়ায়, সোল্‌তান মাহ্‌মুদ অনুচর সহ নৌকাযোগে পলায়ন করিয়া হাজীপুরে পৌছিলেন। লক্ষ্মণাবতী আফ্‌গানদিগের হস্তগত হইল। তাহারা দুর্গ প্রবেশে মাহ্‌মুদের দুই পুত্রকে বন্দি করিয়া, শেষে তাহাদিগকে হত্যা করিল।

এদিকে বেহারের পথে আফগান সেনাগণ সোলতান মাহ্‌মুদের অনুসরণ করিতে থাকায়, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আফ্‌গানগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইল। এই খণ্ডযুদ্ধে সোল্‌তান সামান্য আহত হইয়াছিলেন। অবশেষে অতিকষ্টে, সম্রাট হুমায়ুনের চুনার দুর্গ অবরোধ করিয়া থাকাবস্থায়, সোল্‌তান তাঁহার নিকট পৌছিলেন।

সম্রাট, বঙ্গেশ্বরের মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, চুনার অধিকারের পরই বাঙ্গালায় আসিয়া মাহ্‌মুদকে তাঁহার হারাণ সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

৯৪৫ হিজরীর প্রারম্ভে চুনার দুর্গ অধিকার করিয়া সম্রাট, বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সম্রাট যখন শুনিতে পাইলেন যে— আফ্‌গানগণ তেলিয়াগড়ি ও শিক্রিগলির গিরিপথ অবরোধ করিয়া, বঙ্গে প্রবেশের প্রধান রাস্তা দুইটী বন্ধ করিয়া দিতেছে, তখন তিনি উহাদিগকে হটাইয়া দিবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষ জাঁহাঙ্গির কুলি বেগ্‌কে প্রেরণ করিলেন।

শের আফ্‌গান সূর-পুত্র জালালের সহিত জাঁহাঙ্গির কুলির ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অবশেষে জাঁহাঙ্গির বিস্তর সেনাক্ষয় করিয়া ও স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত হইয়া, সম্রাট সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

এইবার সম্রাট তাঁহার সমস্ত বাহিনী লইয়া জালাল্‌কে আক্রমণ করিলেন। জালাল পশ্চাৎপদ হইয়া ক্রমে গৌড়ে গিয়া, পিতার সহিত মিলিত হইল। তখন বিতাড়িত সোলতান মাহ্‌মুদ, মোগল সৈন্যের সহিত আবার বাঙ্গালায় আসিবার জন্য পূর্ব্ব মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু কাহাল্‌ গাঁয়ে পৌছিয়া জালাল কর্ত্তৃক তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে মাহ্‌মুদ, শোকে ম্রিয়মান ও ক্ষীণ হইয়া পথেই প্রাণত্যাগ করিলেন। (১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ ৯৪৫ হিজরী)।

বাদশাহ্‌ হুমায়ুন

ভারত সম্রাট হুমায়ুন, বঙ্গদেশের দ্বার স্বরূপ প্রসিদ্ধ গিরিপথদ্বয় অধিকার করিয়া ক্রমশঃ রাজধানী গৌড়ে আসিয়া পৌছিলেন। ইত্যবসরে চতুর চূড়ামণি শের সাহ্‌ বঙ্গের রাজকোষের সমুদয় অর্থ, ছয় কোটির অধিক স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া লইয়া স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে ঝাড়খণ্ডের পার্ব্বত্য পথ দিয়া, তাঁহার জন্মস্থান সস্‌রামে গমন করিলেন ও তথায় প্রভূত চাতুর্য্য জাল বিস্তারে রোটাস্‌ দুর্গ অধিকার করিয়া, তন্মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হুমায়ুন অনায়াসে রাজধানী লক্ষণাবতী অধিকার করিলেন। নগরবাসীগণ সসম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। বাদশাহ্‌ গৌড়ের সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রীত হইয়া, রাজধানীর নাম "জেন্নাত আবাদ" (স্বর্গ নগর) রাখিলেন। এই সময়ের সিক্কায় বাদশাহের নামের সহিত জোন্নাতাবাদ নাম দেখা গিয়া থাকে।

গৌড় জয়ে সম্রাট এতোধিক প্রীত হইয়াছিলেন যে—তদবধি তিন মাস

কাল তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া, অন্য কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। ক্রমে বাঙ্গালার জল বায়ু মোগলদিগের অসহ্য হইতে লাগিল ও দেখিতে দেখিতে অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের ভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়া উঠায় বাদশাহ্ হুমায়ুন, জাহাঙ্গির-কুলি বেগকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া, এবং সেনাপতি এব্রাহিম্‌কে পাঁচ হাজার উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সহ সুবাদারের সহকারিতার রাখিয়া, আগ্রার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সম্রাট অতি কষ্টে বর্ষার ভরাগঙ্গা সসৈন্যে পার হইয়া গেলেন। এই সময় শের আফ্‌গান পুনরায় বঙ্গ সিংহাসন লাভের আশায়, রোটাস্ দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া কর্ম্মনাশা নদীর তীরে চৌসার নামক স্থানে সম্রাট সেনার গতিরোধ করিলেন।

এই স্থানে তিন মাস কাল যাবৎ অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়া, মোগল সেনাগণকে বড়ই বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। জ্বর পীড়ায় তাহাদের মধ্যে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। শেষে শের সাহের গুরু দরবেশ খলিল্ বাদশাহের নিকট আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করায়, সম্রাট অগত্যা সন্ধির প্রস্তাবে বাধ্য হইলেন।

চতুর শের শাহ্ পবিত্র কোর-আন্ স্পর্শে সম্রাটের অধীনস্থ বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া থাকিবেন ও সম্রাটের গমনে বাধা প্রদান করিবেন না স্বীকার করিয়া, সেই রজনীতেই অকস্মাৎ মোগল সৈন্যের উপর আপতিত হইয়া অতর্কিত আক্রমণে সম্রাট সেনাগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন।

সম্রাট হুমায়ুন কতকগুলি অশ্বারোহী সেনা সহ গঙ্গা পার হইতে গিয়া গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছিলেন, এমন সময় একজন জলবাহী ভিস্তি তাহার চর্ম্মমশক বায়ুপূর্ণ করিয়া তৎসাহায্যে অতি কষ্টে সম্রাটকে পার করিয়া দিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিল। হুমায়ুনের প্রায় আট হাজার অশ্বারোহী উৎকৃষ্ট মোগল সৈন্য গঙ্গাগর্ভে প্রাণ হারাইল।

অষ্টম সর্গ

সুর বংশ

ফরিদ্ উদ্দীন আবুল মোজাফ্ফর শের শাহ্

এই স্থানে এই ভারত বিজয়ী মহাযোদ্ধা শের শাহের একটু পূর্ব্ব ইতিহাস দেওয়া আবশ্যক।

বাল্যকালে এই আফগান যোদ্ধার নাম ছিল ফরিদ্। ইঁহার পিতার নাম হোসেন শাহ্ সুর ও পিতামহের নাম এব্রাহিম সুর।

শের শাহ্ ছল-চাতুর্য্যে, পরবর্ত্তী মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা শিবাজীর সম্পূর্ণ-রূপে সমকক্ষ না হইতে পারিলেও, শৌর্য্য বীর্য্যে ও রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যে শিবাজী অপেক্ষা বহু উন্নত ছিলেন, এ কথা সকল ঐতিহাসিককেই স্বীকার করিতে হইবে।

এব্রাহিম সুর, সম্রাট বহলুল্ লোদীর সময়ে আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য উপত্যকা হইতে আসিয়া, দিল্লীতে সম্রাট সৈন্য মধ্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হ'ন। তৎপরে সম্রাটপুত্র সেকেন্দার লোদীর রাজত্ব কালে, আমীর জামাল জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলে, তিনি এব্রাহিম-পুত্র হোসেন শাহ্ সুরকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন ও যুবক হোসেনের গুণগ্রাহী হইয়া শাসনকর্ত্তা জামাল, অল্পদিন মধ্যে তাঁহাকে সসরাম ও টোণ্ডা জেলাদ্বয়ের জায়গীরদার নিযুক্ত করিলেন, এবং রাজকরের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে পাঁচ শত অশ্বারোহী সেনা প্রতিপালন করিবার অনুমতি দিলেন।

এই সময় হোসেনশাহের পুত্র ফরিদ্ শাহ্ সুর পিতার নিকট হইতে জৌনপুরে গিয়া, তথাকার শাসনকর্ত্তা জামালের পল্টনে ভর্ত্তি হইলেন। পিতা বিদ্যাভ্যাসের জন্য ফরিদ্‌কে অনেকবার পত্র লিখিয়া আহ্বান করা সত্ত্বেও ফরিদ্, কোন মতে জৌনপুর ছাড়িয়া আসিতে সম্মত হইলেন না। জৌনপুরে থাকিয়া ফরিদ্ ফার্‌সী ভাষা উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাব্য ও ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল।

চতুর্থ বৎসরে হোসেন স্বয়ং জৌনপুরে আসিয়া তাঁহার এই জ্যেষ্ঠ পুত্র ফরিদ্ সুরের উপর স্বীয় জায়গীরের ভারার্পণ করায়, অগত্যা তিনি জৌনপুর পরিত্যাগ করিয়া সস্‌রামে আসিতে বাধ্য হইলেন ও তথায় সুবিচার ও সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টের দমন দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই সময় কিছু দিনের মধ্যে বিমাতার চক্রান্তে পড়িয়া ফরিদ ও তাঁহার সহোদর নেজাম সুরকে সস্‌রাম পরিত্যাগ করিয়া আগ্রায় যাইতে হইয়াছিল।

আগ্রায় পৌছিয়া ভ্রাতাদ্বয় সম্রাট এব্রাহিম লোদীর এক জন প্রধান ওমরাহ্ দওলৎ খানের নিটক চাকুরীতে ভর্ত্তি হইলেন। ফরিদ সুর স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি ও তৎসঙ্গে তাঁহার দৈহিক ক্ষমতা প্রদর্শন দ্বারা উক্ত ওম্‌-রাহের এতদূর প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন যে—তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর দওলৎ খান সম্রাটকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার পিতৃ জায়গীর ফরিদ সুরকে অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সময়ে মোগল-বীর-শার্দ্দুল বাবর পাণিপথের যুদ্ধে এব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লীর পাঠান সিংহাসন অধিকার করায়, সমস্ত দেশ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল।

ফরিদ বেহারাধিপতি সোলতান মোহাম্মদের নিকট আশ্রয় লইলেন। একদা সোলতানের সহিত মৃগয়ায় বাহির হইয়া ফরিদ একটী বৃহদাকার ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিয়া সোলতান সমক্ষে উক্ত শার্দ্দুলটিকে তরবারির

আঘাতে বধ করায়, তাঁহার এই অসীম সাহসিকতার ও ক্ষিপ্রকারিতার পুরস্কার স্বরূপ সোলতান মোহাম্মদ, ফরিদ শাহ সুরকে "শের খান" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ক্রমে শের খান সোলতানের অধিকতর প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার পুত্র জালালের রক্ষক ও শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে সোলতান মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র জালাল, বেহারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় শের শাহ সুর ঐ অল্পবয়স্ক সোলতানের অভিভাবক নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে যে প্রকারে সমস্ত বেহার প্রদেশ শের শাহের হস্তগত হইল তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

১৫৩৯ খৃঃ, হিজরী ৯৪৬ সালে শের শাহ, সম্রাট, হুমায়ুনকে অন্যায়-যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন, এবং বরাবর গৌড়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। নগর দ্বারে জাহাঙ্গির কুলি বেগ প্রথমতঃ শেরের গতিরোধ করিলেন বটে, কিন্তু শেরের অগণ্য দুর্দ্ধর্ষ আফগান সেনার নিকট জাহাঙ্গিরের সৈন্য অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। শের শাহ সুর অচিরে নগর অধিকার করিলেন এবং পর দিবসই গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক বঙ্গ-বেহারের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

তোহ্‌ফাতে আকবরশাহী লেখক আব্বাস খাঁন উল্লেখ করিয়াছেন যে—তিনি শের সাহের এক জন সহকারী আল্-হায়বৎ খানের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, সম্রাট হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধ জয়ের পর যখন সম্রাটমহিষী অন্যান্য ভদ্র মহিলাগণের সহিত পর্দ্দার বাহিরে আসিলেন, তখন শের শাহের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল; অমনি তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রমণীগণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শনে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। শের, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত সৈন্য মধ্যে প্রচার করিয়া

দিলেন যে—"যদি কেহ কোন মোগল রমণী, এমন কি তাঁহাদের কোন দাসী পর্য্যন্তও বন্দী করিয়া থাক, সত্বর তাহাদিগকে সম্মানের সহিত আনিয়া সম্রাজ্ঞীর নিকট পৌঁছাইয়া দাও।"

এইরূপে কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি সমস্ত মোগল রমণীগণকে, তাহাদের দাসীগণ সমভিব্যাহারে আগ্রায় পাঠাইয়া দিয়া, স্বীয় মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

অতঃপর শের সাহের এই বিজয় বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল। এই সময় লাহোরের শাসনকর্ত্তা আলি-ইসা খান খানে আজম; আজম্ হুমায়ুন সরওয়াণী, বাবিন লোদী, প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাঠান সর্দ্দারগণ একত্রে শের শাহকে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইতে এবং মোগলগণকে ভারত হইতে বহিস্কৃত করিয়া সিন্ধু পারে তাড়াইয়া দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

শেষে সমস্ত পাঠান সর্দ্দার গণকে একত্রিত করিয়া শের শাহ স্থর, স্বীয় জন্ম তিথিতে ও তাঁহার ঠিক ভূমিষ্ঠ হইবার লগ্নে সিংহাসনারূঢ় হইয়া মস্তকে রাজ ছত্র ধারণ করিলেন; এবং "শাহ্ আলম্ শেরশাহ্" নাম ধারণ পূর্ব্বক নিজ নামে খেৎবা পড়িতে ও মুদ্রা চালাইতে অনুমতি দিলেন। তৎপরে সাত দিবস ধরিয়া রাজধানীতে সমস্ত পাঠানদিগের মধ্যে আমোদ আহ্লাদ ও নৃত্য গীত চলিতে লাগিল।

শের শাহ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে কাল্পি ও কনোজ দেশ অধিকার করিলেন। এই সময় তিনি সেনাপতি ইসা খানকে গুজরাট জয় করিবার জন্য ও স্বীয় পুত্র কোতব খানকে দিল্লী এবং আগ্রার দিকে গোলযোগ বাধাইয়া দিবার মানসে চান্দেরীর দিকে প্রেরণ করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট হুমায়ুন তাঁহার দুই ভ্রাতা, মির্জ্জা হিন্দোল ও

মির্জ্জা আস্‌কারিকে কোতবের দমনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শের শাহ মনে করিয়াছিলেন, তাহার পুত্র কোতব খান চান্দেরীর দিকে গেলে মালবের শাসনকর্ত্তা নিশ্চয় শেরের নাম শুনিয়া কোতবকে সাহায্য করিবেন। কিন্তু মালবরাজ সম্রাট ভ্রাতাদ্বয়ের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে পাঠানগণের কোনই সাহায্য করিলেন না। সম্রাট ভ্রাতৃদ্বয় শেরশাহ পুত্রকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া হুমায়ুন সকাশে উপস্থিত হইলেন। এই যুদ্ধে কোতব নিহত হইল।

শেরশাহ, পুত্রের মৃত্যু ও তৎসঙ্গে মান্দু (মালওয়া) রাজা তাঁহাকে কোন সাহায্য করেন নাই অবগত হইয়া, একদিকে যেমন আন্তরিক শোক পাইলেন, অপর পক্ষে মালবরাজের উপর তেমনি রাগান্বিত হইলেন। এদিকে মোগল সৈন্যগণ এই বিজয়ে উল্লাসিত হইয়া, তাহাদের দল বৃদ্ধি করিতে লাগিল। হুমায়ুন এই বিশাল মোগল বাহিনী লইয়া হিঃ ৯৪৬ সালের জিল্‌-কদ ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে কনোজে আগমন করিলেন। গঙ্গার অপর তীরে শেরশাহও তাঁহার সৈন্য সমাবেশ করিয়া অবস্থান করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে খাওয়াস্‌ খান সসৈন্যে শের শাহের সাহায্যে আসিতেছেন অবগত হইয়া, শের তাচ্ছিল্য ভাবে সম্রাট সমীপে দূত হস্তে এই মর্ম্মে পত্র প্রেরণ করিলেন যে—

"আমি গঙ্গা তীরে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আপনি ইচ্ছা করিলে গঙ্গা পার হইয়া আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন; বা আপনার অভিমত অবগত হইতে পারিলে; আমি নদী পার হইয়া যাইয়া আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছি। আপনার অভিরুচি জ্ঞাপন করিবেন।"

সম্রাট পত্র প্রাপ্তে শেরর দূত প্রমুখাৎ প্রতি-উত্তর দিলেন যে—"শের

খানকে বলিও, তিনি গঙ্গা তীর হইতে কয়েক ক্রোশ হাটিয়া গেলে, আমিই গঙ্গা পার হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

শেরশাহ দূত মুখে এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সৈন্য লইয়া কয়েক ক্রোশ সরিয়া গেলেন। ইত্যবসরে সম্রাট নৈসেতু প্রস্তুত করিয়া গঙ্গা পার হইতে লাগিলেন। এই সময় শেরের জনৈক সৈন্যনাধ্যক্ষ, সমস্ত মোগল সেনার গঙ্গা পার হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য শের শাহকে বিস্তর অনুরোধ করায় প্রকৃত বীরসিংহ শেরশাহ উত্তর দিয়াছিলেন—

"সর্ব্ব শক্তিমানের কৃপায় সম্রাট সৈন্যাপেক্ষা আমার সেনা বল কোন অংশে কম নহে। আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আর তঞ্চকতার আশ্রয় লইব না।"

তৎপরে শেরশাহ গড় খাত খনন দ্বারা নিজের সেনার অবস্থিতি সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন। এমন সময় খাওয়াস্ খান আসিয়া পৌছিল। সেই দিনই শের, সম্রাটের রসদ আনয়নকারী সৈন্য-গণকে আক্রমণ করিয়া খাদ্য দ্রব্য সহ প্রায় তিন শত উষ্ট্র ও বহু সংখ্যক ভারবাহী বলদ স্বীয় শিবিরে তাড়াইয়া আনিতে কৃতকার্য্য হইলেন।

হিজরী ৯৪৭ সালের ১০ই মোহাররম তারিখে উভয় পক্ষে প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শেরশাহ তাঁহার প্রকাণ্ড বাহিনীকে এইরূপে সাজাইয়া ছিলেন :—

তাঁহার সৈন্যের মধ্যস্থলের পরিচালন ভার শের নিজ হস্তে লইলেন। এই স্থানে হায়বৎ খান, মসনদ আলি, ইসা খান, কোতব খান লোদী, হাজী খান, বোলন্দ খান, সরমৎ খান, সায়ের খান এবং বিজ্‌লী খান প্রভৃতি মহারথীগণ তাঁহার সহকারী থাকিলেন। সৈন্যের দক্ষিণাংশ তাঁহার পুত্র জেলাল খান; তাজ খান, সোলায়মান খান কৈররাণী ও জালাল খান জালোঈ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন।

বাম পার্শ্বে শের শাহের অপর পুত্র আদেল খান; কোতব খান ও হোসায়েন জাল্‌ওয়ানী প্রভৃতিকে লইয়া রহিলেন।

যুদ্ধারম্ভে পাঠান গণের দক্ষিণ বাহু, মোগল সৈন্যগণ ভগ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তথাপি জেলাল খান স্বয়ং ও তাঁহার অধীনস্থ আরও তিন জন যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দেন নাই। এই অবস্থা দর্শনে শেরশাহ পুত্রের সাহায্যার্থে স্বয়ং তথায় আসিবার উপক্রম করিতে ছিলেন, এমন সময় কোতব খান লোদী তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহার নিজ স্থানে থাকিতে বলিলেন ও বুঝাইয়া দিলেন যে—তিনি তাঁহার স্বস্থান পরিত্যাগ করিলে তাঁহার সমস্ত সেনাগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িবে।

তৎপরে শেরের অধীনস্থ পাঠানগণ, বীর হুঙ্কারে মোগল সেনাগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। এই যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুন অচল অটল পর্ব্বতের ন্যায় রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাঁহার সেনাগণকে উৎসাহিত ও স্বয়ং বর্ণনাতীত সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শেষে পাঠান হস্তে তাঁহার পরাভব খোদাতাআলার নির্দ্দেশ সাব্যস্ত করিয়া, আগ্রার দিকে অশ্বের মুখ ফিরাইয়া দিলেন। (তওয়ারিখে শেরশাহী।)

কনোজের এই যুদ্ধাবসানে ভারতের সিংহাসন মোগলের হস্ত হইতে আবার পাঠানের হস্তে গেল।

১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শেরশাহ আবার গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালা ও বেহার প্রদেশকে কয়েকটী খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এবং সেই সময়ের অদ্বিতীয় বিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ ও পরম ধার্ম্মিক কাজী ফজিলতকে এই সমস্ত বিভাগ গুলির শাসনকর্ত্তাগণের কার্য্য প্রণালী

পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ও তদ্বিষয়ে সম্রাটের নিকট সংবাদ দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া, ৯৪৮ হিজরীর শেষ ভাগে আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শের শাহ্ তাঁহার স্বল্প রাজত্বকালের মধ্যে ভারতে অনেক সুকীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার সুবর্ণ গ্রাম (ঢাকার নিকট) হইতে পাঞ্জাবের সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত তিনি যে প্রায় আড়াই সহস্র মাইল লম্বা প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্যাবধি গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই সুদীর্ঘ পথের পার্শ্বে আবশ্যকমত স্থানে স্থানে বহু পান্থনিবাস এবং প্রত্যেক তিন মাইল অন্তরে কূপ খনন করিয়া তিনি প্রজাগণের যৎপরোনাস্তি হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই প্রকাণ্ড রাজপথের পার্শ্বে বহু স্থানে খোদা-তাআলার উপাসনার জন্য মস্‌জিদ স্থাপন করিয়া তাহাতে রাজব্যয়ে ধর্ম্মোপাসক এমাম নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত ঐ সকল পান্থনিবাসে ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকল অতিথিকেই সরকারি ব্যয়ে আহার্য্য দেওয়া হইত।

শেরশাহ্ ডাকে চিঠি পত্র গমনাগমনের সুবিধার জন্য ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেন। তাঁহার রাজত্বকালে সওদাগরগণ নির্ভয়ে ও নির্ব্বিঘ্নে এক স্থান হইতে অপর স্থানে মালামাল লইয়া যাইতে পারিত, এবং পথিমধ্যে রাজকীয় পান্থশালায় উহা নিঃসঙ্কোচে রক্ষা করিতে পারিত।

১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে ৯৫২ হিজরীর ১২ রবিওল্-আউয়ল্ তারিখে কালিঞ্জর দুর্গে শের শাহ্ সুরের মৃত্যু হয়। মৃত দেহ তথা হইতে সস্‌রামে আনিয়া তাঁহার পূর্ব্বাদেশ মতে তাঁহার স্বইচ্ছায় নির্ম্মিত চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টিত অতীব সুদৃশ্য সমাধি মধ্যে সমাধিস্থ করা হয়।

শের শাহ মাত্র পাঁচ বৎসর কাল ভারত-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন; তৎপূর্ব্বে পঞ্চদশ বৎসর তিনি নিয়ত যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

শের শাহের দ্বিতীয় পুত্র সেলিম শাহ সুর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কাজী ফজিলতকে সরাইয়া দিয়া তাঁহার স্থানে স্বীয় আত্মীয় মোহাম্মদ খান সুরকে বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। মোহাম্মদ খান, সম্রাট সেলিম শাহের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়া বঙ্গে সুশাসন করিতেছিলেন। ৯৬০ হিঃ ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ আদেল শাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করায়, মোহাম্মদ শাহ সুর, শামস্‌ উদ্দীন আবুল মোজাফ্‌ফর মোহাম্মদ শাহ নাম ধারণে, স্বাধীন বঙ্গেশ্বর বলিয়া ঘোষিত হইলেন ও স্বনামে মুদ্রা চালাইতে লাগিলেন।

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর মোহাম্মদ শাহ সুর জৌনপুর অঞ্চলের কিয়দংশ হস্তগত করেন। তৎপরে হিজরী ৯৬২ সালে তিনি বহু সংখ্যক বাঙ্গালী সেনা লইয়া ছাপরা ঘাট নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, তথায় সম্রাট আদেল শাহের প্রধান অমাত্য হিমুর সহিত যুদ্ধে নিহত হ'ন। এই যুদ্ধে বঙ্গেশ্বরের প্রায় সমস্ত সেনাই নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যে কয়জন আফ্‌গান ওমরাহ পলায়ন করিতে পারিয়া ছিলেন, তাঁহারা আধুনিক এলাহাবাদ দুর্গের নিকট জোসী নামক স্থানে আসিয়া নিহত মোহাম্মদ খানের পুত্র খেজের খানকে, বাহাদুর শাহ্‌ উপাধি দিয়া সিংহাসনারূঢ় করিলেন।

বাহাদুর শাহ্‌

বাহাদুর শাহ্‌ গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে—তাঁহার পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া সাহ্‌বাজ খান নামক এক ব্যক্তি দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকারে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া আছেন। ন্যায় বিচারক মোহাম্মদ খানের পুত্রের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া, বঙ্গীয় সেনাগণের অধিকাংশই সাহ্‌বাজকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহাদুরের পতাকাধীনে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সাহ্‌বাজ বন্দি ও নিহত হইলেন।

তৎপরে বাহাদুর শাহ্ স্বীয় সৈন্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ও ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মোহাম্মদ আদেল শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী সুরজগড়ে যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, তাহাতে দিল্লীশ্বর আদেল শাহের সেনাগণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। গৌড়েশ্বরের বিজয়ী সেনাগণ সম্রাটের অনেক যুদ্ধাস্ত্র ও কতকগুলি কামান লইয়া বিজয় গর্ব্বে বঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর বাহাদুর স্বাধীন রাজা হইয়া গৌড়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ছয় বৎসর রাজত্বের পর হিঃ ৯৬৮ সালে গৌড় নগরে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়।

অপুত্রক অবস্থায় বাহাদুর শাহের মৃত্যু হওয়ায়, তদীয় ভ্রাতা জেলাল উদ্দীন গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিলেন। কিন্তু তিন বৎসর মধ্যেই তিনি পরলোকগত হওয়ায় হিঃ ৯৭১ সালে তাঁহার পুত্র রাজা হইয়াছিলেন; আবার গেয়াসউদ্দীন তাঁহাকে বধ করিয়া মাত্র একাদশ মাস কাল গৌড়ের রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে কেব্‌রাণ বংশীয় তাজ-খান তাঁহার বিনাশ সাধন করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন।

কেব্‌রাণী বংশ

এই কেব্‌রাণী বংশীয়গণ, সম্রাট শের শাহ সুর ও তাঁহার পুত্র সেলিম শাহের সময়ে ভোজপুর এবং খাওয়াসপুর টাঁড়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিকারী ছিলেন। তাজ খান কেব্‌রাণী সম্বল দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; কিন্তু সম্রাট আদেল শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, সম্রাট ও মন্ত্রী উভয়ের কুদৃষ্টিতে পড়িয়া, নিজ রাজধানী হারাইয়া তাঁহাকে তাঁহার জন্মস্থান ভোজপুরের দিকে আসিতে হইল।

সেই সময় প্রসিদ্ধ হিমূ বাক্কাল আদেল শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন,

ক্রমে চুনারের নিকট হিমুর সহিত তাঁহার সংঘর্ষণ ঘটিল। তাজ পরাজিত হইলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রবল শত্রু দ্বারা দিল্লী আক্রমণের সংবাদ পাইয়া হিমু তাজ খানের অনুসরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

তাজ খানের দ্বিতীয় ভ্রাতা সোলেমান কেরুরাণী, সম্রাট সেলিম শাহের সময় বেহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

হিঃ ৯৭২ সালে তাজ খানের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা সোলেমান কেরুরাণী গৌড়ে আসিলেন; কিন্তু গৌড়ের সিংহাসনে কোন রাজাই অধিক দিন বসিতে পারেন নাই, এবং ঐ সিংহাসন অধিকার করিলে রাজাদিগের পরমায়ু অল্প হয় বিবেচনায়, সোলেমান গৌড় হইতে টাঁড়া বা টাণ্ডা নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময় মহানুভব সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসন আলোকিত করিতেছিলেন। সোলতান সোলেমান মসনদে বসিয়া সম্রাট দরবারে বিস্তর উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন।

সোল্‌তান সোলেমান কেরুরাণী

সোল্‌তান সোলেমান বঙ্গ-বিহারের পূর্ণাধিকার পাইয়া, অনেক সৈন্যসহ সুদৃঢ় রোটাস্ দুর্গ আক্রমণ করিলেন ও কয়েক মাসাবধি ঐ দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন।

এই সময়ে সম্রাট আকবর জোনপুরে আগমন করিয়াছেন অবগত হইয়া রোটাস্ দুর্গাধিপ ফতেহ্-খান, দূত প্রেরণে সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাদশাহ আকবরও এইরূপ সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একদল উৎকৃষ্ট মোগল সেনা দুর্গাধ্যক্ষের সাহায্যে পাঠাইয়া দিলেন।

সোলেমান কেব্‌রাণী বাদশাহ্‌ সেনার আগমনবার্ত্তা পাইয়া দুর্গ পরিত্যাগে বাঙ্গালায় চলিয়া আসিলেন।

এই উপলক্ষে সম্রাট উড়িষ্যা দেশের রাজাকে, তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার জন্য দূত হোসেন খানের দ্বারা আদেশ প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ আরও বলিয়া পাঠাইলেন যে—যদ্যাপি সোলেমান কেব্‌রাণী তাঁহার কোন বিপক্ষতাচরণ করে, রাজা তৎক্ষণাৎ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবেন ও এই বিষয়ে দিল্লীশ্বর সর্ব্বতোভাবে উৎকল রাজের সাহায্য করিবেন। চারিমাস পরে উড়িষ্যারাজ বহু হস্তী ও মূল্যবান উপহার সহ সম্রাট দূত হোসেন খান্‌কে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে জগন্নাথ (পুরী) উৎকল দেশের রাজধানী ছিল।

১৫৬৭।৬৮ অব্দে সম্রাট আকবর পাঞ্জাব লইয়া বড়ই বিব্রত, হইয়া থাকায়, সোলেমান কেব্‌রাণী এই অবসরে উড়িষ্যা আক্রমণ করিলেন ও স্বল্পায়াসে উৎকল রাজ্য অধিকার করিলেন। পরে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা ভূমে সমস্ত সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তথায় একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি রাখিয়া রাজধানী টাঁড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পর বৎসর সোলতান, কোচ-বেহার আক্রমণ করেন; কিন্তু উড়িষ্যা খণ্ডের লোক বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার শাসনকর্ত্তাকে তাড়াইয়া দিয়াছে সংবাদ পাইয়া সোলেমান, স্বীয় রাজধানী টাঁড়ায় ফিরিয়া আসিলেন ও একদল সৈন্য প্রেরণে উড়িষ্যা পুনঃ দখল করিলেন।

সোল্‌তান সোলেমান কেব্‌রাণী বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা হইলেও, কখনও স্বাধীন সম্রাটের কোন চিহ্ন বা কখনও মস্তকে রাজছত্র ধারণ করেন নাই। মধ্যে মধ্যে তিনি দিল্লীর দরবারে, অনেক উপঢৌকনও পাঠাইয়া দিতেন।

অবশেষে প্রজাপালনে অতীব শান্তির সহিত রাজত্ব করিয়া শেষে

প্রজাবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া বঙ্গেশ্বর সোলায়মান হিঃ ৯৮১ খৃঃ ১৫৭৩ সালে স্বীয় রাজধানী টাঁড়ায় ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

উড়িষ্যা পুনঃ বিজয়ের জন্য বঙ্গেশ্বর তাঁহার জনৈক সেনানী কালাপাহাড়কে উৎকলরাজ মুকুন্দ দেবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই কালাপাহাড় পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন ও সেই সময় তাঁহার নাম কালাচাঁদ ছিল। মোস্‌লেম ধর্ম্ম গ্রহণের পর, ইনি একজন ভয়ানক হিন্দু বিগ্রহদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। উড়িষ্যা জয়ের পর কালাপাহাড় বিস্তর দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন।

সোলতান সোলেমান কেব্‌রাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজিদ, নামে মাত্র কয়েক মাস পিতৃ সিংহান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দায়ুদ, আবল-মোজাফ্‌ফর নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইয়া সম্রাট আক্‌বরের বশ্যতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া, বঙ্গ-বিহারে নিজ নামে খোত্‌বা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলিত করিলেন।

সোলতান আবল-মোজাফ্‌ফর দায়ুদ শাহ্‌ কেব্‌রাণী

দায়ুদ শাহ্‌, বঙ্গের রাজস্ব ভাণ্ডারে রাশিকৃত অর্থ, এবং তাঁহার অধীনে ৪০,০০০ সহস্র অশ্বারোহী, ১,৪০,০০০ পদাতিক, বিংশতি সহস্র সর্ব্বপ্রকারের কামান, ৩,৬০০ হস্তী ও কয়েক শত রণতরী প্রস্তুত দেখিয়া, দিল্লীশ্বরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া মোগলগণকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহার প্রবল বাসনা হইল।

দায়ুদ প্রথমতঃই দিল্লীশ্বরের সেনাপতি খান জমানের নির্ম্মিত, গাজীপুরের পশ্চিমে তাঁহারই নামে অভিহিত জামানিয়া-দুর্গ অধিকার করিলেন।

দিল্লীশ্বর আক্‌বর এই সময় সৌরাষ্ট্রে (গুজরাট) বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত ছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সম্রাট তাঁহার প্রধান সেনাপতি,

তৎকালীন জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা মোন্‌য়েম খানের প্রতি বেহার আক্রমণের আদেশ প্রেরণ করিলেন। দায়ুদ এই সময় হাজীপুরে ছিলেন, এবং তাঁহার সেনাপতি লোদী খান, রোটাস্ দুর্গে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন।

হঠাৎ খান-খানান মোন্‌য়েম্ খানের অধীনে বহুসংখ্যক মোগল-সৈন্য, পাটনা ও হাজীপুর অঞ্চল আক্রমণ করায়, লোদী খানের সহিত সম্রাট-সেনাপতির কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধের ফলাফল দায়ুদের পক্ষে তত দূর সুবিধাজনক না হওয়ায় দায়ুদ শাহ্, কত্‌লু খান ও জনৈক বাঙ্গালী সর্দ্দার শ্রীধরের পরামর্শে লোদী খানের উপর সন্দিহান হইয়া উহাদের সাহায্যে তাঁহাকে বন্দী ও অন্যায় মতে নিহত করিলেন। তৎপরে খান-খানানের নিকট এই মর্ম্মে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন যে—

"মোগল সৈন্য বেহার পরিত্যাগ করিয়া গেলে বঙ্গেশ্বর, দিল্লীর রাজ-কোষে নগদ দুই লক্ষ টাকা ও লক্ষ টাকার মূল্যবান দ্রব্য ও রেশমী বস্ত্র এবং মস্‌লিন্ প্রভৃতি উপঢৌকন পাঠাইয়া দিবেন।"

খান খানান মোন্‌য়েম্ খান, দায়ুদ শাহ্ কেয়ুরাণীর পিতার সহিত বাল্য-সৌহার্দ্দ স্মরণ করিয়া এই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু যখন তিনি সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বে, দায়ুদ কর্ত্তৃক নৃশংসভাবে সেনাপতি লোদী খানের হত্যার বিষয় সংবাদ পাইলেন; তখন এই অবিবেচক রাজার নির্দ্দয় আচরণে ক্রোধান্বিত হইয়া, সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সসৈন্যে পাটনায় আগমণ করিলেন।

তখন দায়ুদ অনন্যোপায় হইয়া মোগলগণকে বাধা প্রদান করিবার জন্য সোন ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার যুদ্ধে মোগলগণ জয়লাভ করায়, দায়ুদ দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন, এবং মোগলেরা দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। ইতিমধ্যে দিল্লীশ্বর স্বয়ং হিঃ ৯৮২ সালের

১৬ই রবিয়স্‌সানি তারিখে বহু সেনা ও সামরিক তরী লইয়া আগ্রা হইতে পাটনার নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। পরদিন সম্রাট পাঁচ পাহাড়ি হইতে দুর্গাভ্যন্তরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেনাগণকে দুর্গ আক্রমণের আদেশ দিলেন।

এই সময় সম্রাট দেখিতে পাইলেন যে—গঙ্গার পরপার হাজীপুর হইতে দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ পাঠান সেনাগণের রসদ আনীত হইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ খান আলমের অধীনে ৩,০০০ সহস্র সেনা দিয়া এবং বেহারের জনৈক রাজা গজপতি রায়ের প্রতি খান আলম্‌কে সাহায্য করিবার আদেশ দিয়া, হাজীপুর আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। গজপতি রায় এই সময় সসৈন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্রাটের স্মরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেছিলেন।

মোগল সেনাগণ সৈনাধ্যক্ষ খান আলমের অধীনে মহাবিক্রমে হাজীপুর দুর্গ আক্রমণ করিল। সম্রাট এই সময় গঙ্গার অপর পারে শাহাম খানের অধীনস্থ তোপ-খানার নিকট দাঁড়াইয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে যুদ্ধের অবস্থা দেখিতেছিলেন। তিনি অবস্থা বুঝিয়া তিনখানি বৃহৎ সামরিক তরী সেনা পরিপূর্ণ করিয়া, তাঁহার পূর্ব্ব প্রেরিত মোগল সৈন্যগণের সাহায্যার্থে পাঠাইয়া দিলেন। শত্রুপক্ষও এই তরণী কয়খানির গতিরোধার্থে অনেকগুলি সশস্ত্র যোদ্ধাপূর্ণ নৌকা প্রেরণ করিল। কিন্তু সম্রাটের রণতরণীগুলি বিপক্ষের নৌকাগুলিকে যুদ্ধে হটাইয়া দিয়া, খান-আলমের সেনাদলে গিয়া মিলিত হইল।

হাজীপুরের যুদ্ধে মোগল সেনার সম্পূর্ণ জয় হইল। অচিরে হাজীপুর-দুর্গ তাহাদের হস্তগত হওয়ায়, সেনাপতি খান-আলম দুর্গাধিপ ফাতেহ্‌ খানের ছিন্নমস্তক ও তৎসঙ্গে বহু পাঠান সেনার ছিন্নমুণ্ড নৌকাযোগে সম্রাট সমীপে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট আক্‌বর আল্লাহ্‌ তাআলাকে

আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া ঐ ছিন্নমুণ্ডগুলি আবার দায়ূদ খানের নিকট পাঠাইলেন। দায়ূদ খান এই অবস্থায় তাঁহার অধীনস্থ বিশ্বস্ত সেনাপতি ফাতেহ্ খান ও পাঠান সেনাগণের ছিন্নমস্তক দর্শনে ভীত হইয়া পলায়নের পথ আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রি দুই প্রহরের সময় দ্রুতগামী নৌকাযোগে গৌড়াধিপতি দায়ূদ খান, পাটনা পরিত্যাগে বঙ্গদেশে পলায়ন করিলেন। শ্রীধর রায়, যাহাকে দায়ূদ সেই সময় রাজা বিক্রমাদিত্য পদে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তিনিও দায়ূদ খানের সহগামী হইলেন। (খোয়াজা নেজাম-উদ্দীন আহ্মদ প্রণীত তবকত-ই-আকবর শাহী)

দুর্গ মধ্যস্থ বিংশতি সহস্র পাঠান যোদ্ধা তাঁহাদের রাজা ও অধ্যক্ষ দায়ূদ খাঁনের এবম্বিধ আচরণ দেখিয়া, বিশৃঙ্খল ভাবে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। দায়ূদের মন্ত্রী গোজার খান এই সময় বিস্তর হস্তী লইয়া পলাইতে থাকা কালে, পুন্‌পুন্ নদীর সেতুর উপর গেলে, সেতু ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাতে অনেক লোক নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল।

সেই রাত্রেই বঙ্গাধিপতির গোপনে পলায়ন বার্ত্তা শ্রবণে, বাদশাহ আকবর খোদাতালাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া, মহাসেনাধ্যক্ষ খান খানান মোন্‌য়েম খানকে নগরে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন। খান খানান বঙ্গেশ্বর পরিত্যক্ত ৫৬টী হস্তী অচিরে সম্রাট সমীপে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই পাটনা জয়ই মোগলগণের বঙ্গ বিজয় হইয়া গেল।

বাদশাহ আকবর সূর্য্যোদয়ের পর চারি ঘণ্টা কাল পাটনায় অবস্থান করিয়া, এবং বিদ্রোহী প্রজাবর্গকে তিনি যে ক্ষমা করিলেন এই অভিমত প্রচার করিয়া ও তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিয়া; এবং তৎসঙ্গে সেনাপতি খান খানানের হস্তে বিজিত প্রদেশের ও

মোগল সেনাগণের ভারার্পণ করিয়া, স্বয়ং কতকগুলি সেনা সহ বঙ্গেশ্বরের অমাত্য ও সেনাপতি গোজার খানের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

সম্রাট অশ্বসহ পুনপুন্ নদী সন্তরণ করিয়া পার হইয়া যাওয়ায়, তাঁহার সমভিব্যাহারী সেনানী ও সেনাগণ সকলেই এই মহান বাদশাহের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ পূর্ব্বক নদী পার হইয়া, পূর্ণবেগে বিপক্ষ দমনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পাটনা হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী গঙ্গাতীরে দরিয়াপুর নামক স্থানে তাঁহারা গোজার খাঁনের সাক্ষাৎ পাইলেন ও তথায় তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া প্রায় চারি শত রণহস্তী হস্তগত করিলেন।

তৎপরে দরিয়াপুরে ছয় দিবস অবস্থান করিয়া ভারতেশ্বর, পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও খান খানানের তন্‌খা শতকরা ত্রিশ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া এবং তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য সমষ্টির উপর, রাজা টোডরমল্লের অধীনে আরও বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সেনা দিয়া, রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সমস্ত ঘটনা দিল্লীশ্বরের উনবিংশতি বর্ষ রাজত্বকালে ঘটিয়াছিল।

এদিকে দায়ূদ খান তেলিয়াগড়িতে পৌছিয়া উক্ত গিরিপথ রক্ষার্থে তথাকার সেনাপতিকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া, রাজধানী টাঁড়ায় গমন করিলেন।

মোন্‌য়েম খান, গোরখ্‌পুরের রাজা সংগ্রাম ও গিধোড়ের রাজা পুরণ মলের সাহায্যে গঙ্গাতীরবর্ত্তী সূর্য্যগড়, মুঙ্গের ও ভাগলপুর অধিকার করিয়া, তেলিয়াগড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পাঠান সেনাগণ সম্রাট সৈন্যের আগমনবার্ত্তা পাইয়া, হাজীপুরের সেনাগণের দুর্দ্দশা স্মরণে বিনাযুদ্ধে ঘাঁটি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। মোগলেরা একজন সেনাক্ষয় না করিয়াও বঙ্গ প্রবেশের এই দ্বার অধিকার করিলেন।

এই সংবাদে বঙ্গেশ্বর দায়ুদ এককালীন হতাশ হইয়া, তাঁহার সমুদয় মূল্যবান দ্রব্য হস্তী পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া উড়িষ্যাভিমুখে সরিয়া পড়িলেন। খান খানান মোন্‌য়েম্ খান ১৫৭৪ খৃঃ ৯৮২ হিজরীর ৪ঠা জমাদি-য়স্-সানি বঙ্গদেশের রাজধানী টাঁড়া নগর বিনা বাধায় অধিকার করিলেন।

দায়ুদ খান তাঁহার দুই বিশ্বস্ত বন্ধু শ্রীহরি ও জানকী বল্লভকে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উপাধি দিয়া ও তাহাদিগকে বিস্তর ধন-রত্ন দান করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে গিয়া বাস করিতে উপদেশ দিলেন।

নবম সর্গ

খান খানান মোনুয়েম্ খান

কয়েক দিবস রাজধানী টাঁড়ায় অবস্থান করিবার পর মহাসেনাপতি খান খানান, তাঁহার অধীনস্থ সেনাধ্যক্ষ রাজা টোডরমল্লকে বহু সৈন্য সহ পলাতক রাজা দায়ুদের অনুসরণ করিতে পাঠাইয়া দিলেন; এবং তৎসহ অপর একজন সেনাপতি মজনুন খানকে ঘোড়াঘাটের পাঠান শাসনকর্ত্তা সোলেমানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই ঘোড়াঘাট দিনাজপুরের ৪৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল।

মজনুন খান তাঁহার উপর ভারার্পিত কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। পাঠানেরা তাহাদের দেশ ও সম্পত্তি এবং স্ত্রীপুত্রগণের রক্ষার্থে, ভীষণভাবে যুদ্ধ করিয়া বহুতর মোগল সেনা নাশ করিয়া অবশেষে প্রায় সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। মজনুন খান তৎপরে স্বীয় পুত্র জব্বারের সহিত, ঘোড়াঘাটের শাসনকর্ত্তা সোলেমানের পরম রূপবতী কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

রাজা টোড়রমল্ল, কয়েক জন আমীর ও বহু সেনাসহ দায়ুদ খানের অনুসরণে উড়িষ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ মান্দারণের নিকট উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে—দায়ূদ ঋণ্‌কেশরীতে অবস্থান করিয়া আপন বিক্ষিপ্ত সেনাদলকে একত্রিভূত করিতেছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ খান খানানের নিকট লোক প্রেরণে আরও অধিক সেনা চাহিয়া পাঠাইলেন।

মোনয়েম্ খান রাজার সাহায্যার্থে মোহাম্মদ কুলি খানের অধীনে আরও মোগল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় রাজা টোডরমল্ল শুনিতে পাইলেন যে, বঙ্গেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র বীরবর জোনেদ খান বহু সংখ্যক সেনা সহ পিতৃব্য দায়ুদের সহিত মিলিত হইতে আসিতেছেন।

রাজা তৎক্ষণাৎ সেনাপতি আবুল কাসেম ও নজর খান বাহাদুরের অধীনে দুই দল সেনা জোনেদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মহারথী জোনেদ অল্প আয়াসে ঐ মোগল সেনাগণকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন; এবং বহু মোগল সেনা পাঠানের তরবারি-নিম্নে প্রাণ হারাইল।

রাজা টোডরমল্ল তখন তাঁহার স্বাভাবিক কুসংস্কার ও সন্দিগ্ধ চিত্তের বশবর্ত্তী হইয়া আর অগ্রসর না হইয়া, শাসনকর্ত্তার নিকট এই সমস্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া দূত পাঠাইয়া দিলেন; এবং স্বয়ং মেদিনীপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থানে বিখ্যাত সেনাপতি মোহাম্মদ কুলি খান বিরলাসের জ্বর রোগে মৃত্যু হওয়ায় রাজা, ওম্‌রাহগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পুনরায় মেদিনীপুর হইতে মান্দারণে সরিয়া আসিলেন। এদিকে খান খানান রাজার সাহায্যার্থে শাহাম্ খান জালায়েরের অধীনে সেনা প্রেরণ করিয়া পরে, স্বয়ং বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজা টোডরমল্লের সহিত যোগ দিবার জন্য রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

অচিরে উভয় সৈন্য মিলিত হইয়া, তথা হইতে সমস্ত সম্রাট সেনা একযোগে পাঠান দমনে বহির্গত হইল। কটকের নিকটবর্ত্তী স্থান মোগল-পাঠানের রণভূমে পরিণত হইল।

৯৮২ হিজরীর ২০শে জেলকদ তারিখে উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইল। পাঠানেরা পূর্ব্ব হইতে তাহাদের শিবির সম্মুখস্থ স্থানে গড়খাত খনন দ্বারা তাহাদের অবস্থান সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিল। উভয় পক্ষের সেনাদল সংখ্যায় প্রায় সমানই ছিল। একদিকে যেমন পাঠানদিগের বহু

রণহস্তী, অপর দিকে মোগল্‌গণের নিকট সেইরূপ নূতন পদ্ধতির যুদ্ধাস্ত্র ও বহু সংখ্যক কামান ছিল।

প্রথমতঃ খান খানান গোলন্দাজ সেনাগণকে শত্রুগণের উপর কামানের গোলা বর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন; যাহার ফলে বিপক্ষের রণ হস্তীযুথ এই অগ্নিবৃষ্টি অসহ্য বোধে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মোগল বন্দুকের গুলিতে প্রথমেই বিস্তর পাঠান ধরাশায়ী হইল।

এই সময় মহাবীর গোজার খানের অধীনে, তাঁহার স্বকীয় পরিশ্রমে সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য, বীর হুঙ্কারে মোগলগণকে আক্রমণ করিয়া, প্রথমেই সম্রাট সেনাপতি খান আলম্‌কে ধরাশায়ী করিল। সুযোগ্য সেনাপতির নিধন প্রাপ্তি দর্শনে, বহু সংখ্যক মোগল সৈন্য রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল। সেই সময় বিচক্ষণ রণ-কৌশলী খান খানান, পলায়িত মোগলগণকে অতি কষ্টে রণস্থলে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে গোজার খান, মহা সেনাপতি খান্ খানানের দর্শন পাইয়া, ভীমবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। উভয়ে দ্বৈরথ-যুদ্ধ বাধিয়া গেল। মোগল সেনাপতি, গোজার খান কর্ত্তৃক আহত হইলেন। এই অবস্থায় মোন্‌য়েম্ খানের অশ্ব ভীত হইয়া বাহককে লইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। মোন্‌য়েম বহু চেষ্টা করিয়াও অশ্বের গতিরোধ করিতে পারিলেন্ না। পাঠানবীর গোজার খান, সসৈন্যে মহাসেনাপতির প্রতি অশ্ব প্রধাবিত করিলেন, এবং প্রায় তিন মাইল পথ তাঁহাকে তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। এমন সময় মোগল সেনানী কায়া খানের দল পশ্চাৎদিক হইতে, প্রধাবিত পাঠানগণকে আক্রমণ করিয়া ও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া, বন্দুকের গুলিতে প্রায় ঐ সামান্য সেনা দলকে শেষ করিয়া ফেলিল। শেষে মোগল সেনার বিক্ষিপ্ত শরে বীর শার্দ্দুল গোজার খান প্রাণ হারাইলেন।

এই সময় রাজা টোডরমল্ল ও লস্কর খান প্রভৃতি, পাঠান সেনাগণকে আক্রমণ করিয়া ও তাহাদের সৈন্যব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বিস্তর পাঠান সেনা ধ্বংস করিয়াছিলেন। অপর সেনাপতি শাহাম্ খাম, অবশিষ্ট পাঠানগণকে তাড়াইয়া দায়ুদ খানের নিকট পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। ঠিক এই সময় গোজার খানের মৃত্যু সংবাদ বঙ্গেশ্বর দায়ুদের কর্ণে পৌছিল ও সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোগল মহাসেনাপতি খান খানানের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান দেখিতে পাইলেন। দায়ুদ ভয়ে রণস্থল ও রণশিবির পরিত্যাগ করিয়া কটকের দুর্গ মধ্যে পলায়ন করিলেন।

এই যুদ্ধে জয়লাভ হইলেও এত অধিক সংখ্যক মোগল সেনার মৃত্যু হইয়াছিল যে, খান খানান মোনয়েম্ খান রণস্থল হইতে আর দায়ুদের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া, পাঁচ দিবস রণস্থলেই অবস্থান করিয়া, মৃত সেনাগণের কবর দিবার সুবন্দোবস্তে নিযুক্ত রহিলেন; এবং আহত সেনাগণকে চিকিৎসার্থে অন্যত্র পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন।

শেষে তাঁহার শারীরিক আঘাতজনিত কষ্ট, ক্রমশঃ অধিক যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইতে থাকায় সেনাপতি, রাজা টোডরমল্ল প্রভৃতি কয়েকজন মোগল সেনাধ্যক্ষকে, কটক দুর্গ অবরোধ করিতে প্রেরণ করিয়া, একটু বিশ্রাম লাভের চেষ্টায় কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মোগল সেনাগণ দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। তখন দায়ুদ খান অনন্যোপায় হইয়া ও বিজেতার নিকট আত্মসমর্পণই প্রকৃষ্ট উপায় বিবেচনা করিয়া, খান খানানের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

বঙ্গেশ্বরের দূত আসিয়া মোগল সেনাপতিকে অনুনয় সহ অবগত করিল যে—

"মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে এককালে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা কোন মোসলমান নরপতিরই মহৎকার্য্য বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে! এই ঘোর

বিপন্নাবস্থায় সম্রাট, বঙ্গেশ্বরকে তাঁহার হৃত রাজ্যের সামান্য একটু অংশ তাঁহার ও তাঁহার সহায়গণের ভরণ পোষণের জন্য দান করিয়া তাঁহাকে অধীন সেবকরূপে গ্রহণ করুন।"

মহানুভব উদারচেতা খান খানান মোন্‌য়েম্‌ খান তাহাতে উত্তর করিলেন—

"দায়ূদ খান স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিবেন ও ইহার জন্য দয়ার অবতার সম্রাটকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিবেন।"

পর দিবস ৯৮৩ হিঃ ১লা মোহার্‌রম ১৫৭৫ খৃঃ ১২ই এপ্রেল তারিখে খান খানান, দায়ূদ খানকে অভ্যর্থনা করিবার এবং তৎপরে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার প্রসঙ্গ সমস্ত ওমরাহ্‌গণ সমক্ষে প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে এক মহাসভার আহ্বান করিলেন। শিবির সম্মুখে মোগল সেনাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সশস্ত্রে দণ্ডায়মান রহিল।

বঙ্গেশ্বর দায়ূদ, তাঁহার আফগান ওমরাহগণসহ মোগল শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মোনয়েম্‌ খান শিষ্টাচার প্রদর্শনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, বঙ্গেশ্বরকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। এই সময়ে দায়ূদ স্বীয় কটিবন্ধ হইতে তরবারি উন্মোচন পূর্ব্বক মোগল সেনাপতির সম্মুখে রক্ষা করিয়া বলিলেন—

"এই যুদ্ধে আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি, যেহেতু ইহাতে আপনার ন্যায় উপযুক্ত ও মহানুভব সেনাপতি আহত হইয়াছেন।"

খান খানান তৎপরে বঙ্গেশ্বরের হস্ত ধারণে তাঁহাকে উপযুক্ত আসনে বসাইলেন এবং স্বয়ং পার্শ্বে বসিয়া নানা বিষয়ক কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে নানা প্রকার সুখাদ্য ও পানীয় আনীত হইল; তখন উভয়ে একত্রে আহার বসিলেন।

আহারান্তে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। দায়ুদ ভবিষ্যতে কখনও সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না, বা সম্রাটের কোন শত্রুপক্ষকে কখনও সাহায্য করিবেন না স্বীকার করিলেন; এবং সম্রাটের তরফ হইতে তিনিও উড়িষ্যা প্রদেশ ভোগ করিবার অনুমতি পাইলেন।

অতঃপর খান খানান একখানি মণিমুক্তা-খচিত বহুমূল্য তরবারি আনয়ন করিয়া, দিল্লীশ্বরের নামে স্বহস্তে উহা দায়ুদ খানের কটিবন্ধে সংলগ্ন করিয়া দিয়া বলিলেন—

"প্রবল প্রতাপান্বিত ভারত সম্রাট জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ আকবর বাদশাহের নামে, আমি এই তরবারি আপনাকে অর্পণ করিতেছি, আপনি সেই মহানুভব সম্রাটের উদ্দেশ্যে ইহার সদ্ব্যবহার করিবেন।"

পরদিন মহাসেনাপতি কটক পরিত্যাগ পূর্ব্বক খওয়াস্‌পুর' টাঁড়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং ১০ই শফর তারিখে রাজধানীতে গিয়া পৌছিলেন। ,এই সময় ঘোড়া-ঘাটের পাঠানেরা জালাল উদ্দীনের পুত্রের অধীনে, পুনরায় দলবদ্ধ হইয়া, মোগল শাসনকর্ত্তা মজ্‌নুন খানকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া, গৌড় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু মহাসেনাপতির আগমন সংবাদে, তাহারা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া, চিরদিনের তরে অরণ্য মধ্যে লুক্কায়িত হইল।

মোনয়েম খান তৎপরে গৌড়ে আগমন করিলেন, এবং এই মনোহর সৌন্দর্য্যশালী নগরের শোভা দৃষ্টে আকৃষ্ট হইয়া, লক্ষণাবতী নগরেই রাজধানী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বৎসরের দারুণ বর্ষান্তে গৌড়ে মহামারী উপস্থিত হইল। প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক জ্বর দুর্দান্ত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। শেষে উহা এমন অবস্থায় দাঁড়াইল যে—মৃত দেহের সৎকার করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। এমন কি মোসলমানের মৃতদেহ পর্য্যন্ত সমাধি অভাবে নদীজলে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

আমীর-উল্‌-ওমারা খান খানান মোন্‌য়েম খান পীড়িত হইয়া দশম দিবসে ৭ই রজব তারিখে দেহত্যাগ করিলেন। দ্বাবিংশতিবর্ষ রাজত্ব-কালে ৫৭৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর আজ্‌মীরে অবস্থান করিতে থাকা-বস্থায়, এই উদারচেতা সৎসাহসী যুদ্ধ পারদর্শী মহাসেনাপতি মোন্‌য়েম খানের মৃত্যু সংবাদে শোকে অভিভূত হইলেন ও সঙ্গে সঙ্গেই আবার সংবাদ পাইলেন যে—দায়ুদ খানও সন্ধির শর্ত্ত লঙ্ঘন করিয়া খাওয়াস্‌পুর টাঁড়া আক্রমণ করিয়াছেন; এবং অস্থায়ী সামরিক শাসনকর্ত্তা, সেনাপতি শাহেম্‌ খান জেলায়ের বাঙ্গালা পরিত্যাগে হাজিপুর ও পাটনা অঞ্চলে পলাইয়া গিয়াছেন।

বাদশাহ্‌, খান খানানের স্থলে পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হোসায়েন কুলি খানকে, খান-জাহান উপাধি ভূষিত করিয়া, বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। মোন্‌য়েম্‌ খান অপুত্রক থাকায় তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার বহু ধন সম্পত্তি সম্রাট সরকারে বাজেয়াফ্‌ত হইল।

এই নব-নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা ইতিপূর্ব্বে যখন জৌনপুরের সুবাদার ছিলেন, সেই সময় বহু অর্থব্যয়ে গোমতীর উপর যে প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবধি দর্শক বৃন্দের চক্ষে যেন নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই প্রস্তর নির্ম্মিত সেতু এত প্রশস্ত যে, গাড়ী ও মনুষ্যাদি যাতায়াতের যথেষ্ট পথ ছাড়িয়া দিয়াও, এই সেতুর উপর, উভয় পার্শ্বে বাজার বসিয়া থাকে, (তারিখ-ই-সোলতান নেজামী)

হোসায়েন কুলি খান্‌ খান্‌-জাহান

নব শাসনকর্ত্তা খান জাহানের লাহোর হইতে সেনা সম্ভার সহ বঙ্গদেশে পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায়, বঙ্গের এই গোলযোগের একমাত্র কারণ। এই কারণে সম্রাট জনৈক তুর্কী সেনাপতি সোবহান কুলির হস্তে

পত্র পাঠাইয়া, হোসায়েন কুলি খান খান-জাহানকে, পাঠান ভয়ে বঙ্গ পরিত্যক্ত সমস্ত আমীর ও জায়গীরদারকে সঙ্গে লইয়া, সত্বর দায়ূদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে অনুমতি দিলেন। এই সময় সোবহান কুলি ২২ দিনে প্রায় দেড় সহস্র মাইল পথ অতিক্রম করিয়া খান-জাহানের হস্তে রাজকীয় ফরমান পৌছিয়া দিয়াছিলেন।

হোসায়েন প্রথমতঃই তেলিয়াগড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে,—তিন সহস্র পাঠান সেনা ঐ গিরিপথ রক্ষা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া খান-জাহান, তাহাদের অন্যূন অর্দ্ধেক সৈন্য বিনাশ করিলেন। এই সময় দায়ুদ ৫০,০০০ অশ্বারোহী পাঠান যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া, টাঁড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসৈন্যে আকমহলে (পরবর্ত্তী রাজমহল্) অবস্থান করিতেছিলেন। আকমহল এক পার্শ্বে গঙ্গা ও অপর দিকে পর্ব্বতমালার দ্বারা সুরক্ষিত থাকায়, স্থানটি বেশ দুরাক্রমণ্য স্থান ছিল। সেনাপতি খান-জাহান এই আকমহলে পাঠানগণকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু কয়েক মাস অবরোধ করিয়া তাহাদের কোনই অপকার সাধনে সমর্থ হইলেন না। ইতিমধ্যে মোগল সেনা মধ্য হইতে জনৈক সাহসী সেনানী, খাজা আবদুল্লাহ্ অল্প সংখ্যক সেনা সহ পাঠানগণের গড়ের অতি নিকটে গিয়া পৌছিয়াছিলেন। তখন দায়ুদের সেনাগণ গড়ের বাহিরে আসিয়া, সেনাপতি সহ মোগলগণকে সমূলে ধ্বংস করিল। এই খণ্ডযুদ্ধে আবদুল্লাহ্ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন—(তবকত-ই-আকবরী)

সম্রাট সমীপে এই অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্যময় সংবাদ পৌছিবামাত্র, তিনি বেহারের শাসনকর্ত্তা মোজাফ্ফর খানকে ঐ প্রদেশের সমুদয় সেনা লইয়া সত্বর খান-জাহানের সাহায্যার্থে যাইবার অনুমতি প্রেরণ করিলেন। মোজাফ্ফর পাটনা ও ত্রিহুত হইতে ৫০০০ সহস্র অশ্বারোহী সহ

গিয়া খান-জাহানের সহিত মিলিত হইলেন। হিঃ ৯৮৪ সালের ১৫ রবিওল-আখের তারিখে এই সংযুক্ত মোগল সৈন্য, আগ্রা হইতে প্রেরিত তাহাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র কামানগুলি লইয়া মহাতেজে পাঠানগণকে আক্রমণ করিল। পাঠানবীর দায়ুদ খানও স্বীয় খুল্লতাত-ভ্রাতা অদম্য সাহসী জোনেদ খান কের্‌রাণীর অধীনস্থ সুশিক্ষিত পাঠান সেনা সহ মোগলগণের প্রচণ্ড আক্রমণের গতি রোধ করিতে লাগিলেন। তুমুল যুদ্ধ মধ্যে দায়ুদের প্রধান সহায় জোনেদ, শত্রু পক্ষের কামানের গোলায় উরুভঙ্গ হইয়া ভূপতিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে, এই সাঙ্ঘাতিক আগ্নেয় অস্ত্রে বহু সাহসী পাঠান সেনাপতি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিতে লাগিল। দায়ুদ খান বন্দি হইলেন, এবং বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সেনাপতি খান জাহানের আজ্ঞাক্রমে, মহাবীর দায়ুদ খানের ছিন্নমস্তক সম্রাট সমীপে প্রেরিত হইল। যুদ্ধাবসানে মোগলেরা অনেক হস্তী ও অসংখ্য যুদ্ধাস্ত্র হস্তগত করিয়াছিলেন। ২৩৬ বৎসর রাজত্বের পর দায়ুদ খানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের পাঠান রাজসূর্য্য চিরদিনের তরে অস্তমিত হইল (১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ)

দায়ুদ খান দেখিতে অতীব সুপুরুষ ছিলেন। বন্দি অবস্থায় সেনাপতি হোসায়েন কুলি খানের নিকট আনীত হইলে, তিনি প্রথমতঃ দায়ুদের প্রতি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিতে কোন মতে সম্মত হ'ন নাই। শেষে অধীনস্থ সমস্ত সেনানীগণের সমবেত অনুরোধে অনন্যোপায় হইয়া, সম্রাট প্রতিনিধি খান-জাহানকে, বঙ্গের শেষ পাঠান নরপতির প্রতি নিষ্ঠুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে হইয়াছিল।

দশম সর্গ।

মোগল শাসনাধীনে বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যা।

হোসায়েন কুলী খান খান-জাহান

রাজমহল জয়ের পর খান-জাহান, পাঠানগণের সমুদয় হস্তীযূথ ও যুদ্ধাস্ত্র সহ দায়ুদের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়া, রাজা টোডর মল্ল দ্বারা উহা সম্রাট আকবর শাহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মোজফ্ফর খানের অধীনে পলায়িত শত্রুগণের অনুসরণে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। পাঠানেরা এই সময় বেহারের পার্ব্বতীয় দেশে আশ্রয় লইয়াছিল। মোজাফ্ফর খান ভারাপিত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া, সুবাদারের আদেশ মতে রোটাস্ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিছু দিন অবরোধের পর রোটাস্ দুর্গ মোগলদিগের হস্তগত হইল (১৫৭৮ খৃঃ ৯৮৬ হিঃ)

খান-জাহান এই সময় উড়িষ্যায় একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া, মৃত দায়ুদের পরিবারবর্গকে বন্দী করিতে ও তাঁহার তথাকার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিতে আদেশ দিলেন। তৎপরে কুচবেহার অধিকার করিয়া, তিনি তথাকার স্বাধীন রাজাকে দিল্লীশ্বরকে কর দিতে বাধ্য করিলেন। কুচবেহারের রাজা তদবধি দিল্লীর পদানত হইয়া রহিলেন:

৯৮৬ হিজরীর শেষ ভাগে সুবাদার খান-জাহান, মৃত্যুর পূর্ব্বে সমস্ত বঙ্গদেশ, তৎসহ বেহার ও উড়িষ্যা বিভাগ সম্পূর্ণরূপে মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মোজাফ্‌ফর খান

খান-জাহানের মৃত্যুর পর সম্রাট, রোটাস্‌ বিজয়ী বীর মোজাফ্‌ফর খানকে বাঙ্গালা-বেহার-উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এই নব শাসনকর্ত্তাকে সৈন্য বিভাগে ও রাজকীয় অপরাপর কার্য্যে অধিক মনো-নিবেশ করিবার অবসর দিবার জন্য, বাদশাহ তাঁহার রাজস্ব বিভাগের কার্য্যে সাহার্য্যার্থ রায় পুতর দাস ও মীর আদ্‌হামকে, সাধারণ বেতন বিভাগে রীজ্‌বী খানকে এবং আবুল ফতেহ্‌ খানকে প্রধান বিচারকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এই নূতন বন্দোবস্তের ফলে, মোজাফ্‌ফর খান প্রথম বৎসরেই বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে দিল্লীর দরবারে পাঁচ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ও অনেক হস্তী পাঠাইতে পারিয়াছিলেন।

তৎপরে সম্রাটের আদেশ মতে মোজাফ্‌ফর খান, যে সকল মোগল সেনাপতি পাঠান জায়গীরদারগণের জায়গীর গ্রাস করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট আয়-ব্যয়ের হিসাব চাহিলেন। ইহাতে বালেশ্বরের জায়গীরদার খালেদী খান ও ঘোড়াঘাটের বাবা খান (যিনি কাকৃশাল পাঠানগণকে বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন) বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিলেন। অল্পকাল মধ্যে অনেক জায়গীরদার তাহাদের দলে মিলিত হইল ও সকলে গঙ্গা পার হইয়া গৌড় নগর অধিকার করিল। ক্রমে বঙ্গের সমস্ত জায়গীরদার বিদ্রোহীগণের পতাকা-নিম্নে সম্মিলিত হইয়া, বিদ্রোহের তুমুল বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল, শেষে সম্রাটের রাজকোষ লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিল।

তৎপরে টাঁড়া অধিকার করিয়া বিদ্রোহীগণ, দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ রাজবন্দী সৈফুদ্দীন হোসায়েনকে অবরোধমুক্ত করিয়া, তাঁহাকে দলপতি

মনোনীত করিল ; এবং সঙ্গে সঙ্গে সুবাদার মোজাফ্‌ফর খানকে হত্যা করিল। (১৫৮০ খৃঃ ৯৮৮ হিঃ)

দিল্লীশ্বর তাঁহার শাসনকর্ত্তার প্রাণবধে যত দুঃখিত না হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বজাতীয় ও স্বশ্রেণীভুক্ত অন্যূন ত্রিংশ সহস্র সেনার সহিত আবার যুদ্ধ করিতে হইবে ভাবিয়া ততোধিক চিন্তিত হইলেন।

রাজা টোডর মল্ল

বঙ্গের এই বিদ্রোহ দমনের জন্য বাদশাহ আকবর, বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজা টোড়র মল্লকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার প্রতি এই আজ্ঞা দিলেন যে—পথে যাইবার কালে দিল্লীর ফর্‌মান প্রদর্শনে তিনি সমস্ত মোগল শাসনকর্ত্তা ও জায়গীরদারকে যেন এই বিদ্রোহ দমনার্থে সঙ্গে লইয়া যা'ন।

জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা মোহাম্মদ মাসুম তিন সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সহ তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন।

৯৮৮ হিজরীর জমাদিয়ল্‌-আখের মাসে রাজা মুঙ্গেরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া তিনি অবগত হইলেন যে—বিদ্রোহীরা ত্রিংশ সহস্র অশ্বারোহী সহ ৩৮ মাইল দক্ষিণে ভাগলপুরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। এইরূপে উভয় সেনা অবস্থান 'করিতে থাকাকালে, কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধও হইয়া গেল।

রাজা টোডর মল্ল প্রত্যহই ডাক যোগে দিল্লীশ্বরের নিকট উভয় সেনার অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সম্রাট অবস্থা অবগত হইয়া, বিপক্ষ দলকে খাদ্যাভাবে বিপদে ফেলিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন ও অধিক মূল্য স্বীকারে চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদয় খাদ্য সামগ্রী

কিনিয়া লইবার উপদেশ দিয়া, জয়নুদ্দীন কাম্‌বুহ্‌ ও দরিয়া খানের হস্তে পাঁচ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

ক্রমে সম্রাট শিবিরে খাদ্যদ্রব্য অত্যধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে শুনিয়া, দলে দলে লোকে সেই স্থানে তাহাদের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে অল্পদিন মধ্যেই বিপক্ষ শিবিরে রসদের অভাব অনুভূত হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় বিদ্রোহী দলের প্রধান সহায় বাবা খান কাঁক্‌শাল জ্বর রোগে টাঁড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই সকল কারণে বিদ্রোহী সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ লইয়া পড়িল ও কথক মাসুম কুলির অধীনে বেহার যাত্রা করিল। মজ্‌নুন খান কাঁক্‌শাল পুত্র জব্বারী খান, বহু সেনা সহ টাঁড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। আরব বাহাদুর পাটনা জয়ের আশায় দ্রুতগতি পাটনার সন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা পাটনা রক্ষার্থে একদল সম্রাট সৈন্য প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং সাদেক খান সহ তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া বেহারের দিকে অগ্রসর হইলেন। সাদেক খান একজন বিচক্ষণ যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ প্রবীণ রণনিপুণ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। জান বেগ ও উলুগ খান, তাঁহার দুইজন সহকারী সেনানায়ক বিপক্ষ কর্ত্তৃক নিশাযোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইল; কিন্তু সাদেক বিপুল বিক্রমে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষ দলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া দিলেন। বিদ্রোহী মাসুম খান পলাইয়া গিয়া বাঙ্গালায় আশ্রয় লইলেন। এই যুদ্ধাবসানে সমুদয় বেহার প্রদেশ বিদ্রোহী শূন্য হইয়া, সম্রাটের পুনঃ হস্তগত হইল।

অতঃপর সম্রাট, আজম্‌ খানকে বেহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, ৫,০০০ সহস্র অশ্বারোহী সহ তাঁহাকে আগ্রা হইতে বেহারে পাঠাইয়া দিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে শাহবাজ্‌ খানকে রাজা টোডর মল্লের সাহায্যার্থ বহু সেনা সহ বঙ্গদেশাভিমুখে প্রেরণ করিলেন।

শাহ্‌বাজ হাজীপুরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে—বিদ্রোহী আরব বাহাদুর, রাজা গজপতির স্মরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, আরব বাহাদুরকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। রাজা গজপতি শাহ্‌বাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

এই সময় বঙ্গ-বেহারের বিদ্রোহ লইয়া এতাধিক বিব্রত হইয়া পড়া সত্ত্বেও, আকবরের ন্যায় সাহসী কর্ম্মিষ্ঠ যোদ্ধা কেন যে স্বয়ং বঙ্গের বিদ্রোহ দমন করিতে আসিলেন না, এই কথা অনেকেরই মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু ইতিহাস পাঠক-পাঠিকারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে—সেই সময়ে মালব খণ্ড ও গুজরাটের বিদ্রোহ লইয়া সম্রাট মহাব্যস্ত থাকায়, এবং বাদশাহের সহোদর মির্জ্জা মোহাম্মদ হাকিম, তাঁহার রাজধানী কাবুল হইতে হিন্দুস্থান আক্রমণের ষড়যন্ত্র করিতে থাকায়, সম্রাট আকবর এই মহা সঙ্কটাবস্থায় কোন দিকে যাইবেন কিছুতেই স্থির করিতে পারেন নাই।

অবশেষে সম্রাটকে বাধ্য হইয়া কাবুল যাত্রা করিতে হইয়াছিল। ৯৯০ হিজরীর ১০ রজব শুক্রবার মহামান্য ভারত সম্রাট, দুস্তর পার্ব্বতীয় প্রদেশের রাজধানী কাবুল নগরে গিয়া পৌঁছিলেন। মির্জ্জা হাকিম সম্রাট সান্নিধ্যে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায়, মহানুভব আকবর শাহ ভ্রাতার রাজত্ব তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া, তথায় বিংশতি দিবস অবস্থান করণান্তর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে জালালাবাদের পথ দিয়া আসিয়া, নৌসেতু যোগে সিন্ধুনদী পার হইয়া, রমজান মাসের শেষ তারিখে লাহোরে পৌঁছিলেন। লাহোর হইতে সৈয়দ খান, রাজা ভগবান দাস, এবং রাজকুমার মানসিংহকে পাঞ্জাব প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, বাদশাহ্‌ দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কাবুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ধার্ম্মিকপ্রবর মীর আবু তোরাব, হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পদ চিহ্নাঙ্কিত এক খণ্ড প্রস্তর অতি যত্নের সহিত সঙ্গে আনিতেছিলেন। দিল্লীতে ঐ সম্বন্ধে কথোপকথন হওয়ার পর, বাদশাহ্ কতিপয় পদস্থ ওমরাহগণ সহ ১২ মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া, উক্ত আবু তোরাবের নিকট হইতে, ঐ পবিত্র প্রস্তর খণ্ড সযত্নে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রস্তর লইয়া আসিবার কালে মহামান্য ভারত সম্রাট আক্‌বর হইতে তাঁহার সমভিব্যাহারী আমীরগণ, প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট কিছু কিছু দূর পর্য্যন্ত ঐ পবিত্র প্রস্তর খানি স্কন্ধে করিয়া আনিয়াছিলেন।

এই সময় আজম্ খানের সহিত বঙ্গের সুবাদার রাজা টোডর মল্লের মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হওয়ায়, আজম্ খান সম্রাট সকাশে দিল্লীতে আগমন করিলেন। সম্রাটও এক বিভাগে দুই জন শাসনকর্ত্তা থাকিলে, শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তিরই অধিকতর সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া, রাজা টোডরমল্লকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও আজিম খানকে খান-আজম উপাধিতে ভূষিত করিয়া, বাঙ্গালা বেহার ও উড়িস্থার শাসনকর্ত্তার সনন্দসহ পাঠাইয়া দিলেন; এবং রাজধানীর যে সকল সেনা কাবুল অভিযানে সম্রাটের সহিত যাত্রা করে নাই, সম্রাট তাহাদিগকে খান-আজমের সহিত বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন।

এই বৎসরই ৯৯০ হিজরী সম্রাটের অনুমতিক্রমে মোল্লা আবদুল কাদের, নকিব খাঁন ও হাজী সোলতান খানেশ্বরীর সাহায্যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহোর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত, শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, বিভৎস প্রভৃতি দশরস-উদ্দীপক মহা উপন্যাস, বনাম হিন্দুদিগের দ্বিতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ নানা যুক্তি তর্ক পরিপূর্ণ অদ্ভুত পৌরাণিক ইতিহাস্ গ্রন্থ মহাভারতখানি সংস্কৃত হইতে পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। ফারসী ভাষায় ঐ গ্রন্থের নাম রমজ্‌নামা বা প্রহেলিকার গ্রন্থ রাখা হইল। তৎপরে ৯৯৯ হিজরীর

জমাদিওল আউয়ল মাসের শেষ ভাগে, মোল্লা আব্দুল কাদের ২৫,০০০ শ্লোকযুক্ত রামায়ণ গ্রন্থের পারস্য ভাষায় অনুবাদ সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

আজিম খান খান আজম্

সম্রাটের নিয়োজিত নব শাসনকর্ত্তা খান-আজম আজিম খান, একজন খুব রণকুশল সেনাপতি ছিলেন। বাঙ্গালার মসনদে বসিয়া খান-আজম স্বীয় কৌশলজাল বিস্তার করিয়া বিদ্রোহীদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ জন্মাইয়া, তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া দিলেন ও পরে উহাদিগকে অক্লেশে পরাভূত করিয়া, ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-বেহারের সুশাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিলেন। কিন্তু টাঁড়া ও গৌড়ের জল-বায়ু তাঁহার সহ্য না হওয়ায়, তিনি সম্রাটের নিকট পদত্যাগের প্রার্থনা করিলেন।

এই সময় পাঠানেরা কত্লু খানের অধীনে সমবেত হইয়া, উড়িষ্যায় গোলযোগ বাধাইতে লাগিল। ক্রমে তাহারা মেদিনীপুর ও বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত অধিকারভুক্ত করিয়া লইল। শেষে ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে খান-আজম উহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে, উড়িষ্যায় বহু সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আজম খানের প্রেরিত সেনাগণ দুর্দ্ধর্ষ আফ্গান-দিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না বিবেচনা করিয়া, পশ্চাৎ-পশ্চাৎ তিনি অপর একজন সেনানী ফরিদ উদ্দিন বোখারিকে কতলু খানের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

ফরিদ উদ্দীন নিজ বংশ-মর্য্যাদার গৌরবে, পাঠান দূতের প্রতি একটু তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করায়, আফ্গানেরা অতিশয় অপমানিত হইয়া, বঙ্গেশ্বরের দূতের ব্যবহারের প্রতিফল দিবার জন্য পরামর্শ স্থির করিতে লাগিল। অবস্থা বুঝিয়া চতুর ফরিদ তথা হইতে সরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

এই কথা ক্রমে যখন কত্‌লু খানের কর্ণে উঠিল, তখন তিনি জনৈক বাহাদুর খানকে তৎক্ষণাৎ ফরিদ উদ্দীনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বাহাদুরের সহিত যুদ্ধে অনেক মোগল সৈন্য প্রাণ হারাইল।

মোগল সেনাপতি এই সংবাদ শুনিয়া, বর্দ্ধমান হইতে অগ্রসর হইয়া কত্‌লু খানকে আক্রমণ করিলেন ও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া, জঙ্গল মধ্যে বিতাড়িত করিয়া দিলেন।

এই সময়ে খান-আজম শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন, বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায়, মোগল সৈন্য আর পাঠানগণের অনুসরণ না করিয়া, রাজধানী টাঁড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরে খান-আজম বঙ্গ-বেহারের সুবন্দবস্ত করিয়া দিয়া, হিজরী ৯৯২ সালের রবিওল আউয়াল মাসে আগ্রায় গিয়া পৌঁছিলেন। তথায় তিনি ভারতেশ্বর কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়াছিলেন। তদনন্তর দিল্লীশ্বর খান-আজমকে গুজ্‌রাটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

শাহ্‌বাজ খান কাম্বু

এই শাহবাজ খান প্রথমতঃ রাজা টোডর মল্লের অধীনে একজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন ও তাঁহার সহিত বাঙ্গালায় আগমন করিয়া, বহু যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিদ্রোহী মাসুম খানকে তিনিই সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া, অরণ্যময় পার্ব্বত্য দেশে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে খান আজমের শাসনকালে তিনি, ঘোড়াঘাটের পাঠানগণের সহিত যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া, ইহাদের সমস্ত দেশ ও ক্রমে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত সমুদয় ভূখণ্ড, দিল্লীশ্বরের শাসনাধীনে আনয়ন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

শাহ্‌বাজ খানের এই অসাধারণ বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট,

খান-আজমের পদত্যাগের পর তাঁহাকেই বঙ্গ-বেহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এই সময় গৌড় টাঁড়া প্রভৃতি স্থান এতাধিক অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছিল যে—পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন ওম্‌রাহ বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা হইয়াও এদেশে আসিতে সম্মত হইতেন না। এমনকি দিল্লীশ্বরের অনুরোধ রক্ষা করিয়া, তাহাদিগকে বঙ্গ-বেহারের সুবাদার হইয়াও আসিতে হইলে, তাহারা ইহা তাহাদের প্রতি সম্রাটের নির্ব্বাসন-দণ্ড বিবেচনা করিতেন।

শাহবাজ খানও সেই মত প্রথমতঃ বাঙ্গালায় আসিতে অসম্মত হইলেন। পরে পাছে সম্রাট অসন্তুষ্ট হ'ন ভাবিয়া, অনিচ্ছার সহিত সম্মত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালায় এই সময় ক্যাকেশ্‌হেলান্‌দিগের আধিপত্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাদিগকে দমন করা দুঃসাধ্য দেখিয়া, সুবাদার শাহবাজ খান উহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। তিনি কুত্‌লু খানের সহিতও এই মর্ম্মে সন্ধি করিয়াছিলেন যে—কত্‌লু বাঙ্গালার সীমার মধ্যে কোন গোলযোগ না করিয়া, কেবল উড়িষ্যা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন।

এই উভয় কার্য্যে হীনতা প্রদর্শনে, সুবাদার শাহবাজের উপর দিল্লীশ্বরের দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি, ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া আগ্রায় ডাকিয়া লইলেন, এবং ওয়াজের খান হেরেবির উপর বাঙ্গালা-বেহারের শাসনভার অর্পণ করিলেন। ওয়াজির খান টাঁড়ায় পৌছিয়া, অল্পদিন মধ্যেই সেই সাময়িক বাঙ্গালার দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণ হারাইলেন।

রাজকুমার মানসিংহ

অম্বরপতি রাজা ভগবান দাস আমির-উল-ওমরা ও রাজা টোডরমল্ল ওয়াকিল-উস্‌-সাল্‌তানাত মোশরফে-দিওয়ান, উভয়েই সেই সময় সম্রাট

আকবরের সহিত পাঞ্জাবে ছিলেন। তৎপূর্ব্বেই ৯৯৩ হিঃ রাজা ভগবান দাসের কন্যার সহিত সম্রাট তনয় সেলিমের (পরে বাদশাহ্‌ জাহাঙ্গীর) বিবাহ হয়। এই কারণে বাদশাহ, ওয়াজির খানের মৃত্যুর পর রাজা ভগবান দাসের পুত্র সম্রাট সেনাপতি কুমার মানসিংহের উপর বঙ্গ-বেহারের শাসনভার অর্পণ করিলেন। কুমার সেই সময় পেশাওরে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত থাকায়, তাঁহার বাঙ্গালায় না পৌছান কাল পর্য্যন্ত, পাটনার শাসন-কর্ত্তা সৈয়দ খানকে, সম্রাট অস্থায়িরূপে বাঙ্গালার মস্‌নদে বসিবার আদেশ প্রেরণ করিলেন।

এই বৎসর ৯৯৫ হিজরীর ১৯শে রজব তারিখে রাজা রায় সিংহের কন্যার সহিত বাদশাহ, তাঁহার একমাত্র পুত্র সেলিমের পুনরায় বিবাহ দিলেন। রাজা রায়সিংহ সম্রাট কুমারের সহিত স্বীয় পুত্রীর বিবাহ দিয়া মহা গৌরবান্বিত হইয়া, কন্যাসহ বিস্তর বহুমূল্য ও উৎকৃষ্ট যৌতুক প্রেরণে ধন্য হইয়াছিলেন—(তব্‌কতে আক্‌বরী)

সম্রাটের রাজত্বের এই দ্বাত্রিংশ বর্ষে, তাঁহার সেনাপতি মোহাম্মদ কাসেম খান, কাশ্মীর জয় করিয়া শ্রীনগর অধিকার করেন ও ইউসুফ্‌ খানের পুত্র ইয়াকুব খানকে বার বার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, শেষে তাঁহাকে বন্দী করিয়া সম্রাট সমীপে প্রেরণ করেন। এই বৎসরই সেনাপতি জায়েন খানের সহিত মিলিত হইয়া, কুমার মানসিংহ খায়বার-পাসের যুদ্ধে পাঠানদিগের পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী ও বিংশতি সহস্র পদাতিক সেনা বিধ্বস্ত করেন ও কাবুল, তথা খায়বারের প্রবেশ দ্বার জমরুদ দুর্গ অধিকার করেন।

অতঃপর সম্রাট শ্রীনগর ও কাবুল পরিদর্শনের ইচ্ছায় স্বীয় পৌত্র কুমার মোরাদের তত্ত্বাবধানে রাজপুরীর মহিলাগণকে রক্ষা করিয়া, ৯৯৭ হিজরীর ২২ জমাদিয়স্‌সানি কাশ্মীর যাত্রা করিলেন ও ১লা শাবান

তারিখে ভারতবর্ষের ঐ পরম রমণীয় উদ্যান শ্রীনগরে পৌছিলেন। বাদশাহ কিছুদিন তথায় অবস্থানান্তর ২২ জিল্‌কদ কাবুলে পৌছিয়া, পুনরায় দুই মাস কাল কাবুলে অবস্থান করেন। কাবুলে থাকা কালে ভারতেশ্বর লাহোর হইতে, রাজা টোডরমল্ল ও রাজা ভগবান দাসের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শোকে ম্রিয়মান হইয়াছিলেন। তৎপরে মোহাম্মদ কাসেম মীর বাহারের হস্তে কাবুলের শাসনভার অর্পণ করিয়া বাদশাহ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কুমার মানসিংহ (এক্ষণে পিতৃ বিয়োগের পর রাজা মানসিংহ) ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় হাজীপুরের জমিদার পূরাণ মল্ল খেজুরিয়া, বিস্তর সেনা সংগ্রহ করিয়াছেন অবগত হইয়া, সুবাদার মানসিংহ তাহার দুর্গ আক্রমণ করিলেন। পূরাণমল্ল নিজের সমস্ত হস্তী তৎসহ বিস্তর অর্থ দিয়া মানসিংহের সহিত সন্ধি করিলেন। সুবাদার সম্রাট সমীপে ঐ সমুদয় হস্তী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মানসিংহ ৯৯৮ হিজরীতে উড়িষ্যা অভিযানের জন্য বেহারে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার জল-বায়ু অস্বাস্থ্যকর বিধায়ে রাজা মানসিংহ টাড়া বা গৌড়ে না থাকিয়া প্রায় বেহারেই অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং সৈয়দ খান তাঁহার অধীনে শাসনকর্ত্তা স্বরূপ টাঁড়ায় রহিলেন।

অতঃপর রাজা মানসিংহ বহু সেনাসহ ভাগলপুর হইতে বর্দ্ধমানে গিয়া পেঁৗছিলেন ও তাঁহার আদেশ মত সৈয়দ খান, কাটোয়া দিয়া তাঁহার সহিত বর্দ্ধমানে গিয়া মিলিত হইলেন। কিন্তু গৌড় ও টাঁডা অঞ্চলে তখনও পর্য্যন্ত মহামারীর প্রকোপ নিবৃত্তি না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকায়, সৈয়দ খান এই সময় অধিক সেনা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। রাজা মানসিংহ দারকেশ্বর নদীতীরে জাহানাবাদে শিবির সন্নিবেশ করিয়া, বর্ষাবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কত্‌লু খানের পাঠান সেনাগণ মোগল শিবিরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিল। শেষে রাজা স্বীয় পুত্র কুমার জগৎ সিংহকে উহাদের দমনার্থ বহু সেনা সহ প্রেরণ করিলেন। চতুর চূড়ামণি কত্‌লু খান তখন সন্ধির ভাণ করিয়া, এই অপরিনামদর্শী যুদ্ধ কৌশল অনভিজ্ঞ যুবক জগৎ সিংহকে অতি সহজে ভুলাইয়া রাখিলেন; পরে অবসর বুঝিয়া, ধেরপুর নামক স্থানে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার অধীনস্থ প্রায় সমস্ত সেনা নিঃশেষ করিলেন ও কুমারকে বন্দি করিয়া লইয়া গেলেন।

এই সময় বিষ্ণুপুরের রাজা পাঠানগণের পক্ষে ছিলেন। পাঠান সেনানী বাহাদুর খান বন্দি জগৎ সিংহের প্রাণনাশের আজ্ঞা দিলে, বিষ্ণুপুর-রাজ বহু অনুরোধ করিয়া, বাহাদুরের নিকট হইতে জগৎ সিংহের প্রাণ-ভিক্ষা লইয়াছিলেন। অতঃপর জগৎ সিংহকে পাঠান শিবিরে বন্দী অবস্থায় থাকিতে হইল।

এই সময়ে মানসিংহের শুভাদৃষ্ট ক্রমে পাঠান বীর কত্‌লু খানের মৃত্যু হওয়ায়, তদীয় মন্ত্রী খাজা ইসা, কত্‌লু খানের অল্প বয়স্ক পুত্রগণের পক্ষে কুমার জগৎ সিংহের প্রাণের বিনিময়ে সন্ধির প্রস্তাব করেন। রাজা মানসিংহ আপত্য স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া এই শর্ত্তে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন যে—তিনি উড়িষ্যায় পাঠানগণের রাজত্বে হস্তক্ষেপ করিবেন না ও পাঠানেরা উড়িষ্যার মধ্যে কেবল মাত্র জগন্নাথের মন্দির ও তৎসংলগ্ন নির্দ্দিষ্ট কিছুদূর পর্য্যন্ত ভূভাগ, বঙ্গের সুবাদারকে ছাড়িয়া দিবেন।

এই সন্ধির পর রাজা, পুত্র জগৎসিংহকে লইয়া পাঠানগণ প্রদত্ত দেড়শত হস্তী সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন বেহারে করিলেন।

উড়িষ্যা বিজয় সম্বন্ধে সুবাদার মানসিংহের এইরূপ নির্জীবতার সংবাদ পাইয়া, সম্রাট আকবর যৎপরনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু

তত্রাপি তাঁহার অধীনস্থ সুবাদার কৃত এই সন্ধির শর্ত্তে হস্তক্ষেপ না করিয়া স্বীয় মহানুভাবতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

দুই বৎসর পরে খাজা ইসার মৃত্যু হওয়ায়, আফগানগণ জগন্নাথক্ষেত্র আক্রমণ করিল; এবং এই কারণে রাজা, বাদশাহের নিকট আবার উড়িষ্যা আক্রমণের অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন।

সম্রাটের অনুমতি পাইয়া সুবাদার, বেহারের সেনাগণকে ঝাড়খণ্ডের পথে মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দিয়া, স্বয়ং নৌকাযোগে টাঁড়ায় সৈয়দ খানের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তৎপরে সসৈন্যে সেনাপতি সৈয়দ খানকে সঙ্গে লইয়া সুবর্ণরেখা তীরে, যেখানে পঠান সেনাগণ অপেক্ষা করিতেছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন ও কিছুদিন সেইস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অবশেষে পাঠানগণ অধৈর্য্য হইয়া নদী পার হইয়া, মোগল সেনাগণের উপর নিপতিত হইল। এই কার্য্যে পাঠানেরা এবারও তাহাদের অগণ্য হস্তীযূথের উপরই অধিক ভরসা করিয়াছিল। কিন্তু সম্রাটের কামান-নিঃসৃত গোলায় পাঠানগণের হস্তী অধিকক্ষণ রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারিল না। তৎপরে পাঠানগণ সমবেত হইয়া একযোগে অমিত-তেজে মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করিল। মোগলেরা সংখ্যায় অধিক থাকা হেতু সমস্ত দিবস যুদ্ধের পর, পাঠান বীরগণ ক্রমশঃ সংখ্যায় কমিতে থাকায়, সন্ধ্যার সময় রণে ভঙ্গ দিয়া, কটক দুর্গে আশ্রয় লইল।

কটকের দুর্গ সেই সময় জনৈক রামচন্দ্রের অধিকারে ছিল, মোগল সেনাগণ দুর্গাবরোধ করায়, রামচন্দ্র অগত্যা নিজের ও পাঠানগণের পক্ষে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

এই সন্ধিদ্বারা পাঠানগণ উড়িষ্যা বিভাগ হইতে চিরকালের জন্য বহিষ্কৃত হইল ও বঙ্গে খলিফাবাদ জেলামাত্র জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইল। রামচন্দ্র অতঃপর দিল্লীর অধীনস্থ জমিদার হইয়া রহিলেন।

রাজা মানসিংহ তৎপরে অস্বাস্থ্যকর গৌড় হইতে, বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত করিলেন! এই নগরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "আকবর নগর" হইল।

১০০২ হিজরীতে দিল্লীশ্বর তাঁহার অল্পবয়স্ক পৌত্র সোলতান খসরুকে উড়িষ্যাবিভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার অধীনে ৫,০০০ সহস্র সৈন্য রক্ষা করিলেন। রাজা মানসিংহ, উড়িষ্যাবিভাগের জন্য কুমারের অভিভাবক হইয়া রহিলেন; এবং সৈয়দ খান বেহার বিভাগের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন।

১০০৪ হিজরীতে কুচবেহারের রাজা লক্ষণনারায়ণ, সুবাদার মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দিল্লীশ্বরের সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিলেন। এই কারণে কুচ্‌বেহার রাজের আত্মীয়গণ তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিল ও লক্ষণনারায়ণ স্বীয় দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

কুচ্‌বেহার রাজের এই দুরবস্থার সংবাদে, সেনাপতি জেহাজ খান, মোগল সেনা সমভিব্যাহারে কুচ্‌বেহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, বন্দি রাজাকে মুক্ত করিয়া দিয়া, বহু ধনরত্ন সহ রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১০০৭ হিজরীতে সম্রাট আক্‌বর, মানসিংহকে দাক্ষিণাত্য জয়ের সাহায্যের জন্য সৈন্যসহ ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজার বঙ্গদেশ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আবার পাঠানেরা কত্‌লু খানের পুত্র ওস্‌মান খানের অধীনে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, এমনকি গেন্দেরাকের (ভদ্রকের) যুদ্ধে পাঠানেরা মোগল বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মহাসিংহের সেনাপতি প্রতাপসিং মোগল সৈন্যের নেতা ছিলেন। (আক্‌বর নামা)।

মোগল সেনার এই পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া সম্রাট, পুনরায় রাজা মানসিংহকে আজমীর হইতে ডাকাইয়া, এবার বহু সৈন্য সহ বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীপুর-আটাইয়ার নিকট পাঠানগণের সহিত মোগল সেনার যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে পাঠানেরা মোগল-রাজপুতের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া, রণে ভঙ্গ দিল। রাজা মানসিংহ ১০১৩ হিঃ ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গ-বেহারের শাসনকর্ত্তা আবার পদে নিযুক্ত রহিলেন।

এই বৎসর সম্রাট-মাতা হামিদা বানুর মৃত্যু হয়! বাদশাহ আকবর অপরাপর আমীরগণের সহিত শবদেহ স্কন্ধে করিয়া প্রাকার বেষ্টিত দিল্লীর বাহিরে, তাঁহার পিতৃ-সমাধির পার্শ্বে মাতাকে সমাধিস্থ করিলেন।

অতঃপর আবুল-মুজিদ আশফ্ খান বঙ্গ-বেহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

এই সময় সম্রাট আকবরের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ায়, প্রধান মন্ত্রী খান-আজিমের উপর সাম্রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পিত হইল। সম্রাট ইদানীন্তন তাঁহার একমাত্র পুত্র সেলিমের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। অপর পক্ষে সেলিম-পুত্র কুমার খস্রু, প্রধান মন্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করায়, এবং রাজা মানসিংহের সহোদরার গর্ভজাত পুত্র বিধায়, সাম্রাজ্যের এই মহাপরাক্রমশালী ব্যক্তিদ্বয়, কুমার সেলিমের পরিবর্ত্তে সম্রাট-পৌত্র কুমার খসরুকে বাদশাহের পর, সিংহাসনে বসাইবার পক্ষপাতি হইয়া উঠিলেন।

কুমার সেলিম এই সময় পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দুই দিবস অবস্থান করিয়া, সাধ্যমত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন; এই অবস্থায় বাদশাহ প্রধান মন্ত্রী ও রাজা মানসিংহকে ডাকিয়া, কুমার সেলিমকে তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া সকল বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলেন।

১০১৪ হিজরীর ১৬ই জমাদিওল আখের তারিখে ভারত সম্রাট জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ আকবর বাদশাহ্, তাঁহার চিরপ্রিয় আগ্রা নগরে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইয়া পুনরায় স্বীয় শ্যালক রাজা মানসিংহকে কয়েক মাসের জন্য শাসনকর্ত্তারূপে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। আট মাস পরেই সম্রাটের আজ্ঞায়, আবার তাঁহাকে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল।

একাদশ সর্গ

কোতব-উদ্দীন খান কোকল্‌তাশ।

রাজা মানসিংহের পর সম্রাট জাহাঙ্গীর, কোতবউদ্দীন খানকে বাঙ্গালা-বেহার-উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ১০১৫ হিঃ ৯ই শফর তারিখে, এই নব নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা সম্রাটের নিকট হইতে খেলয়াত্‌ লইয়া বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা সমভিব্যাহারে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন।

বাঙ্গালার রাজধানী রাজমহলে পৌঁছিবার পর, বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা জগৎপ্রসিদ্ধ সুন্দরী মেহের-উন্নেসার স্বামী আলিকুলি খান শের আফ্‌গান, রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, সম্রাট প্রতিনিধিকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শনে অভ্যর্থনা না করার অপরাধের অযথা ছল ধরিয়া, সুবাদার তাঁহাকে সামান্য অপরাধীর ন্যায় স্বীয় রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। শের, বঙ্গেশ্বরের এই আচরণে সম্পূর্ণ সন্দেহ পরবশ হইলেও, তিনি তাঁহার নিজের অসাধারণ শারীরিক ক্ষমতার বিষয়ে এতদধিক প্রত্যয়শীল ছিলেন যে, রাজমহলে আসিবার সময় সামান্য দুই চারি জন সহচর ভিন্ন কোন দেহরক্ষী সেনাই তাঁহার সঙ্গে লয়েন নাই। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, তিনি তাঁহার অবস্থানের জন্য যে প্রাসাদ পাইয়াছিলেন, নিশাকালে তাহার পাহারার নিমিত্ত কোন অস্ত্রধারীও রাখিতেন না। শেষে এই অসাবধানতার জন্য তাঁহাকে বড় বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।

একদা নিশাকালে ৪০ জন ঘাতক তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া

তাঁহাকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিল। বীর-পুঙ্গব শের আফগান নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া, তাহাদিগের মধ্যে অনেককে ধরাশায়ী করিলেন। অবশিষ্ট ঘাতকেরা পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

ইহার পর সম্রাটের অনুমতি ক্রমে সুবাদার কোতব উদ্দীন, শের আফগানকে বন্দী করিয়া, দিল্লীতে প্রেরণ করিবার আশায়, তাঁহার নিকট গিয়া, নিজে নিহত হইলেন। পরে তাঁহার সহচরগণ উপর্য্যুপরি বন্দুকের গুলি বর্ষণের পর, প্রথমতঃ শেরের ঘোড়াটীকে নিহত করিল। তৎপরে ক্রমান্বয়ে ছয়টী গুলির আঘাতে শের আফগানের বীরবপু ধরাশায়ী হইল।

কোতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে বেহারের শাসনকর্ত্তা জাহাঙ্গীর কুলি খান, বাঙ্গালার মসনদে বসিলেন।

জাহাঙ্গীর কুলি একদিকে অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও, অপর পক্ষে তিনি বড়ই নিষ্ঠুর ছিলেন। বঙ্গের প্রজাবর্গের সৌভাগ্যবশতঃ ইঁহাকে এক বৎসরের অধিককাল সুবাদার হইয়া থাকিতে হয় নাই।

এই স্থলে দিল্লীশ্বর আকবরের পালক পুত্র এই জাহাঙ্গীর কুলির পিতৃ ভক্তির বিষয় সামান্য একটু উল্লেখযোগ্য।

সম্রাট আকবর বাল্যকাল হইতেই ভাগ্য-বিতাড়িত হইয়া, এবং কৈশোরে নিয়ত যুদ্ধ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, বিদ্যার আলোক তাঁহাকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় নাই। এমন কি দিল্লীশ্বর নিজের নাম পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। তথাপি তাঁহার এই পুত্র জাহাঙ্গীর, পিতা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"আমার মহামান্য পিতা নিরক্ষর থাকা সত্ত্বেও, সর্ব্বক্ষণ মহামহা পণ্ডিত-মণ্ডলীর সংশ্রবে থাকিয়া ও তাঁহাদের সহিত সর্ব্বদা বাক্যালাপ করিয়া, তাঁহার অভিজ্ঞতা ও ভাষাজ্ঞান এরূপ জন্মিয়াছিল, এবং মার্জ্জিত কথোপকথনে এতাধিক ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল যে—তাঁহাকে কেহই

অশিক্ষিত বলিয়া ধারণা করিতে পারিত না। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও বিবেক পরিমার্জ্জিত হইয়া, তাঁহাকে এরূপ সর্ব্ব-কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিয়াছিল যে, এই সম্পূর্ণ অশিক্ষিত সম্রাটের ন্যায় কাব্য-রসাস্বাদন করিতে, তাঁহার রাজ-সভায় আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উৎকৃষ্ট কবিতা সকলের কোমলতা ও মাধুর্য্য সকলের অপেক্ষা সম্রাট অধিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন।"

আকবর পুত্র বাদশাহ জাহাঙ্গীর, স্বহস্ত-লিখিত জীবন চরিতে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি সৎসাহসের পরিচয় দিয়া, কোন স্থানে নিজ দোষ ঢাকিবার আদৌ চেষ্টা করেন নাই।

বাল্যকাল হইতে জাহাঙ্গীর যে অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার লিখিত জীবনীতে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে—

"আমার এই কু-স্বভাব, আমি আ-জীবন সংশোধনের চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়াছি। তবে ত্রিংশ বর্ষ বয়ক্রম কাল হইতে রাত্রিকালে ভিন্ন দিবসে কখনও আমি মদ্যপান করি নাই। আমার শেষ জীবনের পান দোষ, কেবল আমার খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের সাহায্যার্থ ছিল মাত্র।"

এই নরপতি স্বয়ং মদ্যাসক্ত থাকা সত্ত্বেও, রাজ্যমধ্যে মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া কিরূপে অনুগত নরসিংহ দেবের দ্বারা, পিতার প্রিয় আমাত্য আবুল ফজলকে হত্যা করিয়াছিলেন; তাহা তিনি তাঁহার জীবনীর মধ্যে নিজ হস্তে লিখিয়া গিয়াছেন।

একদা কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিতের সহিত ঈশ্বরের দশ অবতার সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ তর্ক উপস্থিত হয়—

সম্রাট বলিলেন—"সকল ধর্ম্মেই ত' ঈশ্বরকে অসীম-অনন্ত বলিয়া স্বীকার করে; তবে আপনারা কেন সেই অসীম মহান্ বস্তুটীকে সীমার গণ্ডিরমধ্যে আবদ্ধ করিতে চান? যদ্যপি আপনারা বলেন যে—এই অবতার দেহগুলির মধ্যে সেই ঐশ্বরিক আলোক বা প্রতিরূপ দেখা গিয়াছিল; তদুত্তরে আমি এই বলিতে চাই যে—কেবল অবতার কেন, অনেক বস্তুতেই ত' তাহা দেখা যায়। আর যদি এই প্রতিরূপ কেবল ঐ অবতার কয়টীর প্রতিই বিশেষরূপে আরোপ করিতে চা'ন, তাহা হইলে ইহাও দেখা যায় যে--সকল ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যেই কোন না কোন সময়ে এরূপ অনেক লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা অপর সকলের অপেক্ষা অত্যধিক জ্ঞান-বুদ্ধির বা বল-বীর্য্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন ও সঙ্গে সঙ্গে বহু অলৌকিক বিস্ময়জনক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছেন।"

এই সম্বন্ধে দিল্লীশ্বর স্বীয় পুস্তকে আরো লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে—"শেষে হিন্দু পণ্ডিতগণকে আমার নিকট স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও লয় কর্ত্তা, একমাত্র একটী অতি বৃহৎ সামগ্রীর ধারণা তাঁহাদের ক্ষুদ্র মনের মধ্যে সঙ্কুলান না হওয়ায়, তাঁহারা এই মধ্যবর্ত্তী প্রতিমূর্ত্তিগুলির দ্বারা তাঁহাদের মনকে ক্রমশঃ উন্নত করিয়া, সেই মহান্ পরমেশ্বরের নিকট লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। আমি উত্তর করিলাম,—তাঁহারা এই ভ্রান্তিমূলক উপায় অবলম্বনে, কোন ক্রমেই তাঁহাদের যথার্থ ইপ্সিত বস্তু পাইতে পারেন না। (ওয়াকেয়াতে জাহাঙ্গিরী)

আলাউদ্দীন এস্‌লাম খান

সম্রাট-জাহাঙ্গীর, বেহারের এই যুবক শাসনকর্ত্তাকেই জাহাঙ্গীর কুলির মৃত্যুর পর, বাঙ্গালা শাসনের সনন্দ পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহাকে সত্বর বেহার

পরিত্যাগ করিয়া, বঙ্গদেশে আসিতে অনুমতি করিলেন। এস্‌লাম খান, রাজধানী রাজমহল হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়া, পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা নগরে স্থাপন করিলেন। বেহারের শাসনভার আফ্‌জল খানের উপর ন্যস্ত রহিল।

এই সময়ে পর্ত্তুগীজেরা আরাকাণ ও চট্টগ্রামের সমুদ্রতীরে বাস করিতে থাকা নিবন্ধন, উহাদের মধ্যে অনেকেই আরাকাণ রাজের সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিল। রাজা পর্ত্তুগীজদিগকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দান করিয়া, তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এই পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ এতদূর অত্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া উঠিয়াছিল যে, রাজা বাধ্য হইয়া, তখন তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। শেষে অনন্যোপায় হইয়া, আরাকাণ রাজকে অনেক পর্ত্তুগীজের বিনাশ সাধন করিতে হইয়াছিল। অবশিষ্ট প্রবাসী পর্ত্তুগীজগণ নৌকাযোগে পলাইয়া গিয়া, গঙ্গার মোহানাস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলীতে আশ্রয় লইয়া দস্যুবৃত্তিদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

সন্দ্বীপের সৈনিক শাসনকর্ত্তা ফতেহ্‌ খান, পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের এই অত্যাচারের প্রতিবিধান স্বরূপ, তাহাদের অধিকৃত দ্বীপগুলি অধিকার করিয়া, প্রায় সমস্ত পর্ত্তুগীজ অধিবাসীকে বিনাশ করিলেন; তন্মধ্যে যে কয়জন পলাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, ফতেহ্‌ খান তাহাদিগকে অর্ণবপোত যোগে দক্ষিণ-সাহ্‌বাজপুর দ্বীপ পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া, দুঃসাহসিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শেষে এই অপরিণাম-দর্শিতার ফলেই, ফতেহ্‌ খানকে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক সসৈন্যে বিনষ্ট হইতে হইয়াছিল।

এই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ইউরোপ খণ্ড হইতে দলে দলে পর্ত্তুগীজ আসিয়া, ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের ইচ্ছায় ভারতীয় পর্ত্তুগীজগণের

সহিত যোগ দিতে লাগিল ; এবং স্থানীয় খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীরাও তাহাদের দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। এই দস্যুদল সেবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালেস্‌কে তাহাদের দলপতি নিযুক্ত করিয়া, সন্দীপ অধিকারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গঞ্জালেস্ সন্দীপ অধিকার করিয়া, তথাকার মোগল কর্ম্মচারী ও সেনাগণকে হত্যা করিয়া, ফতেহ্ খানের ব্যবহারের প্রতিশোধ লইল।

এই সময়ে গঞ্জালেসের অধীনে এক সহস্র পর্ত্তুগীজ, দ্বিগুণ সংখ্যক ভারতীয় সেনা, দুই শত অশ্বারোহী ও আশিটী সময়োচিত উৎকৃষ্ট কামানবাহী রণপোত ছিল।

আরাকাণ রাজের ভ্রাতা আনাপোরাস্ এই সময় গঞ্জালেসের সহিত যোগ দিয়া, তাহার হৃত-রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ও স্বীয় ভগ্নিকে জলদস্যু গঞ্জালেসের সহিত বিবাহ দিল।

১৬১০ খৃষ্টাব্দে আরাকাণ রাজের সহিত গঞ্জালেসের সন্ধি হইয়া গেল। তখন উভয় সেনা মিলিত হইয়া, মোগলগণকে বাঙ্গলা হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই প্রকারে উহারা মেঘনার পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী লক্ষ্মীপুর ও বুলোয়া বিনাযুদ্ধে অধিকার করিল। কিন্তু এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে মোগল সেনাগণ তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে প্রায় সমূলে ধ্বংস করিয়া, পলায়িত মগ ও পর্ত্তুগীজগণকে চট্টগ্রামের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়াছিল। রাজা অতি কষ্টে হস্তী আরোহণে নদী পার হইয়া প্রাণ বাঁচাইল। তৎপরে পর্ত্তুগীজেরা বা আরকাণ রাজা আর মস্তক উত্তোলন করে নাই।

পর বৎসর হিঃ ১০২০, ১৬১১ খৃষ্টাব্দে সুবাদার, তাঁহার বিখ্যাত যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ বিচক্ষণ সেনাপতি শোজায়াৎ খানকে, পাঠান-শার্দ্দূল কতলু খাঁর পুত্র ওসমান খানের দমনে প্রেরণ করিলেন। বীর কেশরী

ওস্‌মান তখন সুবর্ণ-রেখা নদীরতীরে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি প্রায় জলাভূমি হওয়ায়, তাহা মোগল অশ্বারোহীগণের পক্ষে যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত ছিল না।

সম্রাট সেনাধ্যক্ষ শোজায়াৎ খান, প্রথমতঃ ওস্‌মানের নিকট, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিবেন কি না জিজ্ঞাসু হইয়া, দূত প্রেরণ করিলেন! স্বাধীনচেতা গর্ব্বিত পাঠান বীর ওস্‌মান ঘৃণার সহিত বঙ্গেশ্বরের দূতকে ফিরাইয়া দিয়া, সেনাপতিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিয়া পাঠাইলেন।

দূত মুখে এই দাম্ভিকতা-পূর্ণ উত্তর শুনিয়া মহাসেনাপতি শোজায়াৎ খান অধীনস্থ সেনানীগণকে, পাঠানদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে অনুমতি দিলেন। অপর দিকে দুর্দ্ধর্ষ পাঠানেরাও বঙ্গেশ্বরের সেনাগণকে বাধা দিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইতে লাগিল।

ওস্‌মান, তাঁহার আক্রমণকারী সৈন্য শ্রেণীর সম্মুখে হস্তীযুথ সজ্জিত করিলেন। ইঙ্গিত মাত্র ঐ সকল পর্ব্বতাকার ভীমকায় মাতঙ্গের দল তাহাদের সম্মুখস্থ সমস্ত দ্রব্য ভূমিসাৎ করিতে করিতে, মোগল সেনার দিকে ধাবিত হইতে লাগিল।

মোগল বাহিনীর দক্ষিণ দিক, সেনাপতি সৈয়দ আদম্‌ ও বামদিক এফ্‌তেখার খান রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয় দিক হইতে রণক্ষেত্রে পাঠানগণকে বেষ্টন করিলেন। এই সময় যে মহারণ আরম্ভ হইল, তাহাতে পাঠান পক্ষের বিস্তর সেনানী মোগল তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী হইল।

মহাবীর ওস্‌মান এই অবস্থা দর্শনে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, তাঁহার তেজবান হস্তী "বখ্‌তের" পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, ঘোরতর যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং উৎসাহ বাক্য দ্বারা সেনাগণকে উৎসাহিত

করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই মহাবীর করীপৃষ্ঠ হইতে শর নিক্ষেপে যথাসাধ্য শত্রু বিনাশ করিতেছিলেন।

অবশেষে ওস্‌মান, মোগল সেনাপতি শোজায়াৎ খানের নিকটে পৌছিয়া, যে কোন প্রকারে উক্ত সেনাধ্যক্ষকে হস্তী পদতলে নিস্পেষিত করিবার জন্য মাহুতকে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে বলিলেন। শোজায়াৎ এই সময় পাঠান বীরের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় অশ্ববল্গা ফিরাইয়া পাঠান সেনাপতির হস্তী গাত্রে ভল্ল বিদ্ধ করিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া, হস্তীর শরীরের চারি স্থানে সাজ্ঘাতিক আঘাত করিলেন। সুশিক্ষিত রণহস্তী 'বখ্‌ত্‌' আঘাত-প্রাপ্তে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, সেনাপতি শোজায়াৎ খানকে আক্রমণ করিল ও অশ্ব সহিত তাঁহাকে ভূপতিত করিল।

বীর-পুঙ্গব শোজায়াৎ তাঁহার পতিত অশ্বের দেহ ভার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়াই সর্ব্বপ্রথমে হস্তীর সম্মুখের পদে, দুই স্থানে তরবারীর বিষম আঘাত করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাণ্ড ছুরিকা দ্বারা, তাহার শুণ্ডে আমূল বিদ্ধ করিয়া, ওস্‌মানের বাহনটিকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিলেন।

এই সময়ের মধ্যে শোজায়াতের অশ্ব উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং যেমন তিনি উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে যাইবেন, সেই সময়, বিপক্ষের অপর একটী হস্তী, অশ্ব সহিত তাঁহার পতাকা বাহীকে ভূপতিত করায়, তিনি পতাকা বাহীকে উৎসাহ দিয়া, তাহাকে টানিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মোগল সেনাগণের খড়্গ ও বর্শার অজস্র বর্ষণে, হস্তী পলায়ন করিল। সেনাপতি পতাকা-বাহীকে অপর একটী অশ্বে আরোহণ করাইয়া, তাহাকে ঐ-পতাকা ধরিতে দিলেন।

এই ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে একটী মোগল্ বন্দুকের গুলি সেই সময় পাঠান

সেনাপতি ওস্‌মানের ললাট বিদ্ধ করিল। বীরাগ্রগণ্য ওস্‌মান এই সাঙ্ঘাতিক আঘাতের গুরুত্ব অনুভব করিয়াও, প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল রণক্ষেত্রে স্বীয় সেনাগণকে শত্রু সংহারে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

অবশেষে হস্তীপৃষ্ঠে অজ্ঞান অবস্থায় পাঠান-কুল-গৌরব, বীর-কেশরী ওস্‌মান শিবিরে আনীত হইলেন। পাঠান সেনাগণ সেনাপতির হস্তী পশ্চাৎপদ হইতেছে দেখিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় অদম্য সাহসী বীর ওস্‌মানের প্রাণপাখী তাঁহার দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। ওস্‌মানের ভ্রাতা ওয়ালি খান এবং পুত্র মোম্‌রেজ, সেনাপতির মৃতদেহ লইয়া রাত্রিযোগেই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল।

এই অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর মোগল সেনাগণ এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রধান সেনাপতি শোজায়াৎ খানের হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া, তাহারা পাঠানগণের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইয়াছিল। অবশেষে মোয়াজ্জম্ খানের পুত্র আবদুল এস্‌লাম, কয়েকজন সেনানী ও ছয় শত অশ্বারোহী এবং চারিশত গোলন্দাজ সেনা লইয়া উপস্থিত হওয়ায়, মোগল সেনাপতি তাহাদিগকেই পাঠানগণের অনুসরণ করিতে বলিলেন।

পুনরায় এই নূতন সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় ওয়ালি খান অনন্যোপায় হইয়া, মোগল সেনাপতির নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন ও পরদিন মৃত সেনাপতির পুত্রগণ সমভিব্যাহারে মোগল শিবিরে উপস্থিত হইয়া, সেনাপতিকে ৪৯টী হস্তী ও অন্যান্য বহু মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করিলেন। শোজায়াৎ খান সমস্ত পাঠান বন্দিকে লইয়া, ৬ই শফর তারিখে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই মহাযুদ্ধ জয়ের পর সেনাপতি শোজায়াৎ খান, দিল্লীর দরবার হইতে "রোস্তমে জমান্" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (ওয়াকেয়াতে জাহাঙ্গিরী)।

সুবাদার এস্‌লাম খান অতীব সুখ্যাতির সহিত বাঙ্গালা সুশাসন

করিয়া, ১০২৬ হিঃ ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে রাজধানী ঢাকা নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন।

সুবাদার কাসেম্ খান

বাদশাহ্ তাঁহার এই শাসন্‌কর্ত্তার মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন ও তদীয় ভ্রাতা কাসেম্ খানকে তাঁহার স্থলে সুবাদার নিযুক্ত করিয়া, বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। নব-সুবাদার রাজমহলে পৌছিবার পর, এস্‌লামের পোষ্য-পুত্র করিম খানের সহিত তাঁহার একটু সংঘর্ষ হইয়াছিল।

বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবাদার কাসেম্ খানকে পর্ত্তুগীজ্ ও মগ দমনে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে আরাকাণ রাজ মোগল সেনার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিবার পর, পর্ত্তুগীজ দস্যুপতি গণজালেস্ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আরাকাণের নৌসেনার কাপ্তেনকে নিজের জাহাজে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমস্ত নৌবহর অধিকার করিয়া, সন্দ্বীপে দ্বীপে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। দুষ্টমতি গণ্জালেস্ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, ঐ সমস্ত অর্ণবপোত সাহায্যে, রাজার পরাজয়ের পর, আরাকাণ উপকূলের যে সকল বন্দর মোগলদিগের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা লুণ্ঠন করিতে ও সেই সমস্ত স্থানের গৃহগুলি দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

গঞ্জালেস্ ক্রমশঃ আরাকাণ নদীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অত্যাচার আরম্ভ করায়, ব্রহ্ম রাজসেনা কর্ত্তৃক তথা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। সেই সময় পর্ত্তুগীজ দস্যু দেখিতে পাইল যে—ইতিপূর্ব্বে তাহার যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে ব্রহ্মরাজের নিকট প্রতিভূ রাখিয়াছিল, মগেরা তাহাকে লৌহশলাকা বিদ্ধে হত্যা করিয়া, তাহার মৃতদেহ সেই অবস্থায় একটী উচ্চ

পাহাড়ের উপর প্রকাশ্য স্থানে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু দুর্ব্বৃত্তের নিষ্ঠুর হৃদয় ইহাতেও বিচলিত হইল না।

ইতিপূর্ব্বে দস্যুপতি গঞ্জালেস্ কখনও ভারতের পর্ত্তুগীজ রাজ-প্রতিনিধির কোন সন্ধান রাখে নাই, বা কখনও তাঁহার শরণাগত হয় নাই। কিন্তু এইক্ষণে সে বিস্তর প্রলোভন প্রদর্শনে ব্রহ্মদেশ জয়ের আশা দিয়া, গোয়ার পর্ত্তুগীজ রাজ-প্রতিনিধি ডন্ হিরোম্ ডি ম্যাজ্‌ভেডোর সাহায্য প্রার্থনা করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে একটী জাহাজ পরিপূর্ণ তণ্ডুল পাঠাইয়া দিল।

পর্ত্তুগীজ প্রতিনিধি, সিংহলের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা ডন্ ফ্রাণসিস্ ডি মেনিসেসের অধীনে চতুর্দ্দশটী যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিয়া, তাঁহাকে আরাকাণ আক্রমণের উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন।

১৬১৫ সালের ৩রা অক্টোবর ডন্ ফ্রাণসিস্ আরাকাণ নদীর ভিতর প্রবেশ করিলেন; এবং তথা হইতে গঞ্জালেস্‌কে সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে রাজা দিনেমারগণের সাহায্যে, তাহাদের জাহাজ লইয়া ডন্ ফ্রাণসিস্‌কে আক্রমণ করিলেন। সমস্ত দিন নৌযুদ্ধের পর কোন পক্ষের জয়-পরাজয় বোঝা গেল না।

নবেম্বরের মধ্যভাগে গঞ্জালেস্ ৫০ খানি জাহাজ লইয়া, পর্ত্তুগীজ কাপ্তেনের সহিত যোগ দিল। তখন ডন্ ফ্রাণসিস্ সমস্ত পর্ত্তুগীজ জাহাজ লইয়া আবার শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন। সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল; এমন সময় একটী বন্দুকের গুলি লাগিয়া কাপ্তেন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই সঙ্গে দুই শত পর্ত্তুগীজ ডন্ ফ্রাণসিস্ যোদ্ধা নিহত হওয়ায়, গঞ্জালেস্ পলায়নের পথ দেখিতে লাগিল ও সন্দীপে সরিয়া পড়িল।

পর বৎসর আরকাণ রাজ সন্দীপ অধিকার করিল ও মোগলদিগের

অধিকারভুক্ত সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানগুলি মধ্যে মধ্যে লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

সুবাদার কাসেম্‌ খান তৎকালে আরাকাণ রাজের সেনাগণকে রাজ্যের এই দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে না পারায়, সম্রাট দারুণ অসন্তুষ্ট হইয়া, ১০২৭ হিঃ ১৬১৮, খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজধানীতে ডাকিয়া লইলেন।

এব্রাহিম খান ফতেহ্‌ জঙ্গ

অতঃপর দিল্লীশ্বর নূরুদ্দীন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্‌, এব্রাহিম খানকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। এব্রাহিম্‌ খান সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের কনিষ্ঠ ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং উপর্য্যুপরি কয়েকটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া "ফতেহ্‌ জঙ্গ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে আফ্‌জাল খান বেহারের শাসনকর্ত্তা থাকায়, বেহারের উপর এই নব-নিযুক্ত সুবাদারের হস্তার্পণ করার কোন ক্ষমতা দেওয়া হইল না। তবে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিয়োগের ভার তাঁহার হস্তে রহিল।

সুবাদার এব্রাহিম খান ফতেহ্‌ জঙ্গ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ বেগের উপর উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ করিলেন এবং স্বীয় দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র বালক সয়েফ্‌ উল্লাহ্‌কে বর্দ্ধমান অঞ্চলের জায়গীরদার নিযুক্ত করিলেন।

এই সুবাদারের উপযুক্ত শাসনাধীনে বাঙ্গালা সর্ব্বপ্রকারে উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির দিকে সুবাদার এব্রাহিমের সর্ব্বক্ষণ সুদৃষ্টি থাকায়, দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল। বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা বিভাগের প্রজাবর্গের সুখ-সচ্ছন্দের

সীমা রহিল না। এই সময় ঢাকার মস্‌লিন ও মাল্‌দহের রেশমী বস্ত্র, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট প্রকারের প্রস্তুত হইতে ছিল। দিল্লীর দরবারের প্রধান পোষাক বাঙ্গালায় প্রস্তুত বহুমূল্য সুদৃশ্য বস্ত্র হইতেই প্রস্তুত হইতে লাগিল।

১৬২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর লোক সুরাট হইতে আগ্রায় গিয়া, সম্রাটের অনুমতি গ্রহণে পাটনায় আসিয়া বস্ত্র ক্রয় করিতে থাকিলেন ও বাণিজ্যের জন্য কুঠি নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু হাঁটা পথে আসিয়া এতদূর ব্যবসা করা লাভজনক নহে বিবেচনায় কোম্পানি, পর বৎসরেই এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

এব্রাহিমের শাসনকালে আফগানগণ সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ হইয়া পড়ায় ও আসামের শত্রুগণ বিতাড়িত হওয়ায়; এবং সঙ্গে সঙ্গে আরাকাণের জল-দস্যুগণের উপর রাজকীয় নৌবহর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখায়, তৎকালে বাঙ্গালার প্রজাবর্গ সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ অবস্থায় বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার অদৃষ্ট অধিক দিন সুপ্রসন্ন রহিল না। এই শান্তিময় দেশে বাদশাহ্-পুত্র কুমার খোর্‌রম অচিরে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিলেন।

দিল্লীশ্বর নূরুদ্দীন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হিঃ ১০২৫ সালে স্বীয় তৃতীয় পুত্র বীরবাহু খোর্‌রম্‌কে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরে সম্রাট তাঁহার এই পুত্রের বীরত্বের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে "শাহ্‌ জাহান" (পৃথ্বীরাজ) আখ্যায় আখ্যায়িত করিলেন।

১০২৯ হিঃ ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ভূস্বর্গ কাশ্মীর-উপত্যকার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে থাকা কালে, দক্ষিণাপথের রাজন্যবর্গ ৬০,০০০ সহস্র অশ্বারোহী সহ বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করায়, শাহজাহান মাত্র ৪০,০০০ অশ্বারোহী লইয়া উহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া, তাহাদিগকে

তাহাদের বাকী রাজস্ব পর্য্যন্ত মিটাইয়া দিতে বাধ্য করিলেন। এবং সেই সময় হইতে তাহাদের রাজস্ব, বাৎসরিক ৫৫ লক্ষ টাকা ধার্য্য করিয়া দিলেন।

১৬২১ খৃষ্টাব্দে ১০৩১ হিঃ সম্রাটের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভঙ্গ হইতে থাকে। এই সময় কুমার শাহ্ জাহান দেখিলেন যে—যেমন এক পক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সোল্‌তান পর্ব্বেজ জীবিত থাকিতে তাঁহার সম্রাজ্য প্রাপ্তির কোন আশা নাই, তদ্রূপ অপর পক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন যে—তাঁহার বিমাতা সম্রাট-প্রিয়া নূরজাহান, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ্রিয়ারকেই অধিকতর স্নেহের চক্ষে দেখেন; এবং সম্রাটের মৃত্যুর পর তিনি শাহরিয়ারকেই সিংহাসনোপবিষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন।

শাহ্ জাহান এই সময় গাঙ্গাম্ অঞ্চলে বারহাম্‌পুরে অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থানেই তিনি ১০৩১ হিজরীর ৭ই জমাদিয়ল আখের তারিখে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া, আপনাকে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

তৎপরে শাহ্ জাহান দিল্লীর সন্নিকটে আগমন করিয়া পিতাকে পত্র লিখিয়া অবগত করাইলেন যে—তিনি নিম্নলিখিত সর্ত্ত চতুষ্টয়ে সম্মত হইলে তিনি পিতৃ আদেশক্রমে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য আছেন—

১। তাঁহাকে সমস্ত সম্রাট সৈন্যের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিতে হইবে।

২। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ, রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য তাঁহার আদেশানুসারে নির্ব্বাহ করিবেন।

৩। রাজকীয় অস্ত্রাগার ও বারুদ এবং গুলি গোলার কারখানার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

৪। রণতম্বরের দুর্ভেদ্য পার্ব্বতীয় দুর্গ, তাহার স্ত্রী পুত্রগণের নিরাপদে রক্ষার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর পুত্রের এই প্রগল্‌ভ প্রস্তাবে অতিশয় রুষ্ট হইয়া, শাহ্‌জাহানকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া প্রচার করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি রাজকোষে জব্দ করিবার অনুমতি দিলেন। অতঃপর সম্রাট তাঁহার সমস্ত রাজভক্ত প্রজাবৃন্দকে তাঁহার সিংহাসন রক্ষার্থে আহ্বান করায়, অচিরে ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার পতাকাধীনে সমবেত হইল ও এই সেনা সমভিব্যাহারে পুত্র শাহ্‌জাহানের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধযাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময় সম্রাট, পুত্রের অধীনস্থ বিদ্রোহী সেনাগণকে আক্রমণ করিবার জন্য নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী আসফ্‌ জাহ্‌ তাঁহাকে আরও অধিক সেনা সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করায়, বাদসাহ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ পর দিবস তাঁহার প্রসিদ্ধ সেনাপতি মোহাব্বত খান, পাঞ্জাব হইতে অনেক সেনা সহ রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সম্রাট এই সম্মিলিত সৈন্য লইয়া তোগ্‌লকাবাদে বিদ্রোহী সেনাগণকে আক্রমণ করিলেন। বিদ্রোহীগণ সম্রাটের সংযুক্ত সেনার নিকট অল্পক্ষণ মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল ও কুমার শাহ্‌জাহান দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন।

সেনাপতি মোহাব্বত খান ও সোল্‌তান পরবেজ শাহ্‌জাহানকে নর্ম্মদা তীর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যাইবার পর ঐ স্থানে উভয় সৈন্যে একটী খণ্ডযুদ্ধ হইল। শাহ্‌জাহান পুনরায় পরাজিত হইয়া গোলকুণ্ডায় পলায়ন করিলেন।

গোলকুণ্ডায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া কুমার, তাঁহার ছত্রভঙ্গ সেনাগণকে আবার একত্রীভূত করিলেন; পরে বাঙ্গালা আক্রমণের জন্য

উড়িষ্যার পথে সসৈন্যে বহির্গত হইলেন। এই সময় উৎকলাধিপতি আহমদ বেগ, মাড়ওয়ারের রাণার দৌহিত্র ও সম্রাট আকবরের প্রিয় পৌত্র মহারথী কুমার শাহ্‌জাহানের গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

কটকে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া এবং কুলিখানকে তথাকার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া শাহ্‌জাহান, বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক পাঠান নায়ক সসৈন্যে কুমারের সহিত মিলিত হইল। এই স্থান হইতে শাহ্‌জাহান হুগলীতে পর্ত্তুগীজ সর্দ্দার মেকাইল রড্রিজের নিকট তাঁহার পাশ্চাত্য ধরণের কয়েকটী কামানের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার যাচ্ঞা ব্যর্থ হইল। পরে শাহ্‌জাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর, রড্রিজের এই অবাধ্যতার প্রতিফল, পর্ত্তুগীজগণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হুগলীবাসিগণকে পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল।

বঙ্গের শাসনকর্ত্তা এব্রাহিম খানের অধিকাংশ সেনা এই সময় চট্টগ্রাম অঞ্চলে মগ দস্যু দমনে নিযুক্ত থাকায়, তাঁহাকেও একটু বিপন্ন হইতে হইল। যাহা হউক বঙ্গেশ্বর সসৈন্যে ঢাকা হইতে রাজমহলে আসিয়া তথায় শিবির সংস্থাপন করিলেন।

এই সময় যুদ্ধ-বিদ্যা-সুনিপুণ শাহজাহান দেখিলেন যে—বিলম্বে তাঁহার সকল আশা ভরসা পণ্ড হইয়া যাইবে। তখন তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া বঙ্গের সুবাদারকে আক্রমণ করিলেন। এব্রাহিম খান ঐ অবস্থায় রাজমহল রক্ষা করা তাঁহার ক্ষমতাতীত বিবেচনা করিয়া, সুরক্ষিত তেলিয়াগড়ী দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এই সময়ে ঐ দুর্গ প্রাচীরের উপরিভাগে কয়েকটী কামান সজ্জিত ছিল। পরে সুবাদার ঐ দুর্গ একজন অধীনস্থ সেনানীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া, সসৈন্যে গঙ্গার পরপারে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

শাহ্‌জাহান, সুবাদারকে বঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, পরিবারবর্গসহ দিল্লী যাত্রা করিবার বা তাঁহার অধীনস্থ হইয়া, নিজের পছন্দ মত যে কোন জেলা লইয়া তথায় সুখে বাস করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। কিন্তু মহানুভব সুবাদার এবরাহিম খান ফাতেহ্‌ জঙ্গ তদুত্তরে লিখিলেন যে—

"বাদশাহ তাঁহার উপর এই দেশ, এবং ইহার প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার দেহে প্রাণ থাকিতে বাঙ্গালা, সেই বাদশাহ্‌ ভিন্ন অপর কাহারও অধীনতা স্বীকার করিবে না।"

সুবাদার এই সময় বিপক্ষের নদী পারাপারে বিঘ্ন জন্মাইবার অভিপ্রায়ে, পূর্ব্বাহ্ণে সমস্ত নৌকা আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কুমারের অধীনস্থ সেনানী দরিয়া খান, তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত ভাগলপুরের কতিপয় জমিদারের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া, তাহাদের জলমগ্ন করিয়া রাখা লুক্কায়িত নৌকাগুলি হস্তগত করিয়া, তৎসাহায্যে কুমার শাহ্‌জাহানের অশ্বারোহীগণকে নদী পার করাইতে লাগিলেন।

সুবাদার এব্রাহিম এই অবস্থা দর্শনে তেলিয়াগড়ী দুর্গ হইতে সৈন্য অপসারিত করিয়া লইয়া, বিদ্রোহীগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ বেগ এই সময় ভীষণ বেগে শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের পরাক্রমে আহমদ পশ্চাৎপদ হইতেছেন দেখিয়া সুবাদার স্বয়ং দ্বিতীয়দল লইয়া অগ্রসর হইলেন। এই সময় সুবাদারকে তাঁহার বন্ধুবর্গ যুদ্ধ ক্ষেত্রে এরূপ প্রকাশ্য স্থানে যাইতে নিষেধ করায়, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—

"আমার জীবনের কোনই মূল্য নাই, যদি আমি ইহাকে আমার প্রভু দিল্লীশ্বরের কার্য্যে না লাগাইতে পারি। আমি হয় যুদ্ধে জয়লাভ করিব, নতুবা জীবনপাত করিব।"

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ সুবাদার অশ্বারোহণে শত্রুব্যূহ মধ্যে

প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে তিনি চতুর্দ্দিকে শত্রু সৈন্য বেষ্টিতাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে রুধিরাক্ত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের সেনাগণ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অতঃপর শাহ্‌জাহান পুনরায় গঙ্গা পার হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে—তাঁহার স্থপতি সেনানী রুমী খান, বিস্ফোরক সাহায্যে তেলিয়াগড়ীর দুর্গ-প্রাকারে একটী বিংশতি গজ পারমিত স্থান ভঙ্গ করিয়া, দুর্গ প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

তেলিয়াগড়ীর দুর্গাধিকার ও বঙ্গ-বেহারের সুবাদারের মৃত্যুতে, বঙ্গের ভাগ্য আবার পরিবর্ত্তিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জমিদার ও রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ সোল্‌তান শাহ্‌জাহানের বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ সর্গ

শাহ্‌জাহান ১৬২২ খৃষ্টাব্দ

কুমার শাহ্‌জাহান এই যুদ্ধ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গেশ্বরের সেনাগণকে তাড়াইয়া দিয়া, তাহাদের সমুদয় নৌকাগুলি অধিকার করিলেন, এবং ঐ নৌকা যোগে তাঁহার উৎকৃষ্ট সেনাগণকে বাছিয়া লইয়া, নদী বহিয়া ঢাকায় গিয়া পৌছিলেন। সুবাদার এব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র ভূতপূর্ব্ব উৎকল-রাজ আহমদ বেগ, সম্রাট তনয়ের সেনাগণকে বাধা দেওয়া নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া, কুমারকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। তৎসঙ্গে তাঁহার সমস্ত হস্তী, অশ্ব ও রাজকোষ হইতে চল্লিশ লক্ষ টাকা কুমারের হস্তে প্রদান করিলেন।

অতঃপর বাদশাহ্‌-নন্দন সমুদয় রাজ কর্ম্মচারীগণকে ডাকাইয়া, তাহাদিগকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে পুনঃ নিযুক্ত করিলেন; এবং জমিদারগণকে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের অধিকৃত জায়গীর প্রত্যার্পণ করিয়া ও খান-খানান পুত্র দারাবকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া, বিশ্বাসের প্রতিভূস্বরূপ তাঁহার পুত্রকে স্বীয় সেনাদলে নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে রাখিয়া দিলেন।

ঢাকায় কিছুদিন বিশ্রামের পর শাহ্‌জাহান, পাটনায় আগমন করিলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা পাইয়া, কুমার আহমদ বেগের জায়গীর ভুক্ত উক্ত ভূখণ্ডের শাসনকর্ত্তা মোখ্‌লেছ খান্‌ এলাহাবাদে পলাইয়া গেলেন।

শাহজাহান এইবার বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় প্রসিদ্ধ রোটাস্‌ দুর্গাধিপতি সৈয়দ মোবারক সম্রাট পুত্রের সম্মুখীন হইয়া, তাঁহার অজেয় দুর্গের চাবি স্বইচ্ছায় তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। শাহজাহান এই দুর্গ মধ্যে তাঁহার স্ত্রী পুত্রগণকে একজন বিশ্বস্ত অনুচরের তত্ত্বাবধানে রক্ষা করিলেন। এই রোটাস্‌ দুর্গে এই সময় তাঁহার পুত্র মোরাদ বক্স জন্মগ্রহণ করেন।

ব্যেরাম বেগকে বেহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, কুমার শাহজাহান তাঁহার সৈন্য শ্রেণী তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। এবং আবদুল্লা খানকে এক তৃতীয়াংশের অধিনায়ক করিয়া এলাহাবাদ অধিকার করিতে ও দরিয়া খানকে অপর তৃতীয়াংশ সেনা সহ অযোধ্যা জয়ে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া বেনারস ও জৌনপুরের দিকে যাত্রা করিলেন।

এই সময় কুমার পর্‌বেজ ও মোহাব্বত খান, বঙ্গে শাহ্‌জাহানের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে, বেরার ও মালওয়ার মধ্য দিয়া এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন ও তথায় আদ্যন্ত সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে আবদুল্লা খান গঙ্গা পার হইয়া, রোস্তম বেগকে তাড়াইয়া দিয়া এলাহাবাদ নগর অধিকার করিয়াছিলেন। অপরদিকে দরিয়া খানও অযোধ্যার পথে যাইতে যাইতে, বিনা বাধায় জৌনপুর অধিকার করিয়া বসিলেন। কুমার শাহজাহান স্বয়ং গিয়া বেনারস করায়ত্ত করিলেন।

কিন্তু দিল্লীর সেনাগণের আগমন বার্ত্তা পাইয়া, কুমারের উভয় সেনাপতি তাঁহাদের অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া, পশ্চাৎপদ হইয়া সসৈন্যে শাহ্‌জাহানের নিকট চলিয়া আসিলেন। তখন সম্রাট-নন্দন তাঁহার সমুদয় সৈন্য লইয়া, এলাহাবাদ হইতে কয়েক মাইল পূর্ব্বে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন ও নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন; এবং পিতৃ সেনাগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সম্রাটের সেনাগণ যমুনা পার হইয়া, বিদ্রোহীগণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল। তৎপরে দূর হইতে কামানের গর্জ্জনের সহিত ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই অবস্থায় সেনাপতি মোহাব্বত খান, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণকে বিদ্রোহী সেনা অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক বিবেচনা করিয়া, তাহার কিয়দংশ সৈন্য টন্‌সি নদী পার হইয়া বিদ্রোহীগণকে পরিবেষ্টন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই কুমার শাহ্‌জাহান পিতৃ-সেনা কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া পড়িলেন। এই সময় সাহসী বীর শাহজাহান অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শনে মাত্র পাঁচ শত অশ্বারোহী সহ শত্রু সৈন্যের ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তাঁহার অশ্ব পতিত হওয়ায়, কয়েকজন অনুচরের পরামর্শে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোটাস্‌ দুর্গে পলাইয়া গেলেন।

সম্রাট সেনাও এই যুদ্ধে অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়ায়, এবং অনেক দূর চলিয়া আসিবার কারণে তাহাদের অশ্বগুলি নির্জ্জীব প্রায় হওয়ায়, সোলতান পর্‌বেজ তদীয় ভ্রাতার পশ্চাদ্ধাবন করা আর যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। ইত্যবসরে শাহ্‌জাহান রোটাস্‌ দুর্গ হইতে সপরিবারে পাটনায় গিয়া পৌঁছিলেন, এবং ঢাকা হইতে তাঁহার শাসনকর্ত্তা দারাব্‌ খানকে তাঁহার সহিত সত্বর মিলিত হইবার আদেশ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ দারাব দুরভিসন্ধি বশতঃ ঢাকা পরিত্যাগ করিলেন না। এই ব্যাপারে রাগান্ধ হইয়া আবদুল্লা খান, কুমার শাহজাহানের বিনানুমতিতে গুপ্তভাবে দারাবের সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী পুত্রটীকে হত্যা করিয়াছিল।

সম্রাট সেনা কিয়দ্দিবস বেনারসে অবস্থান করিয়া শ্রম দূর করার পর, বঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা পাটনায় পৌঁছিলে, শাহ-জাহান এতাধিক সৈন্যের বিরুদ্ধে নগর রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা

করিয়া, নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজমহলে চলিয়া গেলেন। ক্রমে তথা হইতেও বিতাড়িত হইয়া, যে পথ অবলম্বনে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে আবার দাক্ষিণাত্যের দিকে যাইতে লাগিলেন।

এই সময় ভুবন বিখ্যাত সম্রাট আক্‌বরের বাল্য জীবনের অভিভাবক বায়রাম খানের পৌত্র বঙ্গের শাসনকর্ত্তা দারাব খান, তদীয় পিতা খান খানান সম্রাট দরবারে একজন বিশিষ্ট ওম্‌রাহ্‌ থাকার আশায় আশান্বিত হইয়া, সাহায্য প্রাপ্তির অভিলাষে সোলতান পর্‌বেজের নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। সম্রাট-তনয় পরবেজও পিতার নিকট, তাঁহাকে ক্ষমা করিবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বীয় বিদ্রোহী পুত্র খস্‌রুর (শাহ্‌জাহান) পক্ষাবলম্বী সমস্ত লোককেই নিহত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায়, দারাব খানকে ক্ষমা করিতে সম্মত না হইয়া, বরং ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকে রাজ-দ্রোহিতার প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করাইবার জন্য, দারাবের ছিন্ন মস্তক সত্বর দিল্লীর দরবারে প্রেরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, সোলতান শাহজাহান, পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আশায়, অতিশয় নম্রতার আশ্রয় লইয়া পিতাকে একখানি অনুতাপ প্রকাশক পত্র লিখিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর পুত্রের পত্র প্রাপ্তে অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

বাদশাহ-তনয় শাহজাহানের বঙ্গ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট, তদীয় সেনাপতি মোহাব্বত খানকে ঐ প্রদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য অনুমতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরে পুনরায় ঐ কর্ম্মকুশল সেনা-পতিকে পুত্রের অনুসরণ করিতে অনুমতি দিয়া, তাঁহার পুত্র খানেজাদ্‌ খানকে বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

খানেজাদ্, হিজরী ১০৩৫ সালে ইচ্ছাপূর্ব্বক সুবাদারের পদ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে চলিয়া যান।

তৎপরে সম্রাট, মোকার্‌রম খানকে বাঙ্গালার ও মির্জ্জা রোস্তমকে বেহারের সুবাদার পদ প্রদান করিয়া, দিল্লী হইতে সনন্দ পাঠাইয়া দিলেন। মোকার্‌রেম্ দিল্লীশ্বরের পত্র বাহক দূতের প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন ইচ্ছায়, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য, একটী বৃহৎ নৌকারোহণে যাইতে থাকা কালে, নদীপথে নৌকা ডুবিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইহার পর এক বৎসরের জন্য, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষ পর্য্যন্ত (১৬২৮ খৃঃ ১লা ফেব্রুয়ারী) ফেদায় খান বাঙ্গালার সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, সম্রাটকে ঐ সময়ের মধ্যে বিস্তর হস্তী, রেশমী বস্ত্র ও ঢাকাই মস্‌লিন প্রভৃতি উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ

কাসেম খান জবুনী

শাহাব উদ্দীন মোহাম্মদ শাহজাহান, ভারতের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ফেদায় খানকে পদচ্যুত করিয়া, তাঁহার স্থানে স্বীয় প্রিয় পাত্র কাসেম্ খানকে বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করিলেন।

কাসেম্ খান দেখিলেন যে—পর্ত্তুগীজেরা তাঁহার রাজত্বের নানাস্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া, অর্দ্ধ-স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিতেছে ও সময় সময় তাহারা এমন কি সুবাদারের আজ্ঞার প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। এই অবস্থা দর্শনে সুবাদার কাসেম্ সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া, পর্ত্তুগীজগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য দিল্লীশ্বরের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট, পিতৃ-বিদ্রোহী হইয়া একদা পর্ত্তুগীজ সর্দ্দার মেকাইল রেড্রিজের সাহায্য চাহিয়াছিলেন, এবং সেই সর্দ্দারের নিকট হইতে যেরূপ তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক প্রত্যুত্তর পাইয়াছিলেন, তাহা এই ব্যাপারে সম্রাটের মনে উদিত হইল। তখন তিনি পর্ত্তুগীজগণকে বঙ্গদেশ হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

এই সময় পর্ত্তুগীজেরা ভাগীরথির পশ্চিম-দক্ষিণ তীরবর্ত্তী হুগলী নগরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া, সৈন্য সামন্ত লইয়া তথায় অবস্থান করিতেছিল। ১০৪১ হিঃ ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে সুবাদার কাসেম্ খান দিল্লীশ্বরের

অনুমতি পাইয়া, সেনাপতি বাহাদুর খানকে সসৈন্যে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। অপর একদল সেনা স্বীয় পুত্র এনায়েত উল্লার অধীনে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া, খাজা শেরের অধীনে একদল সৈন্য জলপথে হুগলীর দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। খাজা শেরের উপর সুবাদারের এই আদেশ রহিল যে—তিনি পর্ত্তুগীজদিগের জলপথে পলায়ন পথ ও বাহির হইতে জলপথে তাহাদের সাহায্যের পথ অবরুদ্ধ করিয়া থাকিবেন।

২ রা জেলহজ্জ তারিখে মোগল সৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে হুগলী অবরোধ করিল। পর্ত্তুগীজেরা তাহাদের তিন মাস অবরোধ কালের মধ্যে, ভিতর হইতে মাঝে মাঝে বন্দুকের গুলিতে সুবাদার সেনাগণকে উত্যক্ত করিতে ছিল। অবশেষে ১০৪২ হিজরীর ১৪ রবিওল্ আউওল তারিখে সেনাপতি বাহাদুর খান কাম্বু, পর্ত্তুগীজদিগের একটী বুরুজ বিস্ফোরক সাহায্যে উড়াইয়া দিয়া, অনেক পর্ত্তুগীজের প্রাণনাশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মোস্লেম সেনাগণ চতুর্দ্দিক হইতে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণের ফলে বহু পর্ত্তুগীজ প্রাণ হারাইল। যে সকল পর্ত্তুগীজ জাহাজে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, খাজা শের তাহাদিগকেও জলে ডুবাইয়া মারিল। পর্ত্তুগীজদিগের একখানি বৃহদায়তন জাহাজে প্রায় দুই সহস্র ২০০০ নর নারী, তাহাদের ধন সম্পত্তি লইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। ঐ জাহাজখানি মোগল সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, জাহাজের কাপ্তেন জাহাজের বারুদ খানায় অগ্নি সংযোগ করিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত আরোহীকে শেষ করিয়া দিলেন।

পর্ত্তুগীজদিগের ৬৪ খানি বৃহৎ জাহাজ ৫৭ খানি ক্ষুদ্রায়তন ও তৎসহ দুই শত ছোট এক মাস্তুলের শ্লুপ জাহাজের মধ্যে, কেবল মাত্র একখানি ক্ষুদ্র গ্রাব ও দুইখানি শ্লুপ, গোয়ায় ফিরিয়া যাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

সুবাদার সেনাগণের প্রস্তুত নৌসেতুর মধ্যে কয়েকখানি নৌকা প্রজ্জ্বলিত পর্ত্তুগীজ জাহাজের অগ্নি সংযোগে পুড়িয়া না গেলে, তাহাদের এই তিন খানি তরণীও ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হইত না।

পর্ত্তুগীজদিগের সমস্ত সম্পত্তি মোগল সেনার হস্তগত হইল। এবং এই রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীগণের গির্জ্জা মধ্যস্থ সমস্ত দেবমূর্ত্তি ও তস্‌বির (যাহার, বিশেষতঃ এই একেশ্বরবাদী খৃষ্টানগণের ভজনালয়ে দেব দেবীর প্রতিমা রক্ষার বিষয় অবগত হইয়া, সম্রাটের বঙ্গবিজয় কালে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মোম্‌তাজ মহল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন) মোসলমানগণ ভগ্ন ও নষ্ট করিয়া দিল।

প্রায় চারি সহস্র চারিশত ৪,৪০০ পর্ত্তুগীজ নরনারী মোস্‌লেম সেনাগণের হস্তে বন্দি হইল। তন্মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া পাঁচ শত সুদর্শন অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক ও বালক আগ্রায় প্রেরিত হইল। আগ্রায় গিয়া যুবতীগুলি সম্রাট প্রাসাদে ও ওম্‌রাহগণের গৃহে স্থান পাইল; এবং বালক গুলিকে ত্বকছেদ করিয়া মোসলমান করা হইল। অবশিষ্ট বন্দি গুলিকে কিছুদিন আবদ্ধ রাখিবার পর, সম্রাট তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া গোয়ায় পাঠাইয়া দিলেন।

এইক্ষণ হইতে হুগলী বঙ্গদেশের একটী বন্দরে পরিণত হইল ও সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম) হইতে সমস্ত সরকারী দপ্তর খানা হুগলীতে উঠাইয়া আনা হইল।

ইহার কিছুদিন পরে ঢাকার সুবাদার কাসেম খানের মৃত্যু হয়। ঢাকা নগরের মোসলমানগণ সুবাদারের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। কাসেম্‌ খান একপক্ষে যেমন ধাম্মিক তদনুরূপ বিদ্যানুরাগীও ছিলেন। নিজে তিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানী, সম্রাট শাহ্‌জাহানের নিকট হইতে

ফর্ম্মান পাইয়া, প্রথমতঃ বালেশ্বরের নিকট সমুদ্র তীরবর্ত্তী পিপ্‌লে বন্দরে কুটী নির্ম্মাণ করেন।

সম্রাট শাহজাহান কাসেম্ খানের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, জনৈক সদ্বংশ জাত আজিম খানকে বাঙ্গালার সুবাদার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এই সুবাদার বঙ্গদেশের ন্যায় প্রকাণ্ড দেশ শাসনের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া, এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা করিয়া দিলেন ও তাঁহার স্থানে এস্‌লাম্ খান মুশিদীকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা থাকা কালে বাদশাহ্, আজিম খানের কুল-মর্য্যাদার বিশেষরূপে পরিচয় লইয়া, তাঁহার কন্যার সহিত স্বীয় পুত্র কুমার সুজাআর বিবাহ দিয়াছিলেন।

এস্‌লাম খান মুশিদী

ইনি একজন রাজনীতিজ্ঞ ও সময়োপযোগী প্রবীণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আবার যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেই তিনি অধিক আনন্দ বোধ করিতেন।

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের মগ-শাসনকর্ত্তা মেকাত্‌রে মোগল আক্রমণের ভয়ে, ভারত সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেন। মেকাত্‌রে ঢাকায় আগমন করিয়া সম্রাট প্রতিনিধির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এস্‌লাম খান তাঁহার নিজ নামানুসারে চট্টগ্রামের নাম "এস্‌লামাবাদ" রাখিয়া দিলেন।

এই বৎসরেই আসামীরা প্রায় পাঁচশত নৌকাযোগে বহু সেনা লইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ বাহিয়া বাঙ্গালা দেশে প্রবেশ করে ও নদের তীরবর্ত্তী গ্রাম ও নগর সকল লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দেয়। এই প্রকারে তাহারা, ঢাকার প্রায় নিকটবর্ত্তী হইলে, সুবাদারের রণতরী গুলি আসামীগণকে আক্রমণ

করিয়া, কামানের গোলায় তাহাদের নৌকাগুলি ডুবাইয়া দিতে ও কোন কোনটিকে অগ্নি সংযোগ করিয়া নষ্ট করিয়া দিতে লাগিল। নৌসেনার মধ্যে যাহারা তীরে উঠিতে পারিয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই মোগল অশ্বারোহীর তরবারি ও বর্শার আঘাতে ধরাশায়ী হইল।

সুবাদার এস্‌লাম খান, অবশিষ্ট পলায়িত শত্রুগণকে তাহাদের দেশ পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। আসামে প্রবেশ করিয়া বঙ্গেশ্বর, তাহাদের পঞ্চদশটী দুর্গ অধিকার করিলেন; পরে অনেক ধন রত্নাদি সহ প্রত্যাবর্ত্তন কালে, কুচবেহার করায়ত্ত করিয়া, বর্ষার প্রারম্ভেই রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

ঢাকায় আসিয়া সুবাদার আদেশ পত্র পাইলেন যে—বাদশাহ্‌ তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব পদ দিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি করিয়াছেন; এবং তাঁহার স্থলে নওয়াব সায়েফ খানকে সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছেন। কিছুদিন পরে আবার দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হইয়া গিয়া, তথায় খৃঃ ১০৫৮ সালে, এস্‌লাম খানের মৃত্যু হয়।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

সোলতান মোহম্মদ সুজাআ—রাজমহল

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র চতুর্বিংশতি বর্ষের যুবক সোলতান সুজাআ, বাঙ্গালার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু পিতা, ভয়ে পুত্রকে বাঙ্গালা-বেহার-উড়িষ্যা তিনটী প্রদেশের অধিকার না দিয়া, শায়েস্তা খানকে বেহার বিভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সোলতান সুজাআ রাজধানী, ঢাকা হইতে আবার রাজমহলে উঠাইয়া আনিয়া, উহার নাম আকবর নগর রাখিলেন ও তথায় অতি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদাবলী নির্ম্মাণ করাইলেন। রাজা মানসিংহের সময়ের দুর্গ-প্রাকার তিনি আরও সুদৃঢ় করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পর বৎসরই অগ্নিদাহে নগরের প্রধান প্রধান সুদৃশ্য প্রাসাদগুলি নষ্ট হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়া গেল। গঙ্গার স্রোতের গতিও হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া, নগরের সৌন্দর্য্যের অবশিষ্টাংশ নষ্ট করিয়া দিল।

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্‌ শাহজাহানের একটী অল্প বয়স্কা কন্যা, পরিহিত বস্ত্রে অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় সম্রাট, মন্ত্রী আসাদ খানের অনুরোধে ইংরাজ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইবার জন্য, সুরাটে লোক প্রেরণ করিলেন। এই সময় ভারতেশ্বর দক্ষিণাপথে দেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। হোরওয়েল্‌ জাহাজের ডাক্তার মিষ্টার গ্যাব্‌রাইল বাউটন্‌

সত্বর সম্রাট শিবিরে উপস্থিত হইলেন। এবং অল্পদিন মধ্যেই সম্রাট নন্দিনীকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিতে কৃতকার্য্য হইলেন।

এই ঘটনার পর বাদশাহ্ ডাক্তার বাউটনের অনুরোধে ইংরাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিনা শুল্কে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

পর বৎসর বাউটন্, কুমার মোহম্মদ সুজাআর রাজধানী রাজমহলে গিয়া, সুবাদারকে তাঁহার সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। এই সময় হেরেমের জনৈক মহিলার পাঞ্জরের বেদনা আরোগ্য করায় তিনি, সুবাদার কর্ত্তৃক অতি সাদরে গৃহীত হইলেন।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে হোরওয়েল্ অর্ণবপোতে মিষ্টার ব্রিজম্যান নামক একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ইংলণ্ড হইতে আসিয়া ডাঃ বাউটনের সহিত রাজমহলে সাক্ষাৎ করিলেন। তৎপরে ক্রমে উভয়ে অনুরোধ করিয়া সুবাদারের নিকট হইতে বালেশ্বর ও হুগলীতে কুটী নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি গ্রহণ করিলেন।

১৬৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আট বৎসর কাল সম্রাট-কুমার সুজাআ, ন্যায় বিচার ও অতিশয় যোগ্যতার সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। শেষে বাদশাহ নিজ অভ্যাস মত পুত্রের হস্তেও অধিক ক্ষমতা দিতে ইতস্ততঃ করিয়া, পুত্রকে দেখিবার ভান করিয়া, তাঁহাকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি করিলেন, এবং তাঁহার স্থানে নওয়াব এতেকাদ খানকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

সম্রাট এই সময় লাহোরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তথায় পুত্রকে অতি সাদরে গ্রহণ করিয়া, কয়েক মাস পরেই তাঁহাকে কাবুলের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

সোলতান সুজাআ অতিশয় ধর্ম্মভীরু, সত্যবাদী ও তাঁহার অগ্রজ

দারার ন্যায় সচ্চরিত্র এবং শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার বন্ধু-বর্গের সহিত ব্যবহারে তিনি উদারতার পূর্ণ অবতার ছিলেন।

সোলতানের নম্রতা ও সুবিচারের জন্য, তাঁহার শাসনকালে তিনি বঙ্গের সমস্ত প্রজাবর্গের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সুজাআর শুভ রাজ-দৃষ্টিতে বঙ্গদেশ, সে সময় কৃষি ও বাণিজ্যে উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। যুদ্ধে তিনি একজন অদম্য সাহসী বীর ছিলেন, এবং তাঁহাতে একজন প্রবীণ সেনাধ্যক্ষের প্রায় সমস্ত গুণাবলী বর্ত্তমান ছিল।

দুই বৎসর পরে সোলতান সুজাআ, আফগানিস্থান হইতে পিতৃ সন্নিধানে ফিরিয়া আসিলেন। তখন সম্রাট পুনরায় তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের কঠিন পীড়ার সংবাদে, তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে যে ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হইল, তাহার ফলে সুজাআর ন্যায় শাসনকর্ত্তাকে হারান'য়, বাঙ্গালাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

সোলতান সুজাআ বাঙ্গালা হইতে বহু সৈন্য লইয়া বারাণসী গমন করিলেন ও নৌসেতু সাহায্যে তথায় গঙ্গা পার হইবার উপক্রম করিতে থাকা কালে, অবগত হইলেন যে—তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোলতান মোরাদ, গুজরাটে "ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

এই সময়ে জ্যেষ্ঠ কুমার দারা, পিতার নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র সোলেমান শেকোহ্‌কে দশ সহস্র অশ্বারোহী সহ এলাহাবাদ অধিকার করিয়া রাখিতে পাঠাইয়া দিয়া, বাদশাহ্‌কে পীড়িতাবস্থায় স্থান পরিবর্ত্তনের অছিলায় দিল্লী হইতে আগ্রায় আনয়ন করিলেন। তৎপরে সুজাআর সসৈন্যে আগমন বার্ত্তা পাইয়া সোল্‌তান

দারা, পুত্রের সাহায্যের জন্য রাজা জয়সিংহ ও দেলের খানকে বহু সেনা সহ পাঠাইয়া দিলেন।

যদিও কুমার সোলেমানের প্রতি, যে কোন প্রকারে সুজাআকে বিতাড়িত করিবার জন্য তাঁহার পিতার আদেশ ছিল; কিন্তু কুমারের সাহায্যের জন্য রাজা জয়সিংহকে প্রেরণ করিবার কালে সম্রাট শাহজাহান, স্বয়ং জয়সিংহকে গোপনে ডাকিয়া, তাঁহার প্রতি সাধ্যমত চেষ্টাসহকারে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাইতে, শেষ পক্ষে কুমার সুজাআকে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার পক্ষে বিহিত চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

বঙ্গেশ্বর সুজাআ বারাণসীর সন্নিকটে বাহাদুরপুরে, গঙ্গার উপর নৌসেতু নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, এমন সময় নদীর পরপারে তিনি কুমার সোলেমানের সেনাগণকে দেখিতে পাইলেন।

বিবাদ আরম্ভ হইবার সূত্রপাতের পূর্ব্বক্ষণে রাজা জয়সিংহ, সোল্‌তান সুজাআর সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া, তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে— তাঁহার জ্যেষ্ঠ দারার সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, কুমারকে প্রকৃত প্রস্তাবে দিল্লীশ্বরের বিপক্ষতাচরণ করিতে হইবে। যেহেতু তৎকালে কুমার দারাই বাদশাহের নামে সম্রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এবং মহামান্য ভারতেশ্বরেরও যে এই অভিলাষ, তাহা রাজা কুমারের নিকট বিবৃত করিলেন।

রাজা জয়সিংহের সৎ-যুক্তিতে কুমার সুজাআ সম্মত হইয়া, স্বীয় রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু উগ্রপ্রকৃতি তরুণ বয়স্ক কুমার সোলেমান শেকোহ্ সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া, প্রবীণ রাজা জয়সিংহকে তাঁহার অভিসন্ধি পূর্ব্বাহ্ণে কিছুই জানিতে না দিয়া, ১০৬৮ হিজরীর ৪ঠা রবিওল আউয়ল তারিখে রাত্রি দুই প্রহরের সময়, গঙ্গা

হাঁটিয়া পার হওয়া যায় এরূপ অল্প জল থাকা একটী স্থান দিয়া সসৈন্যে নদী পার হইয়া, তদীয় খুল্লতাতকে হঠাৎ নৈশ আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে দেলের খানও কুমারের সহিত ছিলেন।

সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতে থাকায়, সোলতান সুজাআ এই নৈশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন। তিনি এই সময় অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া সন্ধির স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এমন সময় শত্রুর কোলাহলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সোলতান ত্বরিতে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার হস্তীতে আরোহণ করিলেন। কিন্তু এই সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকা অবস্থায়, অগণিত সম্রাট সেনার সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। সুজাআ অনুচরগণ সহ শেষে পাটনায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট সেনা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করায়, তিনি আবার পাটনা পরিত্যাগে মুঙ্গেরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সোলেমান, মুঙ্গের পর্য্যন্ত সোলতানের অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুঙ্গেরের দুর্গ সমীপে, পৌছিবার পর কুমার সোলেমান, আগ্রায় ফিরিয়া যাইয়া, তাঁহার অপর দুই পিতৃবিদ্রোহী খুল্লতাত আওরঙ্গজেব ও মোরাদের সংযুক্ত সেনাগণকে বাধা দিবার জন্য পিতৃ আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

সোলেমান চলিয়া যাইবার পর বঙ্গেশ্বর সুজাআ, তাঁহার বিক্ষিপ্ত সেনাগণকে একত্রীভূত করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন; এমন সময় জ্যেষ্ঠ দারার পরাজয় ও আওরঙ্গজেবের সিংহাসন অধিকার, এবং তৎসঙ্গে সম্রাট-পিতাকে অবরুদ্ধ করিবার সংবাদ পাইলেন। তখন কুমার সুজাআ অনোন্যপায় হইয়া মন্ত্রীবর্গের পরামর্শক্রমে, কনিষ্ঠ আওরঙ্গজেবের এই কৃতকার্য্যতায় তাঁহার আনন্দোৎসব বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। তৎসহ তাঁহার প্রতি এই বঙ্গের সুবাদারের পদ নির্দ্ধারণকরণ জন্য, মিনতি সহকারে সম্রাট-ভ্রাতার নিকট প্রার্থনা করিলেন।

আওরঙ্গজেব তাঁহার চতুরতার জাল বিস্তার করিয়া, প্রথমতঃ ভ্রাতার দূতকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার নিকট হইতে সুবাদার সুজাআর ও তাঁহার পরিবার বর্গের শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, দূতকে এই বলিয়া বিদায় করিয়া দিলেন—

"এ সময় সাম্রাজ্যের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাঁহার ভ্রাতাকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ সম্বন্ধীয় পৃথক অনুমতি পত্র দেওয়া যায় না, এবং দিবারও আবশ্যকতা নাই। কারণ তিনি (আওরঙ্গজেব) ভারত সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার মহা-মহিমান্বিত পিতার প্রতিনিধি মাত্র। বাদশাহের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন তিনি রাজদণ্ড ধারণে অপারক হওয়ায়, তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত পদ সকলের অপলাপ হইতে পারে না।"

এই চাতুর্য্যপূর্ণ উত্তরে কুমার সুজাআ সন্তুষ্ট হইতে না পারিলেও, তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে ইহার অধিক আশা করিতে পারেন নাই। কাজেই সুবাদার নিজের অবস্থানুযায়ী প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এদিকে আওরঙ্গজেব, সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শেকোহ্ প্রভৃতি, তাঁহার যাবতীয় শত্রুগণকে পরাস্ত করিয়া ভারত সিংহাসনের কণ্টক গুলি পরিষ্কার করিলেন।

১০৬৯ হিঃ ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সুবাদার সুজাআ, তাঁহার মুখের মুখোষ অপসারিত করিয়া, বাঙ্গালা হইতে বহু সৈন্য লইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের বল পরীক্ষার্থে যাত্রা করিলেন। তিনি এলাহাবাদের নিকট বিনা বাধায় গঙ্গা পার হইয়া গেলেন। ক্রমে তথা হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী কাজ্‌ওয়া পর্য্যন্ত গিয়া, তিনি আওরঙ্গজেবের পুত্র মোহাম্মদ সোলতানের অধীনে দিল্লীর সেনাগণকে দেখিতে পাইলেন। তখন উভয় সেনা, মধ্যে একটী প্রকাণ্ড সমতল ভূমি রক্ষা করিয়া, দূরে দূরে শিবির

সন্নিবেশ পূর্ব্বক গড়খাত কাটিয়া, আপন আপন অবস্থান সুদৃঢ় করিতে লাগিল।

সুজাআ পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কামানগুলি, স্বীয় সেনার সম্মুখ ভাগে একখণ্ড উচ্চ ভূমির উপর রক্ষা করিয়াছিলেন। ঠিক বেলা দুই প্রহরের সময় উভয় পক্ষের কামান গর্জ্জনের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বঙ্গেশ্বরের কামানগুলি উপযুক্ত গোলান্দাজ সেনার দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকায়, কামান নিক্ষিপ্ত গোলা বিপক্ষের খুব অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হইল এবং তাহাদিগকে আরও কিছুদূর হটাইয়া দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

এই সময় বিশ্বাসঘাতক মহারাজা যশোবন্ত সিংহ, তাঁহার সমস্ত রাজপুত ও হিন্দু সেনা লইয়া, কেবল মাত্র আওরঙ্গজেবের সেনাদলকে পরিত্যাগ করিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া, বরং দিল্লীশ্বরের সেনাগণের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল ও সম্রাট শিবিরে লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিল।

বঙ্গেশ্বর সুজাআ সেই সময় ঐ বিষয় অবগত হইতে পারিলে, এই যুদ্ধ জয় করা তাঁহার পক্ষে সহজ সাধ্য হইত।

সমস্ত দিবস যুদ্ধের পর সোলতান সুজাআ তাঁহার কামানগুলি সহ, সমস্ত সৈন্যগণকে সুদৃঢ় গড়ের মধ্যে আসিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহার এই ভ্রমের ফলে সম্রাট সেনাপতি মীরজুম্‌লা, রাত্রিযোগে সুজাআর কামান সাজাইবার সেই উচ্চ ভূমিখণ্ড অধিকার করিয়া বসিলেন ও তদুপরি তাঁহার কামান শ্রেণী সাজাইয়া লইলেন।

পরদিবস প্রাতে তাঁহার ভ্রমের বিষময় ফল অবলোকন করিয়া সুজাআ, বাধ্য হইয়া স্বীয় সেনাগণকে আরও দূরে সরাইয়া লইতেছিলেন। এই অবসরে প্রবীণ যোদ্ধা আওরঙ্গজেব, স্বয়ং ভ্রাতাকে আক্রমণ করিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব হস্তী আরোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধে বাঙ্গালার সেনাগণ এতাধিক অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিল যে—কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তাহারা প্রবল সম্রাট সেনাগণকে অনেক দূর হটাইয়া দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। সোলতান সুজাআ একটী বৃহদাকার হস্তী পৃষ্টে আরোহণ করিয়া, তাঁহার সেনাগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে ছিলেন।

দূরে ভ্রাতা আওরঙ্গজেবকে সমভাবে হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট দেখিয়া, সুজাআ স্বয়ং সম্রাটকে আক্রমণ করিলেন। এই অবস্থায় সম্রাটের একজন সেনাধ্যক্ষ তাহার হস্তী লইয়া বঙ্গেশ্বরকে বাধা প্রদান করিতে গিয়া নিহত হইল। তৎপরে সুজাআর প্রচণ্ড আক্রমণে সম্রাটের হস্তী হাটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। এই সময় আওরঙ্গজেব হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইতেছিলেন; এমন সময় সেনাপতি সুচতুর মীরজুম্‌লা, অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুত আগমন করিয়া তাঁহাকে সাবধান ও নিষেধ করায়, সম্রাট আর অবতীর্ণ হইলেন না। হস্তী উঠিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু কোন মতে আর অগ্রসর হইতে চাহিল না।

এই সময় আওরঙ্গজেবের হাওদার পশ্চাতে উপবিষ্ট একজন যোদ্ধা বঙ্গেশ্বরের মাহুতকে বন্দুকের গুলি নিক্ষেপে ধরাশায়ী করিল। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের হস্তীর মাহুত দক্ষতার সহিত বঙ্গেশ্বরের হস্তীর মস্তকে উঠিয়া, উহাকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে সম্রাটের হস্তীও ক্রমে আঘাতের গুরুত্বে অবাধ্য হইয়া উঠিল। তথাপি সম্রাট হস্তী ছাড়িয়া না দিয়া উহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বলিলেন।

অপর পক্ষে সোলতান সুজাআ, তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারী আলিবর্দ্দী খানের পরামর্শে, হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। ক্রমে বঙ্গের সেনাগণ সুবাদারের হাওদা আরোহীশূন্য দেখিয়া, তাঁহার মৃত্যু কল্পনা করিয়া রণে-ভঙ্গ দিতে লাগিল। এই সময় রাত্রি সমাগত হওয়ায়, সম্রাট আর পলাতকদিগের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া, শত্রু পক্ষের

কামান, যুদ্ধাস্ত্র ও বস্ত্রাগারগুলি সেনাগণকে হস্তগত করিতে আদেশ দিলেন।

সুবাদার সোলতান সুজাআ অতীব সাহসী ও একজন উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ হইলেও, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, তিনি যুদ্ধ বিদ্যায় সেরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন না। বেনারস্ ও এলাহাবাদের এই উভয় যুদ্ধেই তিনি প্রবীণ সৈন্যাধ্যক্ষের উপযোগী পূর্ব্বদৃষ্টি ও নিপুণতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। উভয় যুদ্ধেই তাঁহার প্রধান সেনাধ্যক্ষের উপযুক্ত সতর্কতার অভাবে, তাঁহার অধীনস্ত বহু সেনার প্রাণনাশ হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তী পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করা, তাঁহার একটী প্রকাণ্ড ভ্রম হইয়াছিল।

অতঃপর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কুমার সুজাআ, সাধারণ লোকের বেশ গ্রহণে পাটনায় পলাইয়া আসিলেন। এই সময় তাঁহার এমন মানসিক অবস্থা হইয়াছিল যে—তিনি নিজ সেনাগণকেও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে ছিলেন।

পরদিবস প্রাতেঃ আওরঙ্গজেব, জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ সোলতানকে দশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া সুজাআর অনুসরণ করিতে প্রেরণ করিলেন। তিনি পুত্রের প্রতি যে কোন প্রকারে হউক তাহার পিতৃব্যকে ধৃত করিতে আদেশ দিলেন। কুমার মোহাম্মদের আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া, দুর্ভাগা সুজাআ আবার মুঙ্গেরে পলায়ন করিলেন।

আওরঙ্গজেব এক্ষণে পুত্র মোহাম্মদ সোলতানের পশ্চাতে, খান খানান উপাধি ভূষিত সেনাপতি মোয়াজ্জম খান মীরজুম্‌লাকে, বাঙ্গালা দেশ হইতে দুর্ভাগা সুজাআকে বিতাড়িত করিবার আদেশ দিয়া প্রেরণ করিলেন।

সুজাআ মুঙ্গেরে পৌছিয়া, মুঙ্গের দুর্গ উত্তমরূপে পরিখা বেষ্টিত করিয়া

সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। তথায় তাঁহার পরিত্যক্ত ও ছত্রভঙ্গ সেনাদল ক্রমশঃ আসিয়া জুটিতে লাগিল। বাঙ্গালা হইতেও অনেক সেনা তাঁহার নিকটে গিয়া পৌছিল। এই সময় বঙ্গেশ্বর তেলিয়াগড়ী ও শিকৃরিগলি গিরিবর্ত্ম দ্বয় সুদৃঢ় করিয়া, এবং তথায় আবশ্যক মত সেনা রক্ষা করিয়া, বঙ্গ প্রবেশের ঐ দুইটী পথ অবরুদ্ধ করিলেন।

এই বৎসর ১৬৫৯ খৃঃ ১০৬৯ হিঃ ৪ঠা রমজান তারিখে কুমার আওরঙ্গজেব, আবুল মোজাফ্‌ফর মুহিউদ্দীন মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব বাহাদুর আলমগীর বাদশাহ গাজী নাম ধারণে সিংহাসনারূঢ় হইয়া, সমস্ত মসজিদে তাঁহার নামে খোত্‌বা পড়িতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিতে লাগিলেন। (মোন্‌তেখাবুল লোবাব)।

কুমার মোহাম্মদ সোলতান, পাটনায় খান খানান মোয়াজ্জম খানের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, উভয়ে বঙ্গ প্রবেশের উপায় উদ্ভাবন করিতে রহিলেন। শেষে পাটনার নিকটবর্ত্তী জমিদারগণের সাহায্যে জারকন্দ পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী দুর্গম সেরেগটির পথ আবিষ্কার করিয়া, খান খানান মোয়াজ্জম খান দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সহ বঙ্গে উপস্থিত হইলেন।

কুমার মোহাম্মদ সোলতান, অবশিষ্ট সম্রাট সেনা লইয়া মুঙ্গেরের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং মুঙ্গের হইতে কয়েক মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকিলেন।

এমন সময় দুর্গ মধ্যে সুবাদার সুজাআ সম্রাট সেনাপতির বঙ্গ প্রবেশের সংবাদ পাইয়া, দুঃখ ও বিস্ময়ের সহিত মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে রাজমহলে গিয়া পৌছিলেন। মুঙ্গের দুর্গ কুমার মোহাম্মদ সোলতানের হস্তগত হইল।

কিছুদিন পরে কুমার ও সেনাপতি খান খানানের সৈন্য, দুইদিক হইতে রাজমহল আক্রমণ করিল। ছয় দিবস পর্য্যন্ত সুজাআ এই যুক্ত-আক্রমণে বাধা প্রদান করিলেন। তৎপরে সেইস্থান নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া, নিশার অন্ধকারে দারুণ দুর্য্যোগ ও ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়া, নৌকারোহণে সপরিবারে টাঁড়ায় গিয়া পৌছিলেন। সুজাআর ভাগ্যক্রমে সেই রাত্রি হইতে প্রচণ্ড বেগে ঝড় বৃষ্টি ও তুফান আরম্ভ হইয়া, নদীর জল বৃদ্ধি হইতে হইতে সম্রাট সৈন্যের বস্ত্রাবাস পর্য্যন্ত জলমগ্ন করিয়া দিল। এই অবস্থা দর্শনে খান খানান মোয়াজ্জম খান, আর সুজাআর পশ্চাদ্ধাবন করিতে না পারিয়া, চারি মাসকাল রাজমহলে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

সম্রাট সেনাপতির অনিচ্ছু এই বিরাম কাল, ভাগ্যতাড়িত সুজাআকে নিম্ন বঙ্গের বিক্ষিপ্ত সেনাগণকে পুনঃ সংগ্রহ করিবার সুবিধা প্রদান করিল। এবার তিনি পর্ত্তুগীজ গোলন্দাজগণের দ্বারা তাঁহার কামান সকল ছুড়িবার সুবন্দোবস্ত করাইতে লাগিলেন। তাহারা এই সুবাদারের অমায়িকতা এবং সাম্যনীতির বশবর্ত্তী হইয়া, দলে দলে তাঁহার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

অতঃপর সুবাদার-সেনাগণ নববলে বলীয়ান্ হইয়া গঙ্গা পার হইয়া, মধ্যে মধ্যে শত্রুসৈন্যের উপর গুলি বর্ষণ করিয়া, এবং সময় সময় রাত্রিযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল যে—শেষে সেনাপতি মোয়াজ্জম্ খানকে বাধ্য হইয়া রাজমহল পরিত্যাগে, গঙ্গা তীর হইতে কিছু দূরে গিয়া অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

এই সময়ে আবার এরূপ একটী ঘটনা সংঘটন হইল, যাহাতে একদিকে যেমন সুজাআর পক্ষীয় লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন হইল, অপর দিকে সম্রাটের তরফে তেমনি ত্রাস ও উৎকণ্ঠার বীজ ছড়াইয়া দিল।

আওরাঙ্গজেব-পুত্র কুমার মোহাম্মদ সোলতান, ইতিপূর্ব্বে সুবাদার নন্দিনীর সহিত বাক্‌দত্ত হইয়াছিলেন। কেবল এই সর্ব্বনাশক ভ্রাতৃ-বিবাদের জন্য এতাবৎকাল বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয় নাই! অনেকেই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বিবেচনা করিয়াছিলেন। এমন কি কুমার সর্ব্বক্ষণ এই যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, তিনিও তাঁহার পরমা সুন্দরী বাক্‌দত্তার বিষয় সম্যক ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

রাজকুমারী তাঁহার পিতার দুরবস্থা দর্শনে, এই সময় স্বহস্তে কুমার মোহাম্মদ সোলতানকে করুণরসপূর্ণ একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি তাঁহার ভাবী স্বামী কর্ত্তৃক তাঁহার পিতামাতার এই দুরাবস্থার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই পত্র কুমারের অন্তরে, তাঁহার পূর্ব্ব আসক্তির বহ্নি প্রজ্জলিত করিয়া দিল। তিনি পিতার স্নেহ ও রাজ্য বিস্তারের আশা পরিত্যাগ করিয়া, অধীনস্থ গোলন্দাজ সেনা-নায়ক আমীর কুলি ও কাসেম আলি প্রভৃতি কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সহ, জ্যেষ্ঠতাত সুজাআর সহিত মিলিত হইতে বাহির হইলেন। মোহাম্মদ সোল্‌তান তাঁহার সেনাগণকে পরে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার উপদেশ দিয়া, নৌকারোহণে গৌড়ের অনতিদূরে অবস্থিত বাগ্‌মতী নদীর তীরে, টাঁড়া নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এইস্থান হইতে সুবাদার সুজাআর পুত্র বোলন্দ আখ্‌তার, কতিপয় রাজসভাসদ্ সহ আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন।

সেনাপতি মোয়াজ্জমখান এই সংবাদ পাইয়া প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; পরে যতই তিনি এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাণে আশঙ্কার উদ্রেক হইতে লাগিল। আবার রাজমহলে প্রবেশ করিয়াও তিনি কুমারের সেনাগণ মধ্যে অতিশয় বিশৃঙ্খলতা ও

চাঞ্চল্য দর্শন করিলেন। তখন মহাসেনাপতি খান খানান স্বীয় হস্তী পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া, সমস্ত সৈন্য মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ও তাহাদিগকে ওজস্বী ভাষায় উৎসাহ প্রদান করিতে, এবং তৎসঙ্গে কুমার মোহাম্মদের মহাভ্রম ও পাগ্‌লামি বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ এই মহাসেনাপতির সারগর্ভ উপদেশে, সম্রাট শিবির পরিত্যাগ করিয়া কুমারের সহিত মিলিত হইতে যাওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বুঝিতে পারিয়া, সেই কার্য্যে নিরস্ত হইল। খান খানানও এই সময় হইতে নৌসেতু প্রস্তুতের অভিপ্রায়ে নৌকা সংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন।

এদিকে খাওয়াস্‌পুর টাঁড়ায় মহাসমারোহে সম্রাট কুমার মোহাম্মদ সোলতানের সহিত সুবাদার নন্দিনীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহকালে কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইয়া, উভয় পক্ষের কাহারও উৎসাহ ভঙ্গ করিল না। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই, এই সমারোহ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি না হইতে হইতে, সম্রাট সেনার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে টাঁড়ার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

সুবাদার সুজাআ, নগর প্রাকারের দৃঢ়তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া, সসৈন্যে নগরের বাহিরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এইবার সুবাদার নিজের সৈন্য বলের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও, জামাতার কথামত তাঁহার অধীনস্থ সেনাগণের অধিকাংশ যুদ্ধকালে সম্রাট-পক্ষ পরিত্যাগে তাঁহার সহিত মিলিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকায় সুজাআ, যুদ্ধারম্ভে জামাতাকে অগ্রবর্ত্তী সেনাগণের কেন্দ্রস্থলে প্রকাশ্যস্থানে অবস্থান করিতে উপদেশ দিলেন।

যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ বাদসাহ সেনাপতি খান খানান, বিপক্ষ সেনাগণকে সমতল ক্ষেত্রে সমবেত দেখিয়া, মনে মনে খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং দূর হইতে সর্ব্বপ্রথমে সম্রাট

কুমারের পতাকা দেখিয়া, অধীনস্থ একজন বিশ্বাসী সেনানীকে কুমার মোহাম্মদ সোল্‌তানকে কোন প্রকারে ধৃত করিবার উপদেশ দিয়া, সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন।

প্রথমতঃ দূরের কামান গর্জ্জনের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইল। কিন্তু কামানের যুদ্ধে সুবাদারের পক্ষেই অধিক সুবিধা হইতেছে দেখিয়া, মোয়াজ্জম খান, তাঁহার নির্ব্বাচিত অশ্বরোহীগণকে দূরে না থাকিয়া, কুমারের দিকে ধাবমান হইতে অনুমতি করিলেন।

এই সময় কুমার ঐ অশ্বারোহী সেনাগণকে তাঁহার পক্ষীয় লোক, এবং পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত তাহারা তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আসিতেছে বিবেচনা করিয়া, গোলন্দাজদিগকে কামান বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। পরে কুমার যখন তাঁহার এই মহাভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তখন আর ইহা সংশোধনের সময় ছিল না।

এই যুদ্ধে বাঙ্গালার অসংখ্য সৈন্য মোগল সেনাগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল। সুবাদার-কুমার বোলন্দ আখ্‌তার রণস্থলে সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইলেন।

সুবাদার ও তাঁহার জামাতা প্রথমতঃ নগর মধ্যে পলায়ন করিয়া আশ্রয় লইলেন, এবং রাত্রিযোগে সপরিবারে নৌকারোহণে ঢাকার দিকে সরিয়া পড়িলেন।

মহাসেনাপতি খান খানান তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত হঠাৎ-বিজয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন ও ধীরে ধীরে টাঁড়া নগরে প্রবেশ করিয়া সুলতানের প্রাসাদ অধিকার করিলেন। পরে এই স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, সম্রাটের পূর্ব্বাদেশ মত রাজ্য সম্বন্ধে সুবন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন।

সম্রাট আওরাঙ্গজেব স্বীয় তনয় মোহাম্মদ সোল্‌তান সম্বন্ধে এই

অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে—এই সঙ্গে সঙ্গে হয়ত তাঁহার সমুদয় সৈন্য, তাঁহার পুত্রের আদর্শ অনুকরণ করিবে, এবং তাহার ফলে কেবল যে বাঙ্গালা তাঁহার হস্তচ্যুত হইবে তাহাই নহে, কালে সুজাআ হয়ত, তাঁহার সিংহাসন পর্য্যন্ত টান ধরিবে।

আওরাঙ্গজেবের অন্যান্য দু' একটী দোষ থাকিলেও, তিনি অদ্বিতীয় সাহসী বীর পুরুষ ছিলেন। পুত্রের সংবাদ পাইয়াই তিনি সত্বর সেনা সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস অবিশ্রান্ত পথ অতিক্রমের পর, টাঁড়ায় তাঁহার সেনাগণের বিজয় বার্ত্তা শ্রবণে তিনি, পরম করুণানিদানকে ধন্যবাদ দিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় পৌছিয়া সম্রাট অতি নম্রতার সহিত অপত্য-স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া, কুমারকে পিতৃসন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য দ্রুতগামী দূত হস্তে উহা পাঠাইয়া দিলেন। দূতর প্রতি সম্রাটের এইরূপ উপদেশ ছিল যে—যে কোন উপায় অবলম্বনে হউক সুজাআর গোয়েন্দা কর্ত্তৃক দূতের গ্রেপ্তার হওয়া চাই। অন্যথায় কুমারের নিকট পত্র পৌছিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই বুঝাইয়া দিলেন।

যাহা হউক ঐ পত্র, শেষে মহত্ত্ব ও উদারতার অবতার সুজাআর হস্তে পড়িল। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক হৃদয়ের কোমলতা বশতঃ পত্র পাঠে, জামাতার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বাধা না দিয়া, তাঁহাকে সম্রাট সন্নিধ্যে প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন ও সেই মত জামাতা মোহাম্মদ সোল্‌তানকে সপরিবারে পিতার নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন।

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সম্রাট আওরাঙ্গজেবের স্বভাব তাঁহার পুত্রের অগোচর

ছিল না ; তথাপি তিনি অচিরে যৌতুক স্বরূপ শ্বশ্রু প্রদত্ত বহু ধনরত্ন লইয়া, তাঁহার নিকট হইতে সস্ত্রীক বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরে মহানুভব সুজাআর মহৎ অন্তঃকরণের বহুল প্রশংসা করিতে করিতে, পিতৃ সেনাধ্যক্ষ মোয়াজ্জম খানের শিবিরের অনতিদূরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাসেনাপতি কুমারের এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া, অতি যত্নের সহিত কুমারদম্পতিকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, তাঁহাদের প্রতি রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে পরদিনই খান খানান, সম্রাট দরবার হইতে পত্র পাইলেন যে—কুমার মোহাম্মদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই যেন তাঁহাকে সাবধানের সহিত দিল্লীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কিছুদিনের মধ্যে কুমার পিতৃ সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সন্দিগ্ধচিত্ত সম্রাট আওরাঙ্গজেব, তাঁহার এই অদম্য সাহসী বীর সরলমতি জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। বাদশাহ, কুমার মোহাম্মদ সোলতানকে গোয়ালিয়ার দুর্গে আবদ্ধ করিলেন। এই অবস্থায় ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ সোল্‌তানের গোয়ালিয়ার দুর্গে মৃত্যু হইল।

খান খানান মোয়াজ্জম খান পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের সুবন্দোবস্ত করিয়া, সসৈন্যে পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; এই সময়ে সুবাদার সুজাআর সহিত মাত্র দেড় সহস্র অশ্বারোহী ছিল। তিনি আর অযথা রক্তপাতে যোগ না দিয়া, আরাকাং রাজের অধিকারভুক্ত চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে—চট্টগ্রাম বন্দর হইতে জাহাজে আরব দেশে গমন করিয়া, তথায় মক্কা ও মদিনাতীর্থে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু সেই সময় সমুদ্রে ঝড়ের প্রকোপে কোন অর্ণবপোত বন্দর পরিত্যাগ করিতে সাহস করিল না। অগত্যা

সুজাআ কেবলমাত্র স্বীয় পরিবারবর্গ ও চল্লিশজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ সমুদ্র তীর দিয়া গিয়া, লাফ্ নদী পার হইয়া আরাকাণ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

আরাকাণ রাজা প্রথমতঃ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। পরে সম্ভবতঃ সম্রাট সেনাপতির উৎকোচে বশীভূত হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিল। এই সময় অর্দ্ধসভ্য দুষ্ট ব্রহ্মরাজ, দিল্লীশ্বর-কুমার সুজা-আর নিকট, তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করায়, সুজাআ ঘৃণার সহিত উত্তর দিয়াছিলেন—

"তৈমুরের বংশধর নীচবংশে কুটুম্বিতা করিয়া, হেয় হইতে চাহেন না। জাহাজ পাইলেই তিনি আরাকাণ রাজ্য পরিত্যাগ করিবেন।"

নীচ প্রবৃত্তি রাজা, শাহ্‌জাহান পুত্রের এই উদ্ধত উত্তরে রাগান্বিত হইয়া, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহার রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে অনুমতি করিল। সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সেনাগণকে. নানাপ্রকারে উহাদিগকে উত্যক্ত করিতে ইঙ্গিত করিল।

অচিরে রাজ-সেনাগণ আসিয়া এই অভাগা আশ্রিতগণের উপর নানা উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল। উহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, সুজাআর অনুচরগণ অস্ত্রাঘাতে তাহাদের দুই একজনকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। রাজার সেনাগণও এই সুযোগ খুঁজিতেছিল। তাহারা তখন সুজাআর বাসগৃহের পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ে উঠিয়া তথা হইতে উহাদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ আরম্ভ করিয়াদিল। এই বৃহৎ বৃহৎ নিক্ষিপ্ত প্রস্তরা-ঘাতে সুজাআর দলের অনেকেই প্রাণত্যাগ করিল। তিনি নিজেও একখানি প্রস্তরাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় পাষণ্ডেরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া গিয়া একটী ডোঙ্গায় তুলিল; এবং ঐ ডোঙ্গায় দুর্ভাগ্য সুজাআকে বাঁধিয়া, নদী মধ্যে ডোঙ্গা ভাসাইয়া লইয়া গিয়া,

উহার নিম্নের একখণ্ড কাষ্ঠ সরাইয়া লইল ও সঙ্গে সঙ্গে সকলে নদীজলে লাফাইয়া পড়িল। ডোঙ্গা বন্ধনাবস্থায় সম্রাট শাহ্‌জাহান-তনয় সুজাআকে লইয়া জলমগ্ন হইল।

তখন দুর্ভাগা সুজাআর স্ত্রী কন্যাগণ রাজ সমীপে আনিতা হইলেন। এই সময় দুর্বৃত্ত রাজার কুঅভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, জগৎবিখ্যাত সুন্দরী পিয়ারীবানু স্বীয় বক্ষবস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সুতীক্ষ্ম ছুরিকা বাহির করিয়া, পাষণ্ড রাজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অপারগ হইয়া শেষে নিজবক্ষে ঐ ছুরি আমূল বিদ্ধ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিলেন। তাঁহার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সুজাআর কন্যাগণ হলাহল পানে সেইস্থানে দেহত্যাগ করিলেন।

সুজাআর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইতিপূর্ব্বেই প্রস্তরাহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অন্যান্য অল্পবয়স্ক পুত্রগণকে রাজা কিছুদিনের জন্য বন্দি অবস্থায় রাখিয়া, শেষে তাহাদিগকেও তাহাদের পিতার ন্যায় জলমগ্ন করিয়া বিনাশ করিল।

১০৭১ হিঃ ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ভারত সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র, এবং বঙ্গ-বেহার-উড়িস্যার সর্ব্বজন সমাদৃত, প্রজাগণের ভক্তি-প্রীতির আধার সুবাদার, কুমার মোহাম্মদ সুজাআর ও তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণের নশ্বর দেহের শোচনীয় অবসান হইল।

পঞ্চদশ সর্গ

নওয়াব মোয়াজ্জম খান, সৈয়দ মোহাম্মদ মীরজুম্‌লা খান খানান সেপাহ্‌ সালার

মীরজুম্‌লা খান পারস্য দেশের অন্তর্গত ইস্‌পাহান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুস্তানে আগমন করিয়া, তিনি ১০৬০ হিজরীতে তেলিঙ্গনা রাজ সোলতান আবদুল্লা কোতব্‌ শাহের নিকট চাকুরী স্বীকার করিলেন। এবং তাঁহার অধীনে ক্রমে সেনানায়ক পদে উন্নীত হইলেন। এই অবস্থায় তিনি সোল্‌তানের পক্ষাবলম্বন করিয়া, বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ টাকা আয়ের কর্ণাট্টিক্‌ বালাঘাট নামক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। পরে শত্রুতা জালে বেষ্টিত হওয়ায় মীরজুম্‌লা বাধ্য হইয়া কুমার আওরাঙ্গজেবের অধীনে, তাঁহার পল্টনে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা কারিলেন। সম্রাট-কুমার তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া, পিতা শাহ্‌জাহানকে এই বিষয় মতামতের জন্য লিখিলেন।

সম্রাট, কুমারের পত্র পাইয়া, তেলিঙ্গনা রাজ কোতব্‌ শাহের নিকট মীরজুম্‌লার ও তৎপুত্র মোহাম্মদ আমিনের চাকুরী বরখাস্তের ছাড়পত্র চাওয়ায়, সোল্‌তান কোতব্‌ শাহ্‌ মীরজুম্‌লা-পুত্র আমিনকে বন্দি করিলেন ও উহাদের পিতাপুত্রের যাবতীয় সম্পত্তি রাজ-সরকারভুক্ত করিয়া লইলেন।

কোতব শাহের এই ব্যবহারে কুমার আওরাঙ্গজেব মহা রুষ্ট হইয়া, স্বীয় পুত্র মোহাম্মদ সোল্‌তানের অধীনে কোতব শাহের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া, তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিয়া দিলেন। হিঃ ১০৬৭ সালের

১২ জমাদিয়ল-আখের তারিখে মীরজুম্‌লা ও তাঁহার পুত্র, কুমার মোহাম্মদ সোল্‌তানের শিবিরে আসিয়া, তথা হইতে সম্রাট-কুমার আওরাঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত হইলেন। এই বৎসরের ২৫ রমজান তারিখে মীরজুম্‌লা দিল্লীতে আসিয়া সম্রাট শাহজাহানের নিকট পরিচিত হইলেন। এই উপলক্ষে মীরজুম্‌লা সম্রাট শাহ্‌জাহানকে আড়াই লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের একটি উৎকৃষ্ট বৃহৎ হীরক এবং তৎসহ অন্যান্য বহু মুল্যবান উপঢৌকন ও ৬০টি হস্তী প্রভৃতি উপহার দিয়াছিলেন। এই সমস্ত উপঢৌকনের মূল্য সর্ব্বসমেত পনর লক্ষ টাকারও অধিক হইবে।

মীরজুম্‌লা বাদশাহের নিকট হইতে মোয়াজ্জম খান উপাধি পাইয়া ৬০০০ সহস্র অশ্বারোহীর নেতা হইলেন। পরে জ্যেষ্ঠ-কুমার দারা সেকোহ্‌এর ঘোর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, সায়াদুল্লা খানের মৃত্যুর পর তিনি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

মোয়াজ্জম খান, খাজ্‌ওয়ার যুদ্ধে আওরাঙ্গজেবের পক্ষ হইয়া তাঁহার ভ্রাতা বঙ্গেশ্বর সুজাআকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করায়, তিনি তাঁহাকে মহা-সেনাপতির পদে বরণ ও খান খানান উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

রাজমহলে অবস্থান কালে মোয়াজ্জম খান ইংরাজ কোম্পানীর সোরা পূর্ণ একখানি নৌকা আটকাইয়া, তাহাদের পাটনার ব্যবসায়ে বিস্তর ক্ষতি করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা তাঁহার একখানি নৌকা আবদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছে অবগত হইয়া, তিনি ইংরাজ গণকে তাঁহার রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার ভয় প্রদর্শন করেন। তাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও বাৎসরিক তিন সহস্র টাকা শুল্ক দিতে স্বীকৃত হইয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

১০৭১ হিঃ ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরাঙ্গজেবের চতুর্থ বৎসর রাজত্ব

কালে বাদশাহ্ স্বীয় পুত্র মোহাম্মদ মোয়াজ্জমের সহিত রাজা রূপসিংহের কন্যার বিবাহ দেন।

এই সময় কুচবেহারের রাজা ভীম নারায়ণ, মোগল সাম্রাজ্যের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, মোগলাধিকৃত কামরূপ ও আরও দুই একটি স্থান অধিকার করেন। সঙ্গে সঙ্গে আসামের রাজা জয়দেব সিং, মোগল অধিকৃত কয়েকটি স্থান লুটপাট করিয়া, তথাকার অনেক অধিবাসীকে ধরিয়া লইয়া যায়। এই সকল প্রজার অনেকেই মোসলমান ছিল।

উপরি উক্ত অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য সুবাদার মীর জুম্‌লা, কুমার সুজাআর ব্যাপার অবসানান্তেই বহু সেনা, বৃহৎ বৃহৎ কামান এবং যুদ্ধতরী লইয়া, ব্রহ্মপুত্র-তীর দিয়া গিয়া প্রথমতঃ কুচবেহার আক্রমণ করেন। কুচবেহার রাজ্যের এই অংশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায়, সৈন্য ও কামান লইয়া সুবাদারকে বড়ই বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। এমনকি এই মহা-সেনাপতি বঙ্গেশ্বরকে, একদিন স্বহস্তে কুঠার ধরিয়া পথ নির্ম্মাণের জন্য অরণ্যের মধ্যে গাছ পর্য্যন্ত কাটিতে হইয়াছিল। কিন্তু সুবাদারের এই উদাহরণে গর্ব্বিত মোগল সেনাগণ (যাহারা কেবল যুদ্ধই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত বিবেচনা করিত) অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, সকলেই তখন কুঠার হস্তে জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল।

১০৭১ হিজরীর ২৭ রবিওল আউয়ল ১৬৬১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে সেপাহ্‌সালার খান খানান, কুচবেহার নগর অধিকার করিলেন ও উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আলম্‌গীর নগর রাখিলেন।

তদনন্তর সৈয়দ মোহাম্মদ সাদেক্‌কে এই স্থানের সামরিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, যদিও খান খানান রাগ বশতঃ তাঁহার প্রতি দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন; তথাপি তিনি, যাহাতে কোন প্রজার উপর অত্যাচার না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি

রাখিবার জন্য সামরিক শাসনকর্ত্তার উপর আদেশ দিয়া যান। এই সময় সুবাদার স্বহস্তে কুচবেহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির-অভ্যন্তরস্থ নারায়ণ মূর্ত্তি ভঙ্গ করতঃ তাহার ছাদে উঠিয়া, উচ্চকণ্ঠে আজানের দ্বারা মোস্‌লেম-বিজয় ঘোষণা করিলেন।

প্রজার সুখ-সমৃদ্ধির দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখায় কুচবেহারের প্রজাগণ শীঘ্রই এই নব বিজেতাগণের বশ্যতা স্বীকার করিল ও পলাতক প্রজাবৃন্দ তাহাদের পরিত্যক্ত বাসস্থানে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই সময়ে রাজার পুত্র বিষণ নারায়ণ সুবাদার মীরজুম্‌লার নিকট আসিয়া, স্বেচ্ছায় পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

এস্‌কেন্দিয়ার বেগ রাজার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে অনেক চেষ্টায়ও ধৃত করিতে পারেন নাই। রাজা ভীম নারায়ণ তাঁহার আড়াই শত কামান অরণ্যের মধ্যে ফেলিয়া গিয়া ভূটানে পলায়ন করিলেন। ঐ সমস্ত কামান এস্‌কেন্দিয়ার বেগ কর্ত্তৃক রাজধানী ঢাকায় প্রেরিত হইল।

মীরজুম্‌লা তৎপরে ১,৪০০ অশ্বারোহী ও দুই সহস্র বন্দুকধারী পদাতিক সৈন্য এস্‌কেন্দিয়ারের অধীনে এই নব রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিয়া, আসাম জয়ে বহির্গত হইলেন।

মহাসেনাপতি মীরজুম্‌লা ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে, রাঙ্গামাটীর নিকট নৌসেতু সাহায্যে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া আসাম প্রদেশে পৌঁছিলেন। এইস্থানে মোগল সেনাগণ আসামবাসীগণের নৈশ আক্রমণে বড়ই বিব্রত হইতে লাগিল। শেষে এই কষ্ট-সহিষ্ণু মোগল সেনাগণ, পার্ব্বতীয় সিমাইন্‌ দুর্গের সন্নিকটে পৌঁছিলেন। এই দুর্গ বিংশতি সহস্র আসামী সৈন্য কর্ত্তৃক সংরক্ষিত ছিল; এবং ইহার এক প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র বক্ষে শত্রুপক্ষের নৌবহর সর্ব্বক্ষণ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত।

সুবাদার প্রথমেই মোগল নৌসেনাগণকে বিপক্ষের এই সমস্ত তরণী

ধ্বংস করিতে বলিয়া, তিনি স্বয়ং স্থলপথে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মোগল কামান অতি সত্বরই আসামী নৌকাগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। এই অবস্থা দর্শনে দুর্গরক্ষী সেনাগণ নিশাযোগে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

মহাসেনাপতি দুর্গ অধিকার করিয়া, ঐ দুর্গের নাম আতা-আল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র দান) রাখিলেন ও তথায় উপযুক্ত সংখ্যক সেনা রক্ষা করিয়া, ৬ই সাবান আসামের তৎকালীন রাজধানী ঘেরগাঁও অধিকার করেন।

আসাম-রাজ জয়দেব সিং অরণ্যময় পার্ব্বতীয় প্রদেশে পলাইয়া গেলেন ও তথা হইতে মধ্যে মধ্যে সৈন্য প্রেরণে মোগল সেনাগণকে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে বর্ষার জল প্লাবনে সুবাদারকে সৈন্যসহ যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই স্থানে অবস্থান করিয়া সুবাদার চীনদেশ আক্রমণের আশায় পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এবং পরবর্ত্তী বৎসরে চীন অভিযানের আশা মনমধ্যে পোষণ করিয়া, কিছুদূর পর্য্যন্ত পথও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বাদশাহ্ আওরাঙ্গজেবের নিকট এই আনন্দের সংবাদ পৌছিতে, তিনিও চীন অভিযানে বঙ্গেশ্বরকে সাহায্য করিবার জন্য দিল্লীতে সেনা সংগ্রহ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু মীরজুম্‌লার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত আশা-ভরসা পণ্ড হইয়া গেল। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আসাম দেশে অতিশয়বর্ষা হইয়া, সমস্ত দেশ জলমগ্ন হইয়া পড়িল। যেঁ মোগল অশ্বারোহী সেনাগণের দশজনকে সম্মুখে দেখিলে শত শত আসামী সৈন্য ভয়ে পলায়ন করিত, এক্ষণে খাদ্যাভাবে তাহাদের অশ্বগুলি ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ায়, তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিতে বাধ্য হইল।

বর্ষা ক্রমশঃ শেষ হইল বটে, কিন্তু বর্ষান্তে যে জ্বর দেখা দিল, তাহার প্রকোপে অনেক মোগল সেনা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তদুপরি

আসামীগণও নিশাযোগে দূর হইতে বিষাক্ত তীর নিঃক্ষেপে অনেক মোগল সেনা ও অশ্ব নষ্ট করিতে লাগিল।

১০৭৩ হিজরীর রবিওল আউয়ল মাসে ভূমি শুকাইয়া পূর্ব্বের স্থায় হইল। তখন সুবাদার মীরজুম্‌লা, ভীরু আসামীগণের উপর তাঁহার অশ্বারোহী সেনা ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। এবং তাহারা এক একদলে অতি অল্প সংখ্যক মাত্র গিয়া, মেষপালের ন্যায় আসামীগণকে বিতাড়িত করিতে লাগিল। রাজা অবস্থা দর্শনে সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। সুবাদার এই সময় ভীষণ রক্ত আমাশয় রোগে কাতর হইয়া পড়ায়, তাঁহার অধীনস্থ সেনানী দেলের খান প্রভৃতির অনুরোধে রাজার সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। রাজা জয়দেব সিং বঙ্গেশ্বরকে বাৎসরিক কর উপঢৌকন স্বরূপ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট হস্তী, বহু অর্থ এবং সুবাদারের এক পুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হওয়ায়, খান খানান মীরজুম্‌লা আসাম পরিত্যাগ করিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

৬ই জমাদিয়স্‌-সানি তারিখে আসামরাজ, মোগল সুবাদারের নিকট ২০,০০০ সহস্র তোলা স্বর্ণ, দশ লক্ষ আট হাজার তোলা রৌপ্য, চল্লিশটী বৃহদাকার হস্তী এবং দুই জন রাজ কন্যাকে (তন্মধ্যে একজন তাঁহার কন্যা ও অপর একজন নিকটবর্ত্তী জনৈক প্রধান শাসনকর্ত্তার কন্যা) পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে মোগল সরকারে বাৎসরিক কর প্রেরণের প্রতিভূ স্বরূপ, সম্ভ্রান্ত বংশীয় চারিজন যুবককে সুবাদারের নিকট রক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

রাজা জয়দেবের হঠাৎ এই সন্ধির প্রস্তাব করিবার ও তাঁহার এই অপমান জনক শর্ত্তে সম্মত হইবার আরও বিশেষ কারণ হইয়াছিল যে—বর্ষান্তে যখন দেলের খান আসামীগণের বিস্তর লোকক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন ও যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকেই ধরিয়া মোগল

শিবিরে আনিয়া নানারূপ যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। খান খানান আসামী সেনাগণের ভীতি উৎপাদন মানসে ঐ সকল ধৃত আসামবাসীগণের কোমরে ও গলায় মৃত আসামীগণের খণ্ডিত মুণ্ডমালা ঝুলাইয়া, তাহাদিগকে নগর মধ্যে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, পরে প্রকাশ্য স্থানে প্রাণনাশের আদেশ দিতে লাগিলেন। এই অবস্থা দর্শনে সমুদয় আসামীসেনা বিদ্রোহী হইবার উপক্রম হওয়ায়, রাজাকে বাধ্য হইয়া সন্ধির অতি হীন প্রস্তাবেও সম্মত হইতে হইয়াছিল।

সাবান মাসের শেষে, খান খানান গৌহাটীতে আসিয়া পৌছিলেন। এই শারীরিক দুর্ব্বলতার সময়, কুচবেহারে পুনঃ গোলযোগের সংবাদ পাইয়া, সুবাদার উহা নিবৃত্তি করণ কল্পে তাঁহার সমভিব্যাহারী সেনা মধ্য হইতে কতক সেনা রাশেদ খান ও আস্গর খানের অধীনে কুচবেহারে পাঠাইয়া দিলেন; এবং অবশিষ্ট সেনাসহ তিনি রাজধানী ঢাকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খিজিরপুর পৌছিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য এককালীন ভগ্ন হইয়া গেল ও বঙ্গ-বেহারের প্রবল পরাক্রান্ত শাসনকর্ত্তা, দিল্লীশ্বরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সেপাহ্সালার মহাবীর মোয়াজ্জম খান মোহাম্মদ মীর জুম্‌লা খান খানান, হিঃ ১০৭৩ সালের ১২ রমজান তারিখে খিজিরপুরে দেহ ত্যাগ করিলেন।

এই উপযুক্ত সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তার মৃত্যুতে বাদশাহ ও আওরঙ্গজেব শোকে অভিভূত হইলেন। আওরাঙ্গজেব স্বীয় পুত্র মোহাম্মদ মোয়াজ্জম্‌কে তাঁহার পরিবারবর্গের সান্ত্বনা দিবার জন্য বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন।

ষোড়শ সর্গ

দাক্ষিণাত্য—শিবাজী

বাঙ্গালায় যখন এই সমস্ত ব্যাপার হইতেছিল, সেই সময় দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর রাজ আদিল্ খানের রাজ্য মধ্যে পূনার জায়গীরদার মারহাট্টা সাহজী ভোঁসলার পুত্র শিবাজী মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার পিতার কার্য্য নির্ব্বাহক নিযুক্ত হইয়া, স্বীয় সাহস ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রদর্শনে তাঁহার দলস্থ লোকের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই তেজস্বী যুবক বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সদ্গুণ সকল পরিহার করিয়া, ধূর্ত্ততা ও শঠতার আশ্রয় লইয়া—"শয়তানের নিষ্ঠুর পুত্র, এবং বিশ্বাসঘাতকতার পিতারূপে" পরিগৃহীত হইলেন।

তাঁহার আবাসস্থান পর্ব্বত ও জঙ্গলময় দুর্গম স্থানে ছিল। এই স্থলে পর্ব্বতোপরি তিনি মৃন্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গকে দাক্ষিণাত্যের ভাষায় গারহি বলিত।

শিবাজী নানা উপায় অবলম্বনে পার্ব্বত্য মাওয়ালি প্রভৃতি মারহাট্টা দস্যুদিগকে দলে লইয়া ক্রমশঃ তাঁহার দল পুষ্ট করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি চান্দান নামক দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই সময় বিজাপুর রাজ্যের প্রতাপ ক্রমশঃখর্ব্ব হইতেছিল এবং এই সুযোগেই শিবাজী উত্তরোত্তর তাঁহার দল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই লুণ্ঠন-লোলুপ দস্যুপতি, অধীনস্থ দস্যুদল লইয়া দূরে ও নিকটে চতুর্দ্দিকেই লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিল।

শিবাজী পুনার ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে-স্থিত প্রসিদ্ধ রাজগড় দুর্গ

অধিকার করিলেন। বিজাপুরের বালক অধিপতি সেকেন্দার আলি আদিল খান বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেই অধীনস্থ জায়গীরদার শিবাজীকে এই সমস্ত অত্যাচার ও তাঁহার দস্যুতার নিবারণ কল্পে পত্র লিখিলেন। শিবাজী তাহার কোন উত্তর না দেওয়ায়, আদিল খান এই বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য, সেনাপতি আফ্জাল্ খানকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই মহা-পরাক্রান্ত সেনাপতি তখন শিবাজীকে দস্তুরমত ঠাসিয়া ধরিলেন। তখন এই ধূর্ত্ত নির্দ্দয় বিদ্রোহী, সম্মুখ যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া, চাতুর্য্যজাল বিস্তারে স্বীয় অনুশোচনা জানাইয়া, ক্ষমা ভিক্ষার্থে মোস্‌লেম সেনাপতির নিকট উপর্য্যুপরি দূত প্রেরণ করিলেন।

কয়েকজন প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণ দূত দ্বারা এই সন্ধি বিষয়ক কথাবার্ত্তা চলিতে থাকা কালে, এইরূপ ধার্য্য হইল যে—শিবাজী নিরস্ত্র হইয়া মাত্র চারিজন অনুচর সহ তাহার দুর্গ নিম্নে সেনাপতি আফ্জাল্ খানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিবেন। আফ্জাল খানও সেই ভাবেই গিয়া শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

উভয়পক্ষে এইরূপ দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তার বিষয় ধার্য্য হইবার পর, সেনাপতি আফ্জাল্ খান পাল্‌কি আরোহণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও দেখিলেন—শিবাজী একাকী নিরস্ত্র হইয়া, যেন ভয়ে জড়সড় অবস্থায় তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। মহামতি আফ্জাল্ এই অবস্থা দর্শনে, তাঁহার সশস্ত্র বাহকগণকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। এমন সময় কপটাচার পরায়ণ বিশ্বাসঘাতক শিবাজী, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্রন্দনের ভান করিতে করিতে সেনাপতির পদপ্রান্তে গড়াইয়া পড়িল ও ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। বিশুদ্ধান্তঃকরণ মহাপ্রাণ আফ্জাল খান. স্বীয় পাদদেশ হইতে শিবাজীর মুণ্ড উত্তোলন করিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন

করিবার ইচ্ছায় তাহার পৃষ্ঠে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিতে যাইবার কালে, প্রবঞ্চক দস্যুপতি তাহার হস্তের বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখা ক্ষুদ্র বিছুয়া (ছুরি) অস্ত্র সেনাপতির উদরে এরূপে প্রবেশ করাইয়া দিল যে সেই মুহূর্ত্তে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

তৎপর হইতে দস্যুদলপতি শিবাজী দূরপ্রত্যাগত স্থল-বাণিকগণকে আক্রমণ ও বিনাশ করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিল।

এই দস্যুপতির শত শত দোষের মধ্যে এই একটী গুণ ছিল যে—তিনি কখনও বিজীত দেশের কোন মস্জিদ ধ্বংস বা ধর্ম্মগ্রন্থ কোরআন স্পর্শ করা, কিম্বা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করেন নাই। কোন প্রকারে কোথায়ও পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহার হস্তে পড়িলে, তিনি অতি যত্নের সহিত উহা তাঁহার কোন মোসল্মান অনুচরের হস্তে দিতেন।

ক্রমে শিবাজীর অত্যাচারের বিষয় সম্রাট আওরাঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি দক্ষিণাপথের সুবাদার আমীরুল্ ওমরা শায়েস্তা খানকে এই দস্যুপতিকে শিক্ষা দিবার জন্য অনুমতি দেন। শায়েস্তা খান ১৬৬০ খৃঃ ১০৭০ হিজরীর জমাদিয়ল আউয়ল্ মাসের শেষভাগে, আওরাঙ্গাবাদ হইতে পুনা ও চাকনার দিকে শিবাজীর দমন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। এই সময় শিবাজী পুনা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে ৪০ মাইল দূরে, সুপা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

১লা রজব তারিখে আমীরুল ওমরা শিবগ্রামে পৌছিলেন। মোস্লেম সেনাপতির আগমন সংবাদ পাইয়া শিবাজী, সুপা পরিত্যাগে অন্যদিকে পলায়ন করিল। সেনাপতি বিনা বাধায় সুপা অধিকার করিয়া যদু রায়কে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু যদু রায় তথা হইতে মোস্লেম সেনাগণের রসদ প্রেরণ করিবার কালে, শিবাজীর অধীনস্থ দস্যুগণ, পথে তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইতে লাগিল।

অবশেষে সম্রাট সেনাগণ পুনা ও শিবগ্রাম অধিকার করিলেন। এই সময় শিবাজী সসৈন্যে তাঁহার দুর্ভেদ্য চাকনা দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। সেনাপতি শায়েস্তা খান এই দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং বহু দিবস উহা অবরোধ করিয়া থাকিতে সৈন্যগণকে উপদেশ দিলেন।

প্রায় দুই মাস কাল অবরোধের পর যখন শিবাজী কিছুতেই দুর্গের বাহির হইলেন না, তখন বাদশাহ সেনাগণ সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তন্মধ্যে বিস্ফোরক স্থাপন দ্বারা দুর্গ প্রাকারের একাংশ উঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহসী এস্‌লাম সন্তানগণ আল্লাহতাআলার উপর আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক দুর্গ প্রবেশে শিবাজীর সেনাগণের উপর মহা প্রভঞ্জন বেগে পতিত হইয়া, তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল; সে রাত্রি মোস্‌লেম সেনাগণ বিধর্ম্মীগণের রক্ত ও শবের উপরেই অতিবাহিত করিল। পরদিন প্রত্যুষে পুনরায় শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া সেনাপতি দুর্গ হস্তগত করিলেন। পরাজিত মারহাট্টাগণ যে কয়জন প্রাণ বাঁচাইতে পারিল, শিবাজী সহ নগর মধ্যে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

শিবাজী, রাও ভাও সিংকে আমীরুল ওমরার নিকট পাঠাইয়া দিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এই সময় মধ্যে মোগল সেনাপতি নগর অধিকার করিয়া, উজ্‌বেক্‌ খানকে তথাকার সাময়িক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এবং চাক্‌নার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এস্‌লামাবাদ রাখিলেন।

বাদশাহ আওরাঙ্গজেবের ষষ্ঠ বৎসর রাজত্বকালে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে আমীরুল ওমরা শায়েস্তা খান, পুনায় গমন করিয়া শিবাজীর প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন ও শিবাজীকে গ্রেফতার করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই সময় শিবাজী পর্ব্বতে পর্ব্বতে লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

স্বভাব-প্রবঞ্চক মারহাট্টাগণের উপর সম্পূর্ণ অবিশ্বাস থাকায়, আমীরুল ওমরা শায়েস্তা খান, ঐ বিশ্বাসঘাতকের দলের নগর প্রবেশ এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ছাড়পত্র প্রদর্শন ভিন্ন কোন মারহাট্টার পুনা নগরের মধ্যে যাইবার অধিকার রহিল না।

একদিন মোগল বেতনভোগী একদল মারহাট্টা পদাতিক সেনা, নগর কোতওয়ালের নিকট হইতে একটী বিবাহ সমারোহে দুইশত নিমন্ত্রিত মহারাষ্ট্রীয়গণকে নগর প্রবেশ করিতে দিবার জন্য ছাড় লইয়াছিল। উহারা সন্ধ্যার সময় নগরে প্রবেশ করার পর, আর একদল মারহাট্টা, সম্রাটের মহারাষ্ট্রীয় সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে এইরূপ অবস্থা প্রদর্শন করিয়া, নিরস্ত্র হইয়া হাতে হাতকড়ি ও কোমরে রজ্জু বন্ধনাবস্থায় সন্ধ্যার অন্ধকারে নগরে প্রবেশ করিল। বলা বাহুল্য যে এই উভয় মারহাট্টা দলই শিবাজীর বেতনভোগী সেনা, এবং তাঁহারই আদেশে ও দুরভিসন্ধি মতে, তাহারা এই তস্করের ন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

এই মারহাট্টা সেনাগণ প্রাসাদের অবস্থা পূর্ব্ব হইতে বিশেষরূপে অবগত ছিল। রাত্রিযোগে ইহারা কয়েকজন অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রথমতঃ গবাক্ষ পথ দিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। তৎপরে সদল বলে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহাকে নিরস্ত্র অবস্থায় সম্মুখে পাইতে লাগিল হত্যা করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে শায়েস্তা খান নিদ্রাভঙ্গে উত্থিত হইয়া বর্শাঘাতে সম্মুখস্থ একজন মারহাট্টা তস্করকে বধ করিলেন। এমন সময় একজন মারহাট্টার তরবারির আঘাতে আমীরুল ওমরার বৃদ্ধ অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। এইরূপ আহতাবস্থায় সেনাপতি আরও দুইজন মারহাট্টাকে জলপূর্ণ চৌবাচ্চার জলে ভল্লাঘাতে নরকে প্রেরণ করিলেন। শায়েস্তা খানের বীর পুত্র আবুল ফাতেহ্ খান, তিনজন মহারাষ্ট্রীয়কে হত্যা করিয়া স্বয়ং আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই গুপ্ত

নৈশ আক্রমণে মারহাট্টা দস্যুগণ অনেক নিরীহ স্ত্রীলোকের প্রাণনাশ করিয়াছিল।

প্রাতে রাজা যশোবন্ত সিংহ আমীরুল ওমরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, বিপদকালে তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য প্রধান সেনাপতির নিকট দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করায়, মহানুভব শায়েস্তা খান কেবল মাত্র বিদ্রূপের ভঙ্গিমায় বলিলেন—

"আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমার উপর তস্করগণের এই অত্যাচারের সময়, আপনি দিল্লীশ্বরেরই চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন।"

সম্রাট এই ঘটনা শুনিয়া অসাবধানতার জন্য আমীর ও রাজা যশোবন্ত উভয়কেই মৃদু তিরস্কার করিলেন ও শায়েস্তা খানকে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি করিলেন। তৎপরে স্বীয় পুত্র কুমার মোহাম্মদ মোয়াজ্জম্‌কে দক্ষিণাপথের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন। মহারাজা কুমারের অধীনস্থ সেনানী হইয়া রহিলেন।

অতঃপর শায়েস্তা খান দিল্লী হইতে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। এই সময় শিবাজীর গুপ্ত অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় সম্রাট, রাজা জয়সিংহের অধীনে তাঁহাকে ধৃতকরণ ও দমনার্থে আরও অনেক সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

রাজা জয়সিংহ আওরাঙ্গাবাদে গিয়া কুমার মোয়াজ্জম্‌কে অভিবাদন করিলেন, এবং তৎপরে তাঁহার অনুমতিক্রমে তিনি পুরন্দর ও রুদ্রায় মল্ দুর্গদ্বয় আক্রমণ করিলেন। জয় সিংহের অধীনস্থ সেনাপতি দেলের খান বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে এই দুর্গদ্বয় হস্তগত করিয়াছিলেন।

অতঃপর রাজা জয় সিংহ সেনাপতি দায়ুদ খানকে সাত সহস্র অশ্বারোহী সহ শিবাজীর অধিকৃত সমস্ত দেশ ও দুর্গগুলি হস্তগত করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সুযোগ্য সেনাপতি দায়ুদ খান পূর্ণ পাঁচ মাস কাল ধরিয়া শত্রু

সেনাগণকে একস্থানে তিষ্ঠিতে না দিয়া, শেষে রাজগড়ের দুর্গে শিবাজীকে অবরোধ করিলেন।

অপরদিকে শিবাজীর স্ত্রী-পুত্রগণ, কান্দালা দুর্গে মোগল সেনা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। তখন ধূর্ত্ত শিবাজী বুঝিতে পারিলেন যে দিল্লীশ্বরের সেনাগণ কান্দালা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাঁহার স্ত্রী পরিবারবর্গ তাঁহার দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে। এই ভাবিয়া তিনি সম্রাটের ঐ অঞ্চলের প্রধান সেনাপতি রাজা জয় সিংহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজা, শিবাজীর ধূর্ত্ততা ও অসত্যবাদিতার বিষয় বিশেষরূপে অবগত থাকায়, শিবাজী প্রেরিত দূতকে ফিরাইয়া দিয়া, অধীনস্থ সেনানীগণের প্রতি যে কোন মতে শিবাজীকে বন্দি করিবার জন্য আদেশ দিলেন। এই অবস্থা দর্শনে শিবাজী, তখন কয়েকজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া, তাঁহাদের নিকট সম্রাটের অধীনতা স্বীকার ও জাবজ্জীবন অনুগত হইয়া থাকিবার সম্বন্ধে কঠিন শপথ করিয়া, উহা অবগত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে রাজ-সকাশে পাঠাইয়া দিলেন।

রাজা তদুত্তরে,—"শিবাজী স্বয়ং বাদশাহের নিকট গিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে সম্মত আছেন কি না?"—জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। শিবাজী তখন, রাজার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, রাজ-সমীপে আগমন করিবার জন্য অতিশয় হীনতার সহিত অনুমতি প্রার্থনা করিলেন ও এবং রাজা জয়সিংহের অনুমতিতে করজোড়ে তাহার সন্নিধ্যে আগমন করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—

"আপনার দাস আপনার সম্মুখে উপস্থিত; ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাকে রাখিতে পারেন বা মারিতে পারেন। দাস তাহার দুর্গগুলি ও কোকান প্রদেশ মহামহিমান্বিত ভারত সম্রাটের করে অর্পণ করিতেছে,

এবং আমার পুত্রকে ভারতেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করিব। অতঃপর আমিও বাদশাহের অনুগত ভৃত্য স্বরূপ আপনাদের ন্যায় সেই মহানুভব সম্রাটের হুকুম তামিল করিব।"

তৎপরে রাজা শিবাজীকে ঐ অবস্থায় সেনাপতি দেলের খানের শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। সেনাপতি সম্মানের সহিত মহারাষ্ট্রপতিকে একখানি উৎকৃষ্ট তরবারি উপহার দিয়া মানীর মান রক্ষা করিলেন।

এই বৎসর হিঃ ১০৭৬ সালের রজব ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারি তারিখে বৃদ্ধ সম্রাট শাহাব-উদ্দীন মোহাম্মদ শাহ জাহানের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে সম্রাট, পৌত্র কুমার মোহাম্মদ মোয়াজ্জম্‌কে দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করায়, কুমার দাক্ষিণাত্য হইতে পিতামহের সহিত শেষ সাক্ষাতের আশায় আসিতে ছিলেন, এমন সময় পথেই বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন।

এদিকে বাঙ্গালার সুবাদার আমীরুল ওমরা শায়েস্তা খানের পুত্র ওমেদ খান, সংগ্রাম নগর ও চট্টগ্রামের বিদ্রোহী জমিদারগণকে দমন করিয়া ঐ উভয় দেশ অধিকার করিলেন; এবং প্রথমটির নাম আলমগীর নগর রাখিলেন ও শেষোক্তটী এস্‌লামাবাদই রহিল।

সম্রাটের রাজত্বের এই নবম বর্ষে রাজা জয় সিংহ, শিবাজীকে সম্রাট দরবারে পাঠাইয়াছিলেন। কুমার রাম সিং ও মোখ্‌লেস্‌ খান, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আগ্রায় রাজধানীতে লইয়া আসিলেন; এবং ১০৭৬ হিজরীর ১৮ই জিল্‌কদ তারিখে শিবাজী ও তাহার নবম বর্ষীয় পুত্র শম্ভু, সম্রাট আওরাঙ্গজেবের সমীপে নীত হইলেন।

শিবাজীর উপর দিল্লীশ্বরের পূর্ব্ব হইতেই বিরক্তি ও অভক্তি থাকায় তিনি সেক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। শিবাজীও আশানুরূপ অভ্যর্থনা না পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়া, কুমার রামসিংহ

সকাশে তাঁহার এই অবমাননার বিষয় অতি দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিলেন।

নগরের বাহিরে রাজা জয় সিংহের প্রাসাদ পার্শ্বে শিবাজীর থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল ও রাজা জয়সিংহ আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত শিবাজীকে বাদশাহ দরবারে উপস্থিত হইবার ক্ষমতা দেওয়া হইল না।

শিবাজী এই সময় তাঁহার বাসভবনের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বক্ষণ প্রহরী নিযুক্ত দেখিয়া স্বীয় বন্দি অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিলেন, এবং তাঁহার স্বাভাবিক ধূর্ত্ত বুদ্ধি প্রয়োগে এই অবরুদ্ধ অবস্থা হইতে উদ্ধারের উপায় স্থির করিয়া ফেলিলেন।

প্রথমতঃ পীড়ার অভিনয় করিয়া শিবাজী কয়েক দিবস শয্যাগত রহিলেন, তৎপরে তাঁহার পীড়ার উপশম কল্পে ব্রাহ্মণ ও হিন্দু-মোসলমান সাধুদিগকে মিষ্টান্ন ও নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করিবার অনুমতি চাহিয়া সম্রাটের আজ্ঞাক্রমে একরূপ অপর্য্যাপ্ত দান করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। শেষে বড় বড় মিষ্টান্নপূর্ণ ঝুড়ি কাগজে ঢাকিয়া মথুরায় ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় শিবাজীর পরামর্শ মতে আগ্রা হইতে বহু দূরে দুই তিনটী দ্রুতগামী অশ্ব পূর্ব্বাহ্নে রক্ষিত হইয়াছিল।

একদিন শিবাজী তাঁহার সম আকৃতির একজন অনুগত ভৃত্যকে স্বীয় রোগ শয্যার উপর চাদর ঢাকা দিয়া শোয়াইয়া, তাহার অঙ্গুলিতে নিজ সুবর্ণ অঙ্গুরী পরাইয়া দিলেন। পরে ঐ ভৃত্যকে সর্ব্বক্ষণ অঙ্গুরী পরিহিত হস্তটী বাহির করিয়া রাখিতে উপদেশ দিয়া, পিতা পুত্রে দুইটী বৃহদাকার ঝুড়িতে বসিয়া অপরাপর মিষ্টান্ন পূর্ণ কাগজে ঢাকা ঝুড়ির সহিত বাহিত হইয়া গেলেন।

সফর মাসের শেষ দিনে চতুর শিবাজী, তাহার এই চাতুর্য্যজাল বিস্তারে আগ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে গিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। তৎপরে মথুরায় গিয়া শিবাজী নিজের সুশ্রী শ্মশ্রুরাজি মুণ্ডন করিয়া, পিতাপুত্রে ভস্ম মাখিয়া সাধু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণে যমুনা পার হইয়া, ভ্রমণ করিতে করিতে বারাণসীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময় তাহাদের পিতা-পুত্রের হস্তে যে ফাঁপা (অসার) যষ্টি ছিল, শিবাজী ঐ উভয় যষ্টির খোলের ভিতর যথেষ্ট অর্থ ও রত্ন ভরিয়া লইয়াছিলেন।

এদিকে প্রহরিগণ শিবাজীর রোগ শয্যাশায়ী বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তিকে প্রকৃত শিবাজী মনে করিতে লাগিল; বিশেষতঃ উহার হস্তে শিবাজীর অঙ্গুরী দর্শনে তাহাদের কোনই সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইল না। পরে শিবাজী পলায়ন করিয়াছেন অবগত হইয়া, সম্রাট চতুর্দ্দিকে তাঁহার গ্রেফতারের জন্য সংবাদ প্রচার করিয়া দিলেন।

বারাণসীর পথে প্রস্থান করিবার সময়, শিবাজীকে তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রকে লইয়া বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইল। এ কারণ এলাহাবাদে পৌছিয়া তাঁহার পিতৃবন্ধু কৈলাশ নামধারী জনৈক ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে পুত্র সম্ভুকে রাখিয়া, পুত্রের খরচের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধন তিনি ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া গেলেন।

এই সময় রাজা জয় সিংহ বিজাপুর দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার প্রতি সত্বর শিবাজীর প্রধান সহায় নাথুজীকে গ্রেফতার করিয়া আগ্রায় প্রেরণ করিতে অনুমতি দিলেন। নাথু ও তাহার পুত্র আগ্রায় পৌছিয়াই, মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইল। ইহাতে সম্রাট সন্তোষের সহিত নাথুজীকে মোহাম্মদ কুলি খান উপাধি দান পূর্ব্বক পবিত্র এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, কিছুদিন মধ্যে অনেক সৈন্যসহ সেনাপতি দেলের খানের সাহায্যার্থ দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ

করিলেন। নাথু দক্ষিণাপথে গিয়া অল্পদিন মধ্যেই মোসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, পুনরায় শিবাজীর সহিত মিলিত হইয়াছিল।

শিবাজী ক্রমে ৪০।৪৫ জন সহচর সহ সন্ন্যাসী বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক স্থানে তাঁহারা সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া ফৌজদার আলি কুলি খান কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। শিবাজী তখন ভারতের অগম্য পর্ব্বতারণ্য প্রদেশে প্রাপ্ত লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের একখণ্ড হীরক ও দুইটী চুণী ফৌজদারকে দিয়া অব্যহতি পাইয়াছিলেন।

বারাণসী পৌছিয়াও শিবাজী তথায় শান্তি পাইলেন না। তথা হইতে তিনি বেহার ও পাটনায় পলাইয়া গেলেন, এবং ক্রমশঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে, হায়দ্রাবাদে গিয়া পৌছিলেন ও তথাকার রাজা আবদুল্লা শাহ্ কোতব-উল্-মুলকের শরণাপন্ন হইলেন। হায়দ্রাবাদে গিয়া চতুর শিবাজী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কল্পনা-প্রসূত বাক্-চাতুর্য্য-জাল বিস্তারে আবদুল্লাহ্ শাহকে আশ্চর্য্যরূপে প্রতারিত করিয়াছিলেন।

এই সময় শিবাজী আবদুল্লাহ্ শাহের নিকট ধর্ম্ম সাক্ষ্য রাখিয়া শপথ করিয়াছিলেন যে—তিনি যাবজ্জীবন শাহ্ আবদুল্লাহ্র সমুৎসুক দাস এবং চিরানুগত হইয়া থাকিবেন। আবদুল্লাহ্ শাহও এই শ্রেষ্ঠ প্রবঞ্চকের শপথে প্রতারিত হইয়া, তাঁহার প্রার্থনা মত দুর্গ জয়ের জন্য শিবাজীর অধীনে যথেষ্ট সৈন্য প্রদান করিলেন; তৎসহ তাঁহার অপর সেনানীগণকে শিবাজীর আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিলেন।

প্রতারণা ও চাতুর্য্যদ্বারা শিবাজী অল্পকাল মধ্যে এই হায়দ্রাবাদের সেনা সাহায্যে অনেক দুর্গ অধিকার করিলেন। ক্রমে বিজাপুর রাজের সেতারা ও পায়নালা প্রভৃতি দশবারটী সুরক্ষিত দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে সম্রাট সেনাপতি রাজা জয়সিংহ ও দেলের খানের হস্তে তুলিয়া দেওয়া তাঁহার নিজ রাজগড় দুর্গ পুনরাধিকার করিয়া,

তথায় বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিলেন। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সুরাট অধিকার করেন ও এই স্থান লুণ্ঠন ও ধ্বংস দ্বারা বিস্তর ধনরত্ন হস্তগত করিয়াছিলেন।

সুরাট নগর ধ্বংসের সংবাদ পাইয়া বাদশাহ, দেলের খানের সাহায্যার্থে খান জাহান্‌কে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। দাক্ষিণাত্যে সেনাপতিদ্বয় দুইজন হাব্‌সী সর্দ্দার সিদি ইয়াকুত ও সিদি খয়রাতের সাহায্য পাইয়া অতিশয় উপকৃত হইয়াছিলেন। তাহারাই বাহুবলে শিবাজীর সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত দুর্গ দাণ্ডা-রাজপুরী শিবাজীর হস্তচ্যুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

হিজরী ১০৯০ সালের ২৪ রবিয়ল আখের তারিখে দারুণ গ্রীষ্মের দিনে, অশ্ব হইতে অবতরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত রক্ত বমণ হইয়া শিবাজীর মৃত্যু হয়।

—[মোহাম্মদ হাশেম্ লিখিত মোন্তে খাবল্ লোবাব।]

সপ্তদশ সর্গ

আমীরুল্ ওমরাহ নওয়াব শায়েস্তা খান।

মীর জুম্‌লার মৃত্যুর পর উজীর আসফ্‌জার (নূর জাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র) পুত্র শায়েস্তা খান বাঙ্গালা বেহারের সুবাদার হইয়া আসিলেন। কিন্তু ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে পুনা নগরে শিবাজীর প্রাসাদে তিনি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলিতে যে গুরুতর আঘাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ক্ষত তদবধি আরোগ্য না হওয়ায়, তাঁহার অধীনে দাউদ খানকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, রাজকার্য্য পরিচালনের অনুমতি পাইলেন।

আরাকাণ রাজ তখনও পর্য্যন্ত মোগলগণের দ্বারা সোলতান সুজাআ'র হত্যার কোন প্রতিকার না পাইয়া, মোগলেরা ভীত হইয়াছেন বিবেচনায় সমুদ্র তীরবর্ত্তী মোগলাধিকৃত স্থান সকল আক্রমণ ও লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিল। এমন কি এই মগ-দস্যুগণের ভয়ে, সুদূর ঢাকাবাসীগণকে পর্য্যন্ত এই সময় সর্ব্বক্ষণ ত্রস্ত থাকিতে হইয়াছিল।

শায়েস্তা খান হিঃ ১০৭৫ সালে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় ত্রয়োদশ সহস্র সৈন্য ও তাহাদিগের জলপথে যাইবার উপযোগী নৌবহর প্রস্তুত করান। মগ দস্যুদিগকে বাঙ্গালা দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত ও তাহাদের অধিকৃত দ্বীপগুলি দখল করিবার জন্য হোসেন বেগের অধীনে উহার মধ্যে তিন সহস্র সৈন্য জলপথে প্রেরণ করিলেন। স্বীয় পুত্র ওমেদ খানের অধীনে অবশিষ্ট সৈন্য, হোসেন বেগের সহিত মিলিত হইবার জন্য স্থলপথে পাঠাইয়া দিলেন।

নৌসেনাগণকে লইয়া বঙ্গেশ্বরের নৌবহর ক্রমে মেঘনা নদীতে পড়িল। হোসেন বেগ সমুদ্রতীরবর্ত্তী জগ্‌দিয়া ও আলম্‌গীর নগর অধিকার করিয়া সন্দ্বীপে পৌছিলেন এবং তথাকার আরাকাণ যুদ্ধজাহাজগুলি সহজেই করায়ত্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু এই দ্বীপের চতুর্দ্দিকে মগেরা যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠ পুতিয়া, অত্যুচ্চ সুদৃঢ় বেড়া বাঁধিয়াছিল, তাহা ভগ্ন করিয়া দ্বীপ অধিকার করিতে হোসেন বেগকে অনেক বেগ পাইতে হইল।

সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া সেনাপতি পর্ত্তুগীজদিগকে পত্র দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিলেন যে—তাহারা মগ রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে না আসিলে, তিনি উহাদের উপর হুগলীর ব্যাপারের পুনরভিনয় করিবেন। এই ভয় প্রদর্শনের ফল হোসেন বেগ যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ফলিল। পর্ত্তুগীজগণ এই সময় হইতে আরাকাণ রাজের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

সেনাপতি তাহাদের মধ্যে আরাকাণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিতে ইচ্ছুক এমন কয়েকজনকে সঙ্গে রাখিয়া, অবশিষ্ট পর্ত্তুগীজগণকে সুবাদারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সুবাদার শায়েস্তা খান, ইহাদিগের বাসস্থানের জন্য ঢাকা নগর হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে একটী গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেই স্থান এখনও ফিরিঙ্গিবাজার নামে খ্যাত। ঐ সকল পর্ত্তুগীজের বংশধরেরা অনেকে এখনও তথায় বাস করিতেছে।

সুবাদার পুত্র উমেদ খান, ফেণী নদীর তীরে আসিয়া দেখিলেন যে—একদল মগদস্যু তাঁহার নদী পথে অগ্রসরে বাধা জন্মাইবার জন্য, পরপারে সমবেত হইয়াছে। কিন্তু এই পুষ্টাঙ্গ দৃঢ়কায় মোগল অশ্বারোহী-গণের (যাহাদের স্বরূপ তাহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও অবলোকন করে নাই) বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি তাহাদের প্রাণে এতাধিক ভয়োৎপাদন করিল যে,

আরাকাণ দস্যু সেনাগণ তাহাদিগকে দেখিবামাত্র দ্রুতবেগে নদীকুল ছাড়িয়া চট্টগ্রামাভিমুখে পলায়ন করিল।

এই সময় হোসেন বেগ, সহকারী সেনাগণের আগমন সংবাদ পাইয়া, তাহাদের সহিত মিলিবার জন্য সন্দ্বীপ হইতে আসিতেছিলেন; কিন্তু কামোরিয়ার বিপরীত দিক হইতে তিনি অন্যূন তিনশত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরাকাণ যুদ্ধ জাহাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার সমভিব্যাহারী পর্ত্তুগীজগণ দ্বারা তিনি বিশেষরূপে সাহায্য পাইয়াছিলেন। ক্রমে সেনাপতি তীরের দিকে আসিয়া পড়ায়, ওমেদ খান তাঁহার কামান ও বন্দুকধারী সৈন্যগণ লইয়া হোসেনের যুদ্ধতরী সমূহে আরোহণ করিলেন। পরদিন মগ নৌসেনাগণ পুনরায় মোগলের রণতরী আক্রমণ করিলে, মোগলের কামান তাহাদিগকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়া দিল।

এই যুক্ত-সেনা তৎপরে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিল। তাহারা চট্টগ্রামে পৌছামাত্র দুর্গমধ্যস্থ মগ সেনাগণ যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। মোস্‌লেম অশ্বারোহীগণ মগগণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের মধ্যে ন্যূনাধিক দুই সহস্র মগসেনাকে বন্দি করিলেন। এই অভিযানে দুই সহস্র তেইশটী কামান ও বিস্তর খাদ্য দ্রব্য মোগলসেনার হস্তগত হইয়াছিল। উমেদ খান এসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) পুনরুদ্ধার করিলেন।

শায়েস্তা খান ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তৎপরে আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি সম্রাট কর্ত্তৃক আগ্রা বিভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

শায়েস্তা খানের শাসন কালে ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসি ও দিনেমারেরা বাঙ্গালায় বাস করিবার অনুমতি পায়। দিনেমারেরা (ডেনিস্) গঙ্গাতীরবর্ত্তী শ্রীরামপুরে বাস করিয়া ঐ স্থানে কুটী নির্ম্মাণ করিতে থাকে।

নওয়াব কেদায় খান আজিম খান

অনন্তর সম্রাট আওরাঙ্গজেব, কেদায় খানকে আজিম খান উপাধিতে ভূষিত করিয়া, বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পর বৎসরই ঢাকা নগরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

সোলতান মোহাম্মদ আজম্

এইবার বাদশাহের আদেশ ক্রমে তাঁহার তৃতীয় পুত্র কুমার মোহাম্মদ আজম্ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে ঢাকায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এই বৎসরের শেষভাগে মোহাম্মদ আজম্, আসামীগণের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। মোগলেরা প্রথমেই গৌহাটি অধিকার করিল।

এই সময় বাদশাহ্ দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার শিবাজীর দমনে নিযুক্ত থাকায়, সাম্রাজ্যের অন্যত্র সেনা প্রেরণ করিয়া, মারহাট্টা দমনের জন্য অপরাপর প্রদেশ হইতে সেনাগণকে সমবেত হইতে আদেশ দিয়াছিলেন।

১০৯০ হিঃ ৭ই রমজান ১৬৭৯ খৃঃ ১৪ই আগষ্ট তারিখে সোলতান আজম্ পিতৃ আদেশ ক্রমে সসৈন্যে ঢাকা পরিত্যাগ করিলেন। সোলতান যেরূপ ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধ-সজ্জায় সসৈন্যে পিতৃসান্নিধ্যে গমন করিতে লাগিলেন; ইতিপূর্ব্বে বাদশাহ্ আকবরের আগ্রা হইতে গুজরাটে মাত্র নয় দিনের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ যাত্রা ব্যতীত, ভারতের আর কোন রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি এইরূপ দ্রুতগতিতে সৈন্য পরিচালনা করিতে পারেন নাই।

কুমার আজম্, তাঁহার অষ্টম বর্ষীয় পুত্র বেদার বখ্‌তকে লইয়া রাত্রি দুই প্রহরে পাল্কী আরোহণ করেন ও পর দিবস সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ঐ পাল্কি-তেই অবস্থান করিলেন। সন্ধ্যা সমাগমে পাল্কী হইতে নামিয়া সান্ধ্য নামাজ পড়িয়াই অশ্বারোহণ করেন ও পরদিন বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত

অশ্ব পৃষ্ঠেই অবস্থান করিয়াছিলেন। এই প্রকারে পঞ্চদশ দিবসে বিস্তর নদনদী পার হইয়া ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া সোলতান বারাণসী পৌছিলেন। কুমারের সমভিব্যাহারী এক সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহীর অতি অল্প সংখ্যকই তাঁহার সঙ্গে তথায় পৌছিতে পারিয়াছিল।

বারাণসী হইতে মাত্র দ্বাদশ দিবসে কুমার, আজমীর ও যোধপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পিতৃ সন্নিধানে গিয়া পৌছিলেন। পথিমধ্যে কুমার ও তাঁহার সেনাগণ বরাবর অশ্ব পরিবর্ত্তন করিতে করিতে গিয়াছিলেন। এই অভিযানের শেষ দিনে কুমার মোহাম্মদ আজম্ সহচরগণের সহিত সপ্ততিতম মাইল (৭০) পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন।

এই কঠোর অভিযানে পথে, সম্রাট নন্দন হইতে সামান্য সেনাগণকে পর্য্যন্ত একই আহার্য্য রুটী ও শুষ্ক ফলের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। একদিন বালক বেদার বখ্‌ত এই শুষ্ক খাদ্য খাইতে অপারক হইয়া, খিচুড়ি খাইবার জন্য অনুরোধ করায়, কুমারের অনুমতি ক্রমে একজন অনুচর নিকটবর্ত্তী পান্থনিবাস হইতে একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত অপরিচ্ছন্ন পাত্রে কিঞ্চিৎ খিচুড়ি আনিয়া বালককে দিল, কিন্তু দিল্লীশ্বরের পৌত্র, সম্রাট বাবরের বংশধর সেই অষ্টম বর্ষীয় বালক, অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত সত্ত্বেও, কাষ্ঠ পাত্রে স্থাপিত খাদ্য মুখ-বিবরে উঠাইতে বা আস্বাদন পর্য্যন্ত লইতে পারিলেন না। অবশেষে পিতা, পুত্রকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন—"পরওয়ার দেগারের অনুগ্রহে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই রাজভোগে পরিতৃপ্ত হইব!"

বালক বেদার বখ্‌ত পিতার কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া, নীরবে তাঁহাদের সঙ্গে থাকা শুষ্ক রুটি ও শুষ্ক ফল খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

সোলতান মোহাম্মদ আজম্ পিতার নিকট পৌছিয়া, পিতৃ আদেশে শিবাজীর পক্ষভুক্ত রাজপুত রাজাগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ

নওয়াব শায়েস্তা খান আমীরুল্ ওমরা

দ্বিতীয়বার

১০৯০ হিজরীর শেষ ভাগে নওয়াব শায়েস্তা খান, দ্বিতীয়বার বাঙ্গালা বেহারের সুবাদার নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আগমন করিলেন।

এই বার বাদশাহের অনুমতি ক্রমে শায়েস্তা খানকে হিন্দু ও খৃষ্টান-দিগের উপর জিজিয়া কর বাসাইতে হইয়াছিল। রুগ্ন, অন্ধ ও খঞ্জ ব্যতীত ব্যাধিশূন্য সকল হিন্দুগণকে তাহাদের সম্পত্তির আয়ের উপর হাজারকরা সাড়ে ছয় টাকা হিসাবে; এবং বিদেশী বাণিজ্য ব্যবসায়ী খৃষ্টান প্রজাগণকে তাহাদের মূলধনের উপর শতকরা দেড় অর্থাৎ হাজারকরা পনের টাকা হিসাবে রাজকর দিতে হইত;

ইংরেজ কুটীওয়ালাগণ এই অতিরিক্ত কর আদায়ে উত্যক্ত হইয়া বাদশাহের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্ব্বক, তাঁহাদের ব্যবসায় চালাইবার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফর্ম্মান আনাইবার চেষ্টা করিলেন। বহু কষ্ট স্বীকার ও অর্থ ব্যয়ের পর, ইংরাজ প্রতিনিধি বাদশাহী ফর্ম্মান লইয়া ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুলাই তারিখে হুগলীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেইদিন ইংরাজ কোম্পানির জাহাজ ও গঙ্গাতীর হইতে সম্রাটের ফরমান প্রাপ্তির আনন্দ সূচক তিনশত তোপধ্বনি হইয়াছিল।

ইংরাজেরা মিষ্টার হেগস্‌কে তাঁহাদের দলপতি নিযুক্ত করিয়া হুগলীতে

তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন; এবং তাঁহার সম্মানের জন্য বিংশতি জন ইউরোপীয় দেহরক্ষী সেনা নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন।

১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি নওয়াবের নিকট তাঁহাদের সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত গঙ্গার মোহানায় একটী দুর্গ প্রস্তুতের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল। নওয়াব এই বিদেশীগণকে এইরূপ অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদানে অস্বীকৃত হইয়া, অধিকন্তু সম্রাট প্রদত্ত ফর্‌মানের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। বার্ষিক তিন সহস্র টাকা কর প্রদানের পরিবর্ত্তে, উহাদিগের দ্বারা আনীত বাণিজ্য দ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা হিসাবে শুল্ক ধার্য্য করিয়া দিলেন; এবং দিল্লীর দরবারে লিখিয়া উহা বাদশাহের অনুমোদন করাইয়া লইলেন। বলা বাহুল্য ইহাতে ইংরাজ কোম্পানির ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংলণ্ডীয় সভার সভ্যগণ, এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেম্‌সের নিকট ইহার প্রতিকার স্বরূপ নওয়াবের বিরুদ্ধে, এমন কি আবশ্যক হইলে দিল্লীশ্বর মহান আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অনুমতি চাহিলেন।

রাজা জেমস্‌ তাঁহাদের প্রার্থনা অনুসারে, ভাইস্ এ্যাড্‌মিরাল নিকোল্‌সনকে ১২টা হইতে ৭০টা কামানবাহী দশখানি মানওয়ারি জাহাজ, ছয়শত গোলন্দাজ সেনা এবং মান্দ্রাজের সেণ্টজর্জ্জ দুর্গ হইতে আরও চারি শত সেনা লইয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনাগণের সমভিব্যাহারে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে অনুমতি প্রদান করেন।

নিকোল্‌সনের প্রতি ইংরাজ রাজের এই আদেশ রহিল যে—তিনি বালেশ্বর হইতে কোম্পানির এজেণ্টকে সঙ্গে লইয়া প্রথমতঃ চট্টগ্রাম বন্দর অধিকার করিয়া, অতিরিক্ত দুই শত কামান দ্বারা উক্ত বন্দর সুদৃঢ়

করিয়া রাখিবেন। এই ব্যাপারে তিনি মোগল-শত্রু আরাকাণ রাজের সহিত মিলিত হইবারও আদেশ পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি হিন্দু রাজা ও জমিদারগণের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন, এইরূপ উপদেশও পাইলেন।

এইরূপে চট্টগ্রাম অধিকারের পর, এ্যাড্‌মিরাল্ নিকোলসন্ ঢাকা নগর আক্রমণ করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত রহিল।

কতকগুলি অনালোচিত ঘটনা সংঘটিত হইয়া, বৃটিশ-রাজের এই সুখ-স্বপ্ন-সৌধ ও বৃটিশ রণবহরের ভারত আক্রমণ কল্পনা, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ওলট্ পালট্ করিয়া দিল। তন্মধ্যে বিরুদ্ধ বায়ুই তাহার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। প্রভঞ্জন তাড়নে বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজগুলি সমুদ্র যাত্রাকালে পথিমধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে সদলবলে আর ভারত-মহাসাগরে প্রবেশ করিতে হইল না।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনজন ইংরাজ পদাতিক হুগলীর বাজারে কয়েকজন নওয়াব সেনার সহিত কলহ করিয়া, গুরুতর আহত হয়। তাহাদের রক্ষার জন্য শেষে সমস্ত ইংরাজ সেনা নওয়াব সেনাগণকে আক্রমণ করে। এই সময় নগরের বাহিরে অবস্থিত নওয়াব সেনাগণ আসিয়া তাহাদের দলস্থ সেনার সহিত যোগদান করে। এইরূপে উভয় পক্ষের মধ্যে যে খণ্ডযুদ্ধ হয় তাহাতে ৬০ জন মোগল সেনা হত ও আহত হইয়াছিল।

এদিকে এ্যাড্‌মিরাল নিকোল্‌সন এই অবস্থায় তাঁহার রণতরী হইতে নগরে কামান দাগিয়া প্রায় পাঁচশত গৃহ অগ্নিদগ্ধ করিয়া দিলেন। ফৌজদার এই ব্যাপারে ভীত হইয়া পড়িলেন ও অতিশয় নম্রতা প্রদর্শনে মিঃ চার্ণকের সহিত তাহাদের প্রস্তাবিত সন্ধি শর্ত্তে সম্মত হইলেন।

নওয়াব শায়েস্তা খান এই খণ্ড যুদ্ধ ও ফৌজদার ঘটিত ব্যাপার শ্রবণ মাত্র পাটনা, মালদহ, ঢাকা এবং কাশিম বাঁজারের ইংরাজগণের কুটিসমূহ

দখল করিবার অনুমতি দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজগণকে হুগলী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

হুগলীর ইংরাজ বণিকেরা এই সংবাদ পাইয়াই ২০শে ডিসেম্বর তারিখে হুগলী পরিত্যাগ করিয়া, সুতানুটি (কলিকাতা মহানগরীর মধ্যবর্ত্তী গঙ্গার তীরবর্ত্তী হাটখোলা) নামক স্থানে চলিয়া আসিলেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে নওয়াবের অশ্বারোহী সেনা হুগলী আসিয়া পৌঁছিল। মিঃ চার্ণক এই সংবাদ পাইতেই পুনরায় সুতানুটি পরিত্যাগ করিয়া, ভাগীরথী মোহনাস্থ অস্বাস্থ্যকর হিজ্‌লি দ্বীপে পলায়ন করিলেন; এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ স্থানে ভাগীরথীর মধ্যে রণতরী রক্ষা করিয়া ইংরাজগণ শত্রুর আগমন পথ রোধ করিয়া রহিলেন।

মোগল সেনানী আবদুস সামাদ খান, এই স্থানের অতিশয় অস্বাস্থ্যকর জল বায়ুর বিবরণ পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন; এবং ঐ জল বায়ু ঘটিত মহামারী তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রুতা সাধনে কৃতকার্য্য হইবে বিবেচনা করিয়া, তিনি আর উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনর্থক সেনা ক্ষয় করিলেন না।

সেনাপতি আবদুস্‌ সামাদের অনুমান অচিরে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। তিন মাসের মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক ইংরাজ সেনা হিজ্‌লিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল; অবশিষ্ট প্রায় সকলকেই হাসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

ইহার পর মিঃ চার্ণকের সহিত নওয়াবের এই শর্ত্তে সন্ধি হইল যে—নওয়াব ইংরাজ বণিকগণকে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কুটিতে ব্যবসায় চালাইতে দিবেন, কিন্তু ইংরাজেরা তাহাদের কোন যুদ্ধ জাহাজ ভাগীরথী বহিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না।

এই সন্ধির পর মিঃ চার্ণক উলুবেড়িয়ায় অবস্থান করিবেন সিদ্ধান্ত করিলেন। কিন্তু মাত্র তিন মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া, পুনরায় সুতানুটি প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি লইয়া, তথায় কুটি প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত সসৈন্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চালা ঘরে বাস করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ সেনা কর্ত্তৃক হুগলীতে মোগল সেনা নাশের সংবাদ বাদশাহের কর্ণে পৌছিতেই, সম্রাট রাগান্ধ হইয়া সমস্ত ইংরাজগণকে বাঙ্গালা দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার অনুমতি দিলেন। এই ব্যাপারে ইংরাজগণের মধ্যে অনেকে ঢাকায় বন্দী হইয়া রহিল।

নওয়াব শায়েস্তা খানের শাসনকালে, খাদ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিবার দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার রাজত্ব কালে তিনি টাকায় ৬৪০ পাউণ্ড (প্রায় আট মণ) পর্য্যন্ত চাউল বিক্রীত হইতে দেখিয়া গিয়াছেন; এবং উহা চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে নওয়াব, ঢাকা নগরের পশ্চিম ফটক্ তাঁহার নগর পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সুদৃঢ়রূপে বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিয়া যান। নওয়াব ঐ আবদ্ধ ফটকের উপর লিখিয়া গিয়াছিলেন যে—যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার পরবর্ত্তী কোন শাসনকর্ত্তা চাউলের বাজার দর এইরূপ কমাইতে না পারিবেন, ততদিন যেন এই বন্ধ দ্বার খোলা না হয়। নওয়াব সরফরাজ খানের সময় পর্য্যন্ত এই দ্বার সেই ভাবেই বন্ধ ছিল।

শায়েস্তা খান বৃদ্ধ বয়সে আগ্রা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, হিঃ ১১০৫ সালে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

নওয়াব এব্রাহিম খান

শায়েস্তা খানের পর বাদশাহ আওরঙ্গজেব শাহ্‌জাহানের কান্দাহার বিজয়ী সেনাধ্যক্ষ পারস্য দেশীয় আলি মর্দান খানের পুত্র এব্রাহিম খানকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিলেন। এব্রাহিম খান পিতার

ন্যায় যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ না হইলেও, তিনি একজন নিরপেক্ষ বিচারক ও কৃষি এবং বাণিজ্যের উৎসাহ দাতা সুবাদার ছিলেন।

নওয়াব শায়েস্তা খানের শেষ জীবনের ব্যবহারে, ইংরাজ বণিকগণ বাঙ্গালা ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই ঢাকায় অবরুদ্ধ হইয়াছিল। নব নিযুক্ত সুবাদার ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ঐ সকল কারারুদ্ধ ইংরাজ বণিককে কারামুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে পুনরায় নূতন করিয়া ব্যবসারম্ভের অনুমতি দিলেন।

সুবাদারের অনুমতি পত্র পাইয়া মিঃ চার্ণক আবার ত্রিশজন সেনা ও অপরাপর ইংরাজ সঙ্গীগণ সহ ২৪শে আগষ্ট তারিখে সুতানুটি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এবার সুবাদারের আদেশ ক্রমে, হুগলীর ফৌজদার মীর আলী আক্‌বর ইংরাজ বণিকদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

১৬৯১ খৃষ্টাব্দে নওয়াব এব্রাহিম খান, বাদশাহের নিকট হইতে 'হাস্‌বল হোকুম' আনাইয়া মিঃ চার্ণকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই নূতন অনুমতি পত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাত্র বার্ষিক তিন সহস্র টাকা প্রদানে, বিনা শুল্কে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পারিবেন এইরূপ অনুমতি ছিল। কিন্তু এই অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও, নওয়াবের অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদারগণ এই বণিক সম্প্রদায়কে নানা প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকায়, তাহারা নওয়াবের নিকট তাহাদের সুতানুটির কুটির নিরাপদের জন্য, ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন ও প্রাচীর বেষ্টন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল।

এই সময়ে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের আদেশ-ক্রমে সুবাদার, ইংরাজ কোম্পানীর প্রতি বারুদ প্রস্তুতের প্রধান উপাদান শোরা ক্রয় করিবার ও চালান দিবার নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করায়, কোম্পানীকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন কীড্ কয়েকটী বড় বড় জাহাজ লইয়া ভারত-মহা-সমুদ্রে জল-দস্যুতা আরম্ভ করিয়া দিল। ক্রমে তাহারা উহার সীমা অতিক্রম করিয়া দুইখানি হেজাজ যাত্রীর জাহাজ লুণ্ঠন করায়, সম্রাট রাগান্ধ হইয়া ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরাজ সকল ইউরোপীয় কোম্পানীরই ভারতে বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবার আজ্ঞা দিলেন। এই সময় কেবল মাত্র পরম দয়াবীর নওয়াব এব্রাহিমের অনুগ্রহে, বাঙ্গালায় ইংরাজেরা গোপনে তাহাদের ব্যবসায় চালাইতে পারিয়াছিলেন।

হিঃ ১১০৭ সনে শোভা সিং নামক একজন জমিদার, বর্দ্ধমান বিভাগের মোগল ফৌজদার রাজা কিষণ রামের সহিত বিবাদ করিয়া, উড়িষ্যা হইতে পাঠানগণের শেষ বংশাবতংশ রহিম খানকে ভাকাইয়া আনিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, বর্দ্ধমানে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে; এবং যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রথমতঃই রাজা কিষণ রাম ও পরে তাঁহার পরিবারবর্গের অনেককে নিহত করিয়া, বর্দ্ধমান রাজের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লয়। এই সময় রাজার একমাত্র পুত্র জগৎসিং পলাইয়া রাজধানী ঢাকায় গিয়া সুবাদারকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিয়াছিলেন। সুবাদার এব্রাহিম খান, যশোহরের অকর্ম্মণ্য ফৌজদার নুরুল্লাহ্‌কে বর্দ্ধমানের বিদ্রোহ দমনের আদেশ দিলেন।

এই ফৌজদার নুরুল্লাহ্ একজন ব্যবসাদার অর্থ-পিশাচ ও অকর্ম্মণ্য রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন। বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জনই তিনি তাঁহার জীবনের মোক্ষ স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বরের হুকুমে এই যুদ্ধ বিদ্যায় সম্পূর্ণ অপারদর্শী ফৌজদারকে তিন সহস্র অশ্বারোহী লইয়া অগত্যা যশোহর পরিত্যাগ করিতে হইল।

বিদ্রোহীগণের আগমনে ফৌজদার নূরুল্লাহ্ তাহাদিগকে আক্রমণ না করিয়া, স্বয়ং হুগলীর দুর্গ মধ্যে আত্মগোপন করিলেন ও তথা হইতে

চুঁচুড়ার দিনেমার গভর্ণরের সাহায্য চাহিলেন। অবস্থা দর্শনে বিদ্রোহী সেনাগণ হুগলী আক্রমণ করিল। কাপুরুষ ফৌজদার নুরুল্লাহ্‌ রাত্রিকালে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া, স্বীয় প্রাণ লইয়া যশোহরে পলায়ন করিল। বিদ্রোহী শোভা সিংহের সেনাগণ তখন লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিল।

এই সময়ে চুঁচুড়ার দিনেমার, চন্দন নগরে ফরাসী এবং সুতানুটির ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ, এই বিদ্রোহীগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, নওয়াবের নিকট অনুমতি লইয়া, তাহাদের নিজ নিজ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি পরিখা বেষ্টিত করিয়া, উচ্চ প্রাচীর দ্বারা ঘিরিয়া লইয়াছিলেন; এবং ইহা হইতেই তিনটী ইউরোপীয় দুর্গের সূত্রপাত হইল।

বিদ্রোহীগণ হুগলী লুণ্ঠনের পর, চুঁচুড়া আক্রমণ করিল। কিন্তু দিনেমারগণের বন্দুক ও কামানের গোলার ভয়ে, পশ্চাৎপদ হইয়া হুগলী হইতে চারি মাইল উত্তর-পশ্চিমে ভাগীরথী তীরবর্ত্তী সপ্তগ্রামে চলিয়া গেল। পরে সপ্তগ্রাম হইতে শোভা সিং, রহিম খানকে তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট সেনা সমভিব্যাহারে নবদ্বীপ ও মুরশিদাবাদ অধিকার করিতে পাঠাইয়া দিল।

শোভা সিং স্বীয় পাশব-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আশায় বর্দ্ধমান বিজয় কালে, রাজা কিষণ রামের একটী পরমা সুন্দরী যুবতী কন্যাকে গোপনে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে রহিম খানকে বিদায় করিয়া দিয়া, নরপিশাচ তাহার নীচ আশা পরিপূর্ণ করিবার সুযোগ পাইল।

শোভা সিং একদা রাত্রে গোপনে রাজকুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহার বহুদিনের সঞ্চিত অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছায়, পাশবিক বল প্রয়োগে রাজনন্দিনীকে যেমন দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিতে গেল, অমনি কুমারী তাহার বক্ষ বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত শাণিত ছুরিকা,

পাষণ্ডের উদরে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়া, নরপ্রেতের ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল। রাজকুমারী সঙ্গে সঙ্গে ঐ ছুরিকা টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া, স্বীয় বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ শান্তিদায়িনী মৃত্যুর শরণাপন্না হইল।

শোভা সিংহের মৃত্যুতে সমস্ত সৈন্য রহিম খানকে তাহাদের দলপতি বরণ করিয়া লইল। তদবধি রহিম খান, রহিম শাহ্ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত, ভাগীরথির পশ্চিম তীরস্থ সমস্ত ভূভাগ, বিদ্রোহীগণের করতলগত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রত্যহ বিদ্রোহীদল কর্ত্তৃক নূতন নূতন দেশ অধিকারের সংবাদ সুবাদারের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। কিন্তু এই অলস শাসনকর্ত্তা, স্বীয় সাহসী পুত্র ও সভাসদগণের উপদেশ অবহেলা করিয়া সর্ব্বদাই উত্তর দিতেন যে—

"আত্ম-বিদ্রোহ অতীব ভয়াবহ বস্তু। ইহাতে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের জীবন অনর্থক নষ্ট করা হয়। বিদ্রোহীগণ আপনা হইতেই ক্ষান্ত হইবে; না হয় তাহারা সামান্য দুই একটী দেশ অধিকার করিয়া, বাদশাহের রাজস্বের যৎসামান্য ক্ষতি করিবে।"

এদিকে রহিম শাহ্ লুণ্ঠন ও দেশ জয় করিতে করিতে মুরশিদাবাদে পৌছিলেন। তথায় গিয়া তিনি প্রথমতঃ সুবাদারের অধীন প্রবল পরাক্রান্ত জায়গীরদার নেয়ামৎ খানকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার ও তাঁহার সহিত যোগ দিতে আহ্বান করিলেন। নেয়ামৎ খান সগর্ব্বে উত্তর দিয়াছিলেন—

"আমি দিল্লীশ্বরের অধীন কর্ম্মচারী, এবং তাঁহার রাজভক্ত প্রজা। আমি কোন মতেই তুচ্ছ বিদ্রোহীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না।"

বিদ্রোহী সর্দ্দার, নেয়ামতের এই উত্তরে ক্রোধান্ধ হইয়া, তাঁহার এক দল সেনাকে, নেয়ামতকে গ্রেফতার করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধুবর্গ ও সভাসদগন এই কার্য্য তত দূর সহজ সাধ্য নহে বুঝাইয়া

দেওয়ায়, রহিম শাহ্‌ একদল পাঠান আশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া স্বয়ং নেয়ামৎ খানের দমনোদ্দেশে বহির্গত হইলেন। নেয়ামতের রাজধানীতে পৌছিয়া রহিম অবলোকন করিলেন যে—বিপক্ষের সেনাগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

এই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্য্যন্তও, যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন কোন স্থানে এই নিয়মে অবসান হইত যে—উভয় পক্ষীয় সেনাগণ অন্তরে দণ্ডায়মান থাকিত ও দুইজন সেনাধ্যক্ষ দ্বৈরথ বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং এই সেনাপতিদ্বয়ের জয়-পরাজয়ের উপরেই সমস্ত ফলাফল নির্ভর করিত।

নেয়ামৎ খানের ভ্রাতুষ্পুত্র তহুয়ার খান একাকী অশ্বারোহণে রণক্ষেত্রে আগমন করিয়া, প্রতিপক্ষের যে কোন একজন আফগানকে তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাঁহার আহ্বানে পাঠান সেনার ভিতর হইতে কেহই একাকী অগ্রসর হইতে সাহস না করিয়া, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া তেজস্বী তহুয়ারকে আক্রমণ করিল; এবং যুবক তহুয়ারের বন্ধুবর্গ তাঁহার সাহায্যার্থে পৌছিবার পূর্ব্বেই, শত্রু সেনা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অস্ত্রাঘাতে দ্বৈধীকৃত করিল।

এই সংবাদ যখন নেয়ামৎ খানের নিকট পৌছিল তখন ফৌজদার, একটী সূক্ষ্ম মস্‌লিনের পিরহান্‌ গায়ে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বীরপুঙ্গব নেয়ামৎ তাঁহার শিরস্ত্রাণ বা বর্ম্ম পরিধান না করিয়া ঐ অবস্থায় কেবলমাত্র একখানি তরবারি গ্রহণে নিকটস্থ অশ্বে আরোহণ করিয়া, বেগে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। নেয়ামৎ খান প্রথমেই বিদ্রোহী রহিমের পতাকা অবলোকন করিয়া, তথায় গিয়া উপনীত হইলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতির মস্তকে সবলে তরবারির আঘাত করিলেন। কিন্তু তাঁহার তরবারি রহিম শাহের লৌহ নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণের কোনই অনিষ্ট সাধন করিতে পারিল না দেখিয়া, তিনি রাগে তাঁহার তরবারির বিপরীত দিক (হাতল) দ্বারা

রহিম শাহের পঞ্জরে এরূপ বেগে আঘাত করিলেন যে—রহিম, নেয়ামৎ প্রদত্ত অঘাতের গুরুত্ব সহ্য করিতে অপারক হইয়া অশ্ব হইতে ভূপতিত হইলেন। বীরবর নেয়ামৎ তৎক্ষণাৎ স্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, রহিম শাহের বৃহৎ ছুরিকা টানিয়া লইয়া তাঁহার কণ্ঠদেশে বসাইতে গেলেন; কিন্তু রহিমের শিরস্ত্রাণের লৌহময় শৃঙ্খল তাহাতে বাধা প্রদান করিল। এমন সময় পাঠান সেনাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তৎপরে মোগলদিগের বহু সৈন্য বিনষ্ট করিয়া, পাঠানেরা নেয়ামৎ খানের প্রাসাদ লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

অতঃপর বিদ্রোহী দল, ৫০০০ সহস্র সম্রাট সেনাগণকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া দিয়া, মুরশিদাবাদ নগর লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিল। কাশিমবাজারের ধনী ব্যবসায়ীগণ এই অবস্থা দর্শনে রহিম শাহের শরণাপন্ন হওয়ায়, তিনি উহাদের প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই। এই সময় রহিম শাহের অপর একদল বিদ্রোহী সেনা সুতানুটি আক্রমণ করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল অগ্নিদগ্ধ করিয়াছিল।

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বিদ্রোহীদল রাজমহল ও মালদহ অধিকার করিয়া, তথাকার অধিবাসীবৃন্দের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছিল।

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এই বিদ্রোহের সংবাদ প্রাপ্তে বাদশাহ্ আওরাঙ্গজেব, তাঁহার শাসনকর্ত্তার ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত ও তৎসহ অতিশয় রুষ্ট হইয়া, এব্রাহিম খানের উপর এই অনুমতি প্রেরণ করিলেন যে—সুবাদার যেন কালবিলম্ব না করিয়া স্বীয় পুত্র জবরদস্ত খানের অধীনে সমস্ত বঙ্গীয় সেনা দিয়া, তাঁহাকে বিদ্রোহী দমনে প্রেরণ করেন। এই অনুমতির সঙ্গে সম্রাট, অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও বেহারের শাসনকর্ত্তাদিগের উপর, জবরদস্ত খানকে সৈন্য সাহায্য করিবার জন্য ফরমান পাঠাইলেন।

অতঃপর সম্রাট, স্বীয় পৌত্র আজিম ওশ্‌শানকে বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

সেনাপতি জবরদস্ত খান বহু সেনা, কামান ও রণতরী লইয়া ঢাকা পরিত্যাগ করিলেন। এই সময় তাঁহার আগমন বার্ত্তা পাইয়া রহিম শাহ্‌ পদ্মা নদীর তীরে ভগবান গোলার নিকটে তাঁহার দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ও ত্রিংশ সহস্র পদাতিক সেনা লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

জবরদস্ত খান শত্রু শিবির হইতে কয়েক মাইল দূরে অবতরণ করিয়া, কতকগুলি রণ-তরী হইতে তাঁহার পদাতিক সেনা ও কামানগুলি নামাইয়া লইলেন। অবশিষ্ট রণ-তরীগুলির প্রতি নদীবক্ষ হইতে শত্রুগণকে গোলা বর্ষণে ব্যতিব্যস্ত করিবার অনুমতি দিয়া, স্বয়ং স্থলপথে বিদ্রোহীগণকে আক্রমণ করিলেন।

প্রথম দিন কেবল দূর হইতে কামানের যুদ্ধই চলিল। পরদিন প্রাতে সম্রাটের পদাতিক সেনাগণ প্রথমে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিল, উভয় সৈন্যে মেশামিশি হইয়া কয়েক ঘণ্টাকাল যুদ্ধের পর, বিদ্রোহী পাঠানেরা রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়া কিয়দ্দূর সরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। (১৬৯৭ খৃঃ মে মাস)

জবরদস্ত খান পরদিন প্রাতে পুনরায় পলায়িত বিদ্রোহীগণকে আক্রমণ করিয়া, পরে সমূলে উহাদিগকে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে মুরশিদাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে গিয়া একটী বৃহৎ সমতল ক্ষেত্রে শিবির স্থাপন করিলেন। কিন্তু রাত্রেই রহিম খান সেনাগণসহ নদী পার হইয়া বর্দ্ধমানের পথ ধরিল। সম্রাট সেনাগণ এইরূপে বিদ্রোহীগণকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

ঊনবিংশ সর্গ

সোলতান আজিম্ ওশ্শান

হিজরী ১১০৮ সালে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে কুমার শাহ্ আলমের দ্বিতীয় পুত্র আজিম্ ওশ্শান দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে, পিতামহ কর্ত্তৃক তাঁহার বঙ্গ-বেহারের সুবাদার নিয়োগের বার্ত্তা পাইয়া, দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহীসহ এলাহবাদে পৌঁছিলেন। তথা হইতে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা, এবং বেনারস ও বেহারের জায়গীরদারগণকে তাঁহার সাহায্যার্থে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু পাটনায় পৌঁছিয়া কুমার, জবরদস্ত খানের বিজয়বার্ত্তা পাইয়া মনে মনে, চিন্তা করিতে লাগিলেন—তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই সৈন্যাধ্যক্ষ বিদ্রোহীগণের সহিত সমস্ত যুদ্ধ শেষ করিয়া বিজয়মাল্য গলদেশে ধারণ করিলে, তিনি সম্রাটের নিকট আর কোন বিশেষ সম্ভ্রমের প্রত্যাশা করিতে পারিবেন না। ইহা ভাবিয়া কুমার, জবরদস্ত খানকে তাঁহার অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুমতি দিলেন।

বিজয়ী সেনাপতি জবরদস্ত খান, কুমারের প্রেরিত নিষেধ আজ্ঞার মর্ম্ম সম্যক উপলব্ধি করিলেন, অগত্যা যেন হস্তপদ বন্ধনাবস্থায় বর্দ্ধমানের নিকট তাঁহাকে সসৈন্যে অবস্থান করিতে হইল। দারুণ বর্ষার জন্য এই সময় কুমারকেও মুঙ্গেরে কিছুদিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

তৎপরে সেনাপতি জবরদস্ত খান, কুমার আজিম্ ওশ্শানকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য সম্মান প্রদর্শনার্থে কয়েক মাইল পথ অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সেই সময় কুমার, সেনাপতির প্রতি

এরূপ অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে—এই উন্নতমস্তক, কর্ম্মবীর যুবক সেনাপতি, তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বীয় পিতার সহিত চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

সেনাপতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার একান্ত অনুগত আট সহস্র উৎকৃষ্ট সেনাও তাহাদের এস্তফার দরখাস্ত দাখিল করিল; এবং পরে ঐ সকল সেনা পুনরায় জবরদস্ত খানের সহিত মিলিত হইয়া, পিতা পুত্রের সহিত রাজধানীতে চলিয়া গেল।

জবরদস্তের কর্ম্মত্যাগে, বিদ্রোহীগণের আনন্দ ও উল্লাসের সীমা রহিল না। রহিম শাহ্‌ তখন পুনরায় গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া, তাঁহার দলস্থ ছত্রভঙ্গ সেনাগণকে সমবেত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সোলতান আজিম্‌ ওশ্‌শান বর্দ্ধমানে আনন্দোৎসবে নিমগ্ন থাকা কাল মধ্যে বিদ্রোহীরা প্রচুর সেনা সংগ্রহ করিয়া নদীয়া ও হুগলী জেলায় লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিল; এবং বর্দ্ধমান হইতে মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল।

এই সময় দিনেমারেরা সোলতান আজিম ওশ্‌শানের নিকট গিয়া, ইংরাজ কোম্পানি ও তাহাদিগের মধ্যে বাণিজ্য শুল্কের অন্যায় পার্থক্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও তাহাদের মধ্য হইতে মিঃ ওয়াল্‌সকে পাঠাইয়া দিয়া, সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালিকাটা গ্রামত্রয়ে তাহাদের ব্যবসায় স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে বহু অর্থ প্রদানে মিঃ ওয়াল্‌স্‌ সোলতানকে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত করাইলেন ও এই অনুমতি পত্রে কোম্পানি ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সুতানুটী প্রভৃতি গ্রামত্রয় প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু উহাতে দেওয়ানের (প্রধান মন্ত্রী) দস্তখৎ না থাকায় এই গ্রামের জমিদারগণ তাহাদের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি হস্তচ্যুত করিতে অস্বীকৃত

হইল। পরে ডিসেম্বর মাসের শেষে সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া ১৭০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কোম্পানি, বঙ্গেশ্বরের নিকট হইতে আবাধ বাণিজ্যের ছাড়পত্র প্রাপ্ত হইলেন। এই অনুমতি পত্র হস্তগত করিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সর্ব্বশুদ্ধ ৩০,০০০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

আজিম ওশ্‌শান, বিদ্রোহী রহিম শাহ্‌কে বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। এবং এই বিষয় মীমাংসার জন্য পরে মন্ত্রী খাজা আন্‌ওয়ার অল্প সংখ্যক লোক সমভিব্যাহারে রহিম সাহের সহিত কথা মিটাইতে প্রেরিত হন। ক্রমে উভয় পক্ষে বাক্‌-বিতণ্ডা হইয়া, আন্‌ওয়ার ফিরিয়া আসিবার কালে, রহিমের অধীনস্থ একদল পাঠান, মন্ত্রীকে আক্রমণ করিয়া, সদলবলে তাহাদিগকে নিহত করে।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী রহিম, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রাপ্তির আশা এককালে পরিত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ সম্রাট-সৈন্যগণের উপর নিপতিত হইলেন। এই ভীষণ আক্রমণ পাঠান বীর এত অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্যে পরিণত করিলেন যে, কুমার আজিম ওশ্‌শান তাঁহার হস্তী আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই পাঠান সেনা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় তাঁহার মূল্যবান প্রাণ সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, হামিদ খান নামক একজন বিশ্বস্ত সাহসী আরবীয় যোদ্ধা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"আমি সোলতান আজিম ওশ্‌শান—তোমাদের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী ও সাহসী আছ, আসিয়া আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আরব বীর, বিদ্রোহী রহিম শাহের প্রতি দুইটী শর নিক্ষেপ করিলেন। একটী শর তাঁহার পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। অপরটী পাঠান সেনাপতির অশ্বের মস্তকে বিদ্ধ

হওয়ায়, অশ্ব যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আরোহী রহিম শাহ্‌কে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। সঙ্গে সঙ্গে হামিদ খান অশ্বাবতরণে ক্ষিপ্রহস্তে রহিম শাহের শিরচ্ছেদ করিয়া, উহা স্বীয় বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া উঁচু করিয়া ধরিলেন।

পাঠান সেনাগণ সৈন্যাধক্ষের এই দুরবস্থা দর্শনে, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। পরে তাহাদের মধ্যে অনেকে বঙ্গেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করায়, তাহারাই আবার সুবাদারের সেনাদলে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কুমার আজিম ওশ্‌শান এই অপ্রত্যাশিত রণজয়ের পর কিছুদিন বর্দ্ধমানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি মৃত বর্দ্ধমান রাজের পুত্র জগৎরামকে তাঁহার পিতৃ জায়গীর প্রদান করিলেন। সোল্‌তান তাঁহার পিতামহের নিকট হইতে, বীর হামিদ খানের জন্য, শমশের খান-বাহাদুর উপাধি ও তৎসহ বন্দোশিল এবং শ্রীহট্ট জেলাদ্বয়ের ফৌজদারের পদপ্রাপ্তির সনন্দ আনাইয়া, তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন।

কুমারের বর্দ্ধমানে থাকাবস্থায় তিনি তথায় একটী বৃহৎ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সময় তিনি হুগলী নদীতীরে শাহগঞ্জ নামে একটী বাজার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রজাগণ কুমারের নামানুযায়ী ঐ বাজারের নাম আজিমগঞ্জ রাখিলেন।

১৬৯৯-১৭০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কালকাতা এই তিনটি গ্রাম একত্রিত করিয়া উহার নাম 'কলিকাতা' রাখিলেন; এবং এই ভূখণ্ডের তিন দিকে পরিখা খনন করিয়া ইহাকে সাধ্যমত সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন। এই সময় অনেক বাঙ্গালী হিন্দু এই পরিখাবেষ্টিত স্থান নিরাপদ বিবেচনা করিয়া, তন্মধ্যে আসিয়া আবাস গৃহ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

কলিকাতায় ভাগীরথী তীরে এই সময় ইংরাজেরা যে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম তৎকালীন ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে "ফোর্ট উইলিয়ম" রাখিয়াছিলেন।

সোলতান আজিম ওশ্‌শান প্রায় তিন বৎসর বর্দ্ধমানে অবস্থান করিয়া এবং তথা হইতে পশ্চিম বাঙ্গলার সমস্ত বন্দোবস্ত সন্তোষজনকরূপে সমাধা করিয়া, পরে সোলতান সুজাআর সময়ের রাজকীয় নৌকাগুলি যথাসম্ভব হুগলীর নিকটস্থ স্থানে ভাগীরথীর বক্ষে সংগ্রহ করাইয়া, তৎসঙ্গ মহা আড়ম্বরে জলপথে ঢাকায় যাত্রা করিলেন।

এই বৎসর ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ম্, সম্রাটের সহিত সখ্যতা স্থাপন দ্বারা ইংরাজ কোম্পানীর ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন-কল্পে, স্যার উইলিয়ম্ নরিস্‌কে ভারতে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১০ই ডিসেম্বর দূত নরিস সুরাট বন্দরে অবতরণ করিলেন; এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখে স্যার নরিস্ প্রথমে রাজ দর্শনের অনুমতি পাইলেন। কিন্তু ঠিক এই সময় তিনখানি মক্কাযাত্রী জাহাজ ইংরাজ জলদস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হওয়ায়, স্যার উইলিয়মের সমস্ত আশা-ভরসা নষ্ট হইল।

ইংলণ্ডীয় দূত ১৭০২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তারিখে "সিপিও" নামক জাহাজে সুরাট বন্দর পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সেন্ট হেলেনা দ্বীপের নিকট জাহাজে তাঁহার মৃত্যু হইল।

সম্রাট, হায়দ্রাবাদের দেওয়ান মোহাম্মদ হাদি কারতলব্ খানকে, মুরশিদকুলি খান উপাধি দিয়া, ১৭০১ খৃষ্টাব্দে ১১১৩ হিজরীতে বাঙ্গলার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। মুরশিদকুলি খান ঢাকায় পৌঁছিয়া অল্প দিনের মধ্যে রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত পুরাতন বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন

করিয়া ফেলিলেন। এবং অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালার রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া এক ক্রোর টাকায় পরিণত করিলেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী দেওয়ানগণের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই জলবায়ু সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর। তাঁহারা এই ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রায় অধিকাংশ ভূখণ্ডে সামরিক জায়গীরদারের পদ্ধতি প্রচলন করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুরশিদকুলি সেই সমস্ত উঠাইয়া দিয়া, তাঁহাদের স্থলে নূতন বেতনভোগী দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন ও পুরাতন জায়গীরদারগণকে তৎপরিবর্ত্তে উড়িষ্যা বিভাগে জায়গীর প্রদান করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে এই জায়গীরদার দ্বারা রাজস্ব আদায়-পদ্ধতি প্রচলিত থাকায়, বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে রাজকীয় খরচান্তে উদ্বৃত্ত অর্থ সম্রাটের রাজকোষে গচ্ছিত হইবার পরিবর্ত্তে, বাদশাহ্‌কে প্রায়ই বাঙ্গলার খরচের সঙ্কুলানের জন্য অপর প্রদেশের রাজস্ব হইতে সাহায্য করিতে হইত।

মুরশিদ কুলি খান তাঁহার কার্য্যকুশলতার জন্য একদিকে যেমন বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, অপরদিকে তেমনই বাদশাহ্-পৌত্র আজিম ওশ্‌শানের চক্ষুশূল হইয়া পড়িলেন। সোলতানের এই শত্রুতা সাধনকার্য্যে আবদুল ওয়াহেদ নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার প্রধান সহকারী হইল।

দেওয়ান মুরশিদ কুলির প্রতি বঙ্গেশ্বরের ব্যবহার, দিন দিন তাঁহার অসহ্য হইয়া পড়ায়, একদিন তিনি প্রকাশ্য রাজসভা মধ্যে সোলতান্‌কে স্পষ্টতঃ বলিয়া ফেলিলেন—

"আপনি যদি আমার জীবন লইবার বাসনা করেন, আসুন, আমরা উভয়ে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।"

এই বলিয়া তেজস্বী দেওয়ান মুরশিদ কুলি খান, আপন কটিবদ্ধ তরবারিতে হস্তার্পণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। পরে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া

বঙ্গেশ্বরের বিনানুমতিতে বা তাহার আজ্ঞাতে সমস্ত বিবরণ সম্রাটের নিকট লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি স্বীয় বাসস্থান ও দফ্‌তরখানা মুরশিদাবাদে উঠাইয়া আনিলেন ও নিজের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম মুরশিদাবাদ রাখিলেন। ১৭০৩ খৃঃ।

এদিকে দেওয়ানের পত্র প্রাপ্তে বাদশাহ আওরাঙ্গজেব, পৌত্রকে বাঙ্গলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া বেহারে আসিয়া বাস করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

আজিম ওশ্‌শান স্বীয় পুত্র ফর্‌রোখ্‌সিয়ারকে ঢাকায় প্রতিনিধি রাখিয়া, সপরিবারে রাজমহলে আগমন করিয়া সোল্‌তান সুজাআর প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তথা হইতে পাটনায় গিয়া, পিতামহের অনুমতি লইয়া ঐ স্থানের নাম আজিমাবাদ রাখিলেন।

১১১৮ হিজরীর ২৮শে জিল্‌কদ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ৫১ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ৯১ বৎসর ১৩ দিন বয়সে পরম ধর্ম্মপ্রাণ রাজর্ষি শাহান্‌ শাহ্‌ আলম্‌গীর, প্রাতঃকালীন ঈশ্বরোপাসনা (ফজরের নামাজ) শেষ করিয়া, সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পরে আহমদ নগরে দেহত্যাগ করিলেন। সেকেন্দার লোদীর পর সম্রাট আওরাঙ্গজেবের তুল্য ঈশ্বর আরাধনা ও কঠিন তপস্যায় নিযুক্ত ন্যায় বিচারক বাদশাহ্‌, দিল্লীর সিংহাসন আলোকিত করেন নাই। সাহস প্রদর্শনে ও বিচারবুদ্ধিতে তিনি অনুপম ছিলেন—(মোন্তেখাবল্‌ লোবাব)।

সম্রাট মৃত্যুকালে তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য এইরূপে মৌখিক বিভাগ করিয়া গিয়াছিলেন—

জ্যেষ্ঠ মোহাম্মদ মোয়াজ্জম—কাবুল, লাহোর ও মুলতান প্রদেশ পাইবেন।

দ্বিতীয় মোহাম্মদ আজম্‌—ভারতবর্ষের মধ্যস্থল।

কনিষ্ঠ কামবক্স—দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণের সমস্ত ভূভাগ প্রাপ্ত হইবেন।

সম্রাট আওরাঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিবসেই তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ আজম্, পিতার রাজকীয় শিবির অধিকার করিলেন ও সমস্ত রাজকোষ স্বীয় আয়ত্তে আনিলেন, পরে পিতৃদেহ দৌলতাবাদের নিকট, সেখ বোরহান উদ্দীন ও শাহ্ জারিজারবখ্শ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণের সমাধি পার্শ্বে সমাধিস্থ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তৎপরে সমস্ত আমীর ও সেনাবিভাগের কর্ম্মচারিগণকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পুরাতন পদে নিযুক্ত রাখিলেন। মোহাম্মদ আজম্ অতঃপর দিল্লী অধিকার করণকল্পে সত্বর সসৈন্যে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে জ্যেষ্ঠ মোহাম্মদ মোয়াজ্জম্-কুমার আজিম ওশ্শান, সম্রাটের আদেশক্রমে বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিবার সময়, তাঁহার সহিত যথেষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য লইয়াছিলেন। তিনি আগ্রায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পথে পিতামহের মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইলেন ও ত্বরিত গতিতে আগ্রায় পৌঁছিয়া, পিতা মোহাম্মদ মোয়াজ্জম শাহ্ আলমের পক্ষে, উক্ত রাজধানী অধিকার করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন। আগ্রা বিভাগের শাসনকর্ত্তা, তাঁহার কন্যার সহিত মৃত সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ আজমের পুত্রের বিবাহ দেওয়ায়, তিনি আজিম ওশ্শানের গতির ভীষণভাবে প্রতিবন্ধকতা করিলেন; এবং তাঁহার সমুদয় নৌকাগুলি যমুনায় জলমগ্ন করিয়া দিলেন।

আজিম ওশ্শান পরে সসৈন্যে যমুনা পার হইয়া, শাসনকর্ত্তাকে আক্রমণ করিলেন ও যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দি করিলেন। তৎপরে স্বীয় সেনা মধ্য হইতে একদলকে প্রেরণ করিয়া, রাজধানীতে আসিবার

পথে, বাঙ্গলা দেশের প্রেরিত রাজস্ব প্রায় এক ক্রোর টাকা কাড়িয়া লইলেন। অতঃপর আজিম ওশ্‌সান তাঁহার লুণ্ঠিত এক ক্রোর টাকা ও পূর্ব্বের আনীত প্রায় আট ক্রোর টাকার সাহায্যে, অচিরকাল মধ্যে বহু সেনা সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার পিতা আগ্রায় পৌছিবার পূর্ব্বেই, ত্রিংশ সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন।

দুর্গাধ্যক্ষ বাকের খান, সম্রাট আওরাঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্‌-আলমের আগ্রায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহাকে মৃত সম্রাটের আইন সঙ্গত উত্তরাধিকারী বিবেচনা করিয়া দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

আগ্রার প্রকাণ্ড ও প্রসিদ্ধ দুর্গ অধিকার করিয়া, শাহ্‌ আলম্‌ অগাধ ধন-সম্পত্তি ও যুদ্ধ-সম্ভারের অধিকারী হইলেন। এবং অচিরে আরও অনেক সেনা সংগ্রহ করিয়া, ভ্রাতা আজম্‌শাহের দমনার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন!

১১১৯ হিজরী ১১ই রবিওল্‌ আউয়ল্‌ (১৭০৭ খৃঃ জুন) তারিখে উভয় সৈন্যে আগ্রার নিকটবর্ত্তী জাজুর ময়দানে সংঘর্ষ হইল। এই যুদ্ধে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব সুবাদার সোল্‌তান আজিম ওশ্‌শান অদ্ভূত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যুদ্ধে মোহাম্মদ আজম্‌ শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার বেদার বখ্‌ত অতীব সাহস প্রদর্শনে যুদ্ধ করিতে করিতে, একটী কামানের গোলায় আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওয়ালাজাহ্‌ বন্দুকের গুলিতে নিহত হইয়াছিলেন।

সম্রাট আওরাঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ আজম্‌ শাহ্‌ হস্তী আরোহণে বরাবর এই যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন। সেই হাওদার মধ্যে তাঁহার একটী বালক সন্তান ছিল। আজম্‌ শাহ্‌ এই বালককে ঢাল সাহায্যে কয়েকবার বিপক্ষের গুলি হইতে রক্ষা করিলেন

দেখিয়া, এই তরুণবয়স্ক সাহসী বীর বালক, তাহার জাতীয় বীরত্ব প্রদর্শনেচ্ছায় একবার উত্তেজিত হইয়া হাওদার বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় পিতা ক্ষিপ্রহস্তে বালককে টানিয়া না লইলে, তৎক্ষণাৎ হস্তী-পৃষ্ঠেই বালকের মৃত্যু হইত।

ক্রমে তিন জন হস্তীচালক নিহত হওয়ায় ও হস্তী সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়ায়, কুমার মোহাম্মদ আজম্ শাহ্ হাওদা হইতে বাহির হইয়া, মাহুতের স্থান অধিকার করিয়া ঐ বৃহদায়তন জন্তুকে শাসনাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; এমন সময় একটী গুলি তাঁহার কপালে লাগিয়া, তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল। শত্রুপক্ষীয় রোস্তম আলি নামক জনৈক নরপিশাচ, এই ব্যাপার দর্শনে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কুমারের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিল এবং ঐ মস্তক লইয়া সোলতান শাহ্ আলমের নিকট উপস্থিত হইল।

কুমার মোহাম্মদ মোয়াজ্জম শাহ্-আলম্, সহোদরের রক্তাক্ত ছিন্ন মস্তক দর্শনে, প্রথমতঃ কুক্কুর রোস্তম আলির দিকে উগ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, শেষে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যুদ্ধান্তে শাহ্ আলম, তাঁহার ভ্রাতা আজম্ শাহের পুত্র কন্যাগণকে নিকটে আনাইয়া লইয়া, তাহাদিগের প্রতি যথাসম্ভব আদর ও স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, বাদশাহ হোমায়ুনের সমাধি পার্শ্বে তিনি ঐ মৃতদেহগুলি সযত্নে সমাধিস্থ করাইয়াছিলেন।

রণবিজয়ী সেনা লইয়া শাহ্ আলম্ আগায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক, বাহাদুর শাহ্ নাম গ্রহণে সিংহাসনারোহণ করিলেন। তৎসঙ্গে পুত্র আজিম ওশ্শানের সাহায্যজনিত কৃতজ্ঞতায় তাঁহাকে, পুনরায় বাঙ্গলা-বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, তৎসহ এলাহাবাদ প্রদেশের শাসন

কর্ত্তৃত্বও পুত্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা কামবক্সের সহিত সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকায় সম্রাট, তাঁহার এই বীরবাহু পুত্রকে আরও কিছুদিন তাঁহার নিকট থাকিতে বলিলেন; এবং তাঁহার অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার জন্য মুরশিদ কুলি জাফর খানকে প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে ও বেহার-এলাহাবাদ প্রদেশদ্বয়ের জন্য, তাঁহার ইচ্ছামত কোন লোককে প্রতিনিধি রাখিতে অনুমতি দিলেন।

আজিম ওশ্‌শান এই সময় আরব দেশবাসী হজরত রসুলে-খোদার বংশজ দুইজন অতি সম্ভ্রান্ত ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লাহ্ খান ও সৈয়দ হোসেন আলি খানকে, যথাক্রমে এলাহাবাদ ও বেহারে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর কুমার সর্ব্বক্ষণ পিতৃ-সান্নিধ্যে থাকিয়া, পিতার অনুগ্রহ-স্নেহের অধিকাংশের দাবিদার হইয়া পড়িলেন।

১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ ১১২৪ হিজরীর সফর্ মাসে, সম্রাট বাহাদুর শাহ লাহোরে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কনিষ্ঠের প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ ঐ সময়ও সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুঈজউদ্দীন পিতার নিকট না আসায়, সমস্ত রাজকীয় কার্য্য কুমার আজিম ওশ্‌শানই করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে কুমারের অত্যধিক অহঙ্কার ও কড়া মেজাজে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ আমীরল্ ওমারা জুল্‌ফেক্কার খান বিরক্ত হইয়া, অন্যান্য কর্ম্মচারি সহ, সম্রাটের অপর তিন পুত্র মুঈজউদ্দীন, জাঁহান শাহ্ ও রফিওশ্‌শানের পক্ষাবলম্বন করিলেন।

রাভী নদীর এক পার্শ্বে সম্রাটের রাজকীয় শিবির ও অপর তীরে আজিম ওশ্‌শানের শিবির সন্নিবেশিত ছিল। মধ্যে নদীবক্ষে নৌসেতু-দ্বারা সর্ব্বক্ষণ যাতায়াত ও সংবাদ আদানপ্রদান চলিতেছিল। সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কুমার আজিম ওশ্‌শান আসিয়া সম্রাট শিবির অধিকার

করিলেন, এবং তৎসহ সমস্ত রাজকীয় সম্পত্তি ও তোপখানা করায়ত্ত করিয়া লইলেন।

এই সময় আমীরুল ওমারার পরামর্শে সম্রাটের অপর তিন পুত্র, কুমার আজিম ওশ্‌শানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। চারি দিন ধরিয়া সর্ব্বক্ষণ ঘোরতর কামানের যুদ্ধ চলিল। কুমারের সেনাগণ উপযুক্ত সেনানায়ক অভাবে, ক্রমে আজিম ওশ্‌শানের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া রণে ভঙ্গ দিতে লাগিল। এই অবস্থা দর্শনে আজিম ওশ্‌শানের জনৈক বন্ধু আমিনউদ্দৌলা, তাঁহাকে হস্তী আরোহণে রণস্থল পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দিলেন; কিন্তু তৈমুর বংশীয় নর-শার্দ্দূল তাঁহার সকল সহচর ও ক্রমে প্রায় সমস্ত সেনা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন না। তাঁহার হস্তীর মাহুত বিপক্ষের বন্দুকের গুলিতে হত হইল। অল্পক্ষণ মধ্যে হস্তী একটী কামানের গোলায় সাংঘাতিকরূপে আহত হওয়ায়, উন্মত্তপ্রায় অবস্থায় রাভী নদীর খাড়া তীর হইতে লম্ফ প্রদানে স্রোতে পতিত হইল ও কুমার আজিম ওশ্‌শান সহ জলমগ্ন হইল। হস্তীর মৃত দেহ কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, কিন্তু সম্রাট কুমার আজিম ওশ্‌শানের আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

(সিয়ারল মোতাখ্‌খারীণ)

বিংশ সর্গ

নওয়াব মুর্শিদ কুলি মতিয়ল্ মুল্‌ক আলাআদ্দৌলা জাফর্ খান নেসিরী, নাসের জঙ্গ।

বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি, মুকৃশিদাবাদ জেলার নাম পরিবর্ত্তনে, স্বীয় নামানুসারে ঐ জেলার নাম মুরশিদাবাদ রাখিলেন ও তথায় রাজপ্রাসাদাবলী নির্ম্মাণ করাইয়া, নগরটীকে বঙ্গের রাজধানীতে পরিণত করিলেন।

১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী ২৫,০০০ সহস্র মুদ্রা প্রদানে, নওয়াবের নিকট হইতে কাসিম বাজারে কুটি নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হ'ন। এই বৎসর কুমার আজিম ওশ্ শান বেহার পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের নিকট চলিয়া যাওয়ায়, নওয়াব মুর্শিদ কুলি বঙ্গ-বেহার ও উড়িষ্যার উপর সম্পূর্ণ শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং এই সময় তিনি মেদিনীপুর জেলা, উড়িষ্যা বিভাগ হইতে সরাইয়া আনিয়া উহা বাঙ্গালার সহিত সমন্বিত করিয়াছিলেন।

নওয়াবের অপরাপর শত শত সদ্‌গুণ থাকিলেও, তিনি রাজস্ব আদায়ের কার্য্যে অতিরিক্ত তৎপরতা প্রদর্শন করিতে গিয়া, জমিদারগণের বিরাগ-ভাজন হইয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় নওয়াবের নামে প্রদেশের সমস্ত জমিদারগণ আতঙ্কে কম্পিত হইত। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে নওয়াব মুরশিদ কুলি খান বাঙ্গলা-বেহার-উড়িষ্যার সমস্ত জমি পুনঃ জরিপ করিয়া, রাজস্ব

বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে ঐ বৃদ্ধি করের উপর আবার নানকর, বনকর ও জলকর প্রবর্ত্তিত করেন।

মুরশিদ কুলি খান সপ্তাহে দুইদিন বিচারাসনে বসিয়া স্বয়ং বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। তিনি এতদূর ন্যায় বিচারক ও ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন যে—কোন গুরুতর বে-আইনী গর্হিত কার্য্যের জন্য নিজ পুত্রের প্রতিও মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়া, জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

নওয়াব মুরশিদ কুলির রাজত্ব কালে বঙ্গের রাজস্ব সেই সময়ের এক ক্রোর পঞ্চাশ, লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

নওয়াব, সম্রাটের আদেশক্রমে হুগলীর অত্যাচারী ফৌজদার জয়েনল্ আবদীনকে পদচ্যুত করিয়া, তাঁহার স্থলে জনৈক মোগল, আলী বেগ্‌কে ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন।

এই সুবাদারের, রাজসভায় উপস্থিত থাকা কালে, তাঁহার কোন কর্ম্মচারী বা সভাসদ রাজাগণের, তাঁহার সমক্ষে উপবেশন করিবার, বা পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিবার অনুমতি ছিল না। কোন হিন্দু জমিদার বা ধনশালী লোকের, নওয়াব দরবারে পাল্‌কী আরোহণে আসিবার হুকুম ছিল না।

জমিদারগণের নিকট হইতে বাকী-পড়া রাজস্ব আদায় কার্য্যে নওয়াবের অত্যাচারের সীমা ছিল না। ভোশ্‌নার ফৌজদার সৈয়দ আবু তোরাব এই কার্য্যে তাহার একজন প্রধান সহায় ছিলেন। এই ভোঁশ্‌না নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে সীতারাম নামক একজন অবাধ্য জমিদার, তাহার অধীনে একদল দস্যু প্রতিপালন করিতেছিল।

ফৌজদারের ক্ষমতা অগ্রাহ্য করিয়া এই দস্যু সর্দ্দার সীতারাম, ক্রমে চতুর্দ্দিকে লুঠ তরাজ আরম্ভ করিয়া দিল। আবু তোরাব তাহার দমনার্থে নওয়াবের নিকট সেনা সাহায্য চাহিলেন; কিন্তু নওয়াব মুর্শিদ কুলি

খান, এই সামান্ত তস্কর দমনের জন্ত, ফৌজদারকে কোন সৈন্ত দিয়া সাহায্য করা,—মশক নিধনার্থে কামান দাগার ন্যায় বিবেচনা করিয়া, তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। শেষে আবু তোরাব বাধ্য হইয়া নিজ ব্যয়ে, পীর খান নামক একজন দুর্দ্দান্ত পাঠান যোদ্ধাকে দুই শত অশ্বারোহী সহ তাঁহার চাকুরীতে নিযুক্ত করিলেন। ধূর্ত্ত সীতারাম এই সংবাদ পাইয়া দেশ ছাড়িয়া অরণ্য মধ্যে পলাইয়া গেল।

একদিন অল্প সংখ্যক সঙ্গী লইয়া ফৌজদার আবু তোরাব শিকার উদ্দেশ্যে জঙ্গলে অবস্থানকালে সীতারামের সেনাগণ আচম্বিতে ফৌজদারের শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। পরে ফৌজদারের মৃতদেহ চিনিতে পারিয়া সীতারাম, ভয়ে অধীর হইয়া পড়িল ও ভোঁশনায়; ফৌজদারের আত্মীয়গণের নিকট তাঁহার শব সংকারার্থ সযত্নে পাঠাইয়া দিল।

অত্যল্পকাল মধ্যে নওয়াব, আবু তোরাবের হত্যার সংবাদ পাইয়া, সীতারামকে,তাহার লোক লশকরসহ গ্রেফতার করিবার জন্ত বথশ-আলি খানকে প্রেরণ করিলেন; এই সঙ্গে সমস্ত স্থানীয় জমিদারের প্রতি বথশ আলিকে সাধ্যমত সাহায্য করিবার জন্ত সুবাদার আদেশপত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

বথশ আলি, অচিরে সীতারামকে ধৃত করিয়া সপরিবারে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন। তথায় নওয়াব, সীতারামের প্রতি জীবিতাবস্থায় তাহার গাত্র চর্ম্ম মোক্ষণ করিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিলেন। অভাগা সীতারামের স্ত্রী-পুত্র-কন্তাগণ, দাস-দাসী-রূপে বাজারে বিক্রিত হইল।

হিঃ ১১১৮ সালে শাহ্‌জাদা সুবাদার আজিম ওশ্‌শান, পিতামহ সম্রাট আওরাঙ্গজেব কর্ত্তৃক আহূত হইলে, তিনি স্বীয় মধ্যম পুত্র কুমার

ফোররোখ্‌ সিয়ারকে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা বিভাগে তাঁহার প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছিলেন। কুমার ফোরোখ্‌ সিয়ার সম্রাট আওরাঙ্গজেবের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে পিতামহ বাহাদুর শাহের সিংহাসনারূঢ় হইবার সংবাদ পাইয়া, ১১১৯ হিজরীতে মুরশিদাবাদে গিয়া লাল্‌বাগ প্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন ও দেওয়ান মুরশিদ কুলি খানের সহিত এই স্থানে অবস্থান কালে, কুমার ফোর্‌রোখ্‌ সিয়ারের সখ্য স্থাপন হইল।

প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় হইতেই, সম্রাটের আদেশক্রমে মুরশিদকুলি খানের হস্তে রাজ্যের সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইয়াছিল।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে সোলতান আজিম ওশ্‌শানকে যুদ্ধে নিহত করিয়া জাঁহাদার শাহ্‌ ভারতের রত্ন-সিংহাসনারূঢ় হওয়ায়, ফর্‌রোখ্‌ সিয়ার স্বীয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য, মুরশিদকুলি খান্‌কে তাঁহাকে সাহায্য করিতে বলিলেন। কিন্তু নওয়াব মুর্শিদ, এই নব-সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া, বন্ধুত্বের খাতিরে কুমারকে তৎক্ষণাৎ মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিতে সদুপদেশ দিলেন।

কুমার ফোর্‌রোখ্‌ সিয়ার অগত্যা তাঁহার পিতা আজিম ওশ্‌শানের নিযুক্ত বেহারের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ হোসেন আলির নিকট হইতে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায়, সপরিবারে পাটনায় গমন করিলেন ও তথায় জাফর্‌ খানের প্রসিদ্ধ উদ্যান মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে কুমার অতীব নম্রতা সহকারে সৈয়দের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন।

হোসেন আলি প্রথমতঃ সম্রাট জাঁহাদারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন; বরং বাদশাহের আদেশমতে তিনি কুমারকে ধৃত ও বন্দি করিয়া পাঠাইতে বাধ্য অবগত করিয়া, তাঁহাকে সত্বর বেহার

পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। তৎপরে কুমারের অনুরোধে বাধ্য হইয়া, সৈয়দ হোসেন আলি নিশাযোগে কুমারের শিবিরে আগমন করিলেন। তথায় কুমার ফোরুরোথ্ সিয়ারের, বিশেষতঃ তাঁহার একটী অল্প বয়স্কা কন্যা মালেকায় জামানের অনুরোধ ও আব্দার কোনমতে এড়াইতে না পারিয়া, শেষে হোসেন আলি, কুমারের সাহায্যার্থ স্বীয় জীবন দান পর্য্যন্ত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন।

তৎপরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পাটনার সুবাদার হোসেন আলি, এলাহবাদে তাঁহার ভ্রাতা সুবাদার সৈয়দ আবদুল্লাহ্‌কে এই সমস্ত বিবরণ অবগত করিয়া পত্র লিখিলেন।

পর দিবস হোসেন আলি, কুমার ফোরুরোথ্ সিয়ারকে পাটনায় নিজ সিংহাসনে বসাইয়া, সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তাঁহার প্রতি ভারত সম্রাটের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সৈয়দ আবদুল্লাহ্ অনেক বিবেচনার পর, তাঁহাদের এই উন্নতির মূলীভূত আজিম ওশ্‌শানের পুত্র ফোররোথ্ সিয়ারকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করাই ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত কার্য্য বিবেচনা করিয়া, ভ্রাতার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। এই সময় নওয়াব মুরশিদ কুলি খানের জামাতা সুজাআ উদ্দীন খান, এলাহবাদের নিকট দিয়া বাঙ্গলার রাজ-কর লইয়া সম্রাটের দরবারে যাইতেছিলেন। আবদুল্লাহ্ কুমারের সাহায্যার্থ উহা কাড়িয়া লইলেন। এই অপহৃত অর্থে সেই সময় কুমারের যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল।

উভয় ভ্রাতার এইরূপ শত্রুতা ও সেনাসংগ্রহ করিতে থাকার সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। সম্রাট তখন এলাহবাদে আবদুল্লার দমনের জন্য সৈয়দ আবদুল গফ্‌ফারকে তথাকার নূতন সুবাদার নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার অধীনে দ্বাদশ সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিলেন।

আবদুল্লাহ্ খান সম্রাট সেনাগণকে বাধা দিবার জন্য, তাঁহার তিন

ভ্রাতার অধীনে সাত সহস্র সৈনা এলাহবাদ হইতে কিছু দূরে রক্ষা করিয়া, স্বয়ং দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সম্রাটের সেনা এলাহবাদে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে, ভ্রাতাত্রয় ভীষণ বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে সুবাদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেনাপতি সৈয়দ নূরুদ্দীন খান নিহত হইলেন; কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী সুবাদারের শরণাপন্ন হইল।

ইতিমধ্যে কুমার ফোররোখ্ সিয়ার পঞ্চবিংশতি সহস্র সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনা, এবং বিস্তর কামান সহ এলাহবাদের নিকট গঙ্গা পার হইয়া, সৈয়দ আবদুল্লার সহিত মিলিত হইলেন। অল্পকাল মধ্যে এই প্রবল বাহিনী, সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয় ও কুমার কর্ত্তৃক চালিত হইয়া, কাজ্ওয়ায়ে (যে স্থানে বঙ্গেশ্বর সুজাআর সহিত আওরাঙ্গজেবের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল) গিয়া পৌঁছিল। এই স্থানে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ১১২৪ হিজরীর ২৭ সওয়াল তারিখে সম্রাট জাঁহাদার সাহের প্রথম পুত্র কুমার আরেজ-উদ্দীনের সহিত যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, তাহাতে সম্রাট সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া গেল। পরে তাহাদের মধ্যে অনেকেই কুমার ফোর্‌রোখের দলে যোগ দিয়াছিল।

কুমার ফোর্‌রোখ সিয়ার এই প্রকাণ্ড বাহিনী লইয়া তখন আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সম্রাট এবার স্বয়ং ১৪ই জিলহজ্জ তারিখে তাহাদিগকে আগ্রার অনতিদূরে আক্রমণ করিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর, সম্রাট সেনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া গেল।

জাঁহাদার শাহ্ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কোন মতে প্রাণ বাঁচাইয়া, আগ্রায় পলাইয়া গেলেন। পরে তথায় মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন পূর্ব্বক, হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দিল্লীর অভিমুখে পলায়ন করিলেন। দিল্লী পৌঁছিয়া সম্রাট, উজির আসাদ-দৌলার প্রাসাদে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু পরে কুমার ফোর্‌রোখ্ সিয়ারের আদেশক্রমে উজির

আসাদ-উদ্দৌলা, জাঁহাদার শাহ্‌কে তাঁহার প্রাসাদ মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৫ই জিল্‌হজ্জ তারিখে কুমার ফোর্‌রোখ সিয়ার ভারতের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। অভিষেক ক্রিয়া জাঁকজমকের সহিত সমাপ্ত হইবার পর নব সম্রাট, তাঁহার প্রতিষ্ঠান্বিত অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ বাদশাহ্‌ জালাল-উদ্দীন আক্‌বরের সমাধির প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ, আগ্রা হইতে পাঁচ মাইল দূরে সেকেন্দারায় গমন করিলেন; এবং বেলা দুই প্রহরের সময় আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নগরবাসিগণকে দর্শন দিলেন।

পর দিবস সম্রাট আগ্রা পরিত্যাগে দিল্লীর পথে যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে পৌঁছিয়া তিনি নগর প্রাকারের বাহিরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। পরে তথা হইতে উজির আসাদ-উদ্দৌলা ও তৎপুত্র জোলফক্কার খানকে তলব করিলেন। উজিরকে বিদায় দিবার পর, সম্রাটের অনুমতিক্রমে জোলফক্কার খানকে, তাঁহার অন্যায় বিরুদ্ধাচরণের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, শ্বাসবদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইল।

সম্রাট ফোর্‌রোখ্‌ সিয়ার পাটনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে, তাঁহার বিশ্বস্ত ও অধীনস্থ রশিদ খানকে বাঙ্গলার নওয়াবী পদ প্রদান করিয়া, তাঁহাকে সসৈন্যে নওয়াব মুরশিদ কুলি খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিতে অনুমতি দিয়া গিয়াছিলেন। এই কার্য্যে সম্রাটের তখন প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে—আগ্রায় পরাস্ত হইলে সুদূর বাঙ্গালায় অন্ততঃ তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় স্থান থাকিবে।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে নওয়াব মুরশিদ কুলির সহিত যুদ্ধে, রশিদ খান পরাস্ত ও নিহত হইলেন।

এদিকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মুরশিদ কুলি খান, কুমার ফোররোখ্‌ সিয়ারের সিংহাসনারোহণের সংবাদ পাইয়া, পূর্ব্বমত দিল্লীর দরবারে বাঙ্গালার

সমুদয় রাজস্ব ও তৎসহ নানাপ্রকার উপঢৌকনাদি সম্রাট সকাশে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। নওয়াবের এই গুণের বশবর্ত্তী হইয়া সম্রাটও তাঁহাকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নাজিম ও দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, তাহার সনন্দ প্রেরণ করিলেন। তৎসহ নওয়াবের অনুরোধে মাণিক চাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্রকে জগৎশেঠ উপাধি দানে, রাজকীয় কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে সম্রাটের অনুমতি লইয়া মুরশিদ কুলি খান স্বীয় দৌহিত্র মির্‌জা আসাদ-উদ্দৌলাকে, সার-আফ্‌রাজ খান উপাধিতে ভূষিত করিয়া, নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন ও তাঁহার নামে কয়েকটি জমিদারি কিনিয়া দিলেন। তাঁহার অপর একজন দৌহিত্রী-জামাতা মির্‌জা লুৎফুল্লার জন্য ঢাকার নায়েব-নাজিমী পদ প্রার্থী হইয়া, সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহার জন্য মুরশিদ কুলি খান উপাধি আনাইয়া, উক্ত মির্‌জা লুৎফুল্লাকে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

নওয়াব মুরশিদ কুলি, মোগল ও আরবদেশীয় বণিকগণকে, তাহাদের ব্যবসায়ে খুবই উৎসাহ প্রদান করিতেন।

এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দূত মিঃ জোনস্‌ সার্‌মান এবং মিঃ এডওয়ার্ড ষ্টিফেন্‌সন, জনৈক ডাক্তার মিঃ উইলিয়াম্‌ হ্যামিল্‌টন্‌কে সঙ্গে লইয়া, দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলেন। কোম্পানির সৌভাগ্যক্রমে সম্রাট এই সময় তাঁহার একটী কঠিন পীড়ার জন্য, যোধপুরের রাজা অজিত সিংহের কন্যার সহিত স্বীয় বিবাহ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজ ডাক্তার মিঃ হ্যামিলটন্‌ অল্প দিনের মধ্যেই ঔষধ প্রয়োগে সম্রাটের ঐ রোগ আরোগ্য করিয়া দিলেন।

ফোর্‌রোখ্‌ সিয়ারের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে মহাসমারোহে রাজপুত-রাজকন্যার সহিত দিল্লীশ্বরের বিবাহ হইয়া গেল। এই রাজকীয় বিবাহ

উপলক্ষে বহুদিনব্যাপী যে প্রকার উৎসব ও আড়ম্বর হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে সেরূপ মহোৎসবের বিবরণ কখনও শ্রুতিগোচর হয় নাই।

ডাক্তার হ্যামিল্‌টনের প্রার্থনা মতে সম্রাট ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর এইরূপ ছাড়পত্র দিলেন—

১। কলিকাতাস্থ কোম্পানির প্রেসিডেণ্টের দস্তখৎযুক্ত ছাড় দেখিলে, বঙ্গেশ্বরের কোন কর্ম্মচারী আর তাহাদের মালামাল পরীক্ষা করিবেন না।

২। সুবাদার আজিম ওশ্‌শানের অনুমতিক্রমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যেমন ইতিপূর্ব্বে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালিকত্তা গ্রাম ত্রয়ের জমিদারি স্বত্ব খরিদ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা আরও ৩৮ খানি গ্রাম খরিদ করিতে পারিবেন।

১৭১৮ খৃষ্টাব্দে নওয়াব মুরশিদ কুলি খান বেহার প্রদেশের সম্পূর্ণ শাসন কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট আকবরের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত কোন একজন সুবাদারের উপর একত্রে এই তিনটী প্রদেশের সম্পূর্ণরূপ ক্ষমতা ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হয় নাই।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয় যোধপুর-রাজা অজিৎ সিংহের (সম্রাটের শ্বশুর) সহিত মিলিত হইয়া, সম্রাট ফোরয়োখ্‌ সিয়ারের ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় দিল্লীশ্বরের দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয় রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন। মারহাট্টাগণের সহিত যুদ্ধে সম্রাটের সেনাগণ প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল ও যাহা অবশিষ্ট ছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই দুঃসময় বুঝিয়া বিদ্রোহীগণের সহিত মিলিত হইল। সৈয়দ আবদুল্লাহ্‌ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া এই সময় কনিষ্ঠ হোসেন আলির সহিত মিলিলেন। সমস্ত দিল্লী নগর

এমন কি রাজ প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে পর্য্যন্ত বিদ্রোহের ডঙ্কা বাজিতে লাগিল। সম্রাট প্রাসাদ অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইলেন।

শেষে আবদুল্লার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ নজম্ উদ্দীন আলি খান, কয়েকজন আফ্‌গান যোদ্ধা সঙ্গে লইয়া সম্রাট প্রাসাদে প্রবেশ করিল ও লুক্কায়িত স্থান হইতে যৎপরোনাস্তি অবমাননার সহিত, প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট আকবর ও আওরাঙ্গজেবের বংশধর দিল্লীশ্বর ফোররোখ্‌ সিয়ারকে, প্রাণভয়ে পলায়িত তস্করের ন্যায় টানিয়া বাহির করিয়া, তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিল। শেষে পাষণ্ডেরা তাঁহাকে ঐ অবস্থায় একটী সঙ্কীর্ণ কারাগারে নিঃক্ষেপ করিয়া, অতিশয় যন্ত্রণা দিয়া বধ করিল।

বাদশাহ্‌ ফোর্‌রোখ্‌ সিয়ার সর্ব্ব রকমে নয় বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অভাগ্য সম্রাটকে নিহত করিয়া দুর্ব্বৃত্ত সৈয়দদ্বয়, আওরাঙ্গজেব-পুত্র বাহাদুর শাহের পৌত্র শামস্‌উদ্দীন আবুল বরাকাত রফি উদ্দারাজাতকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইলেন। বিংশতি বৎসর বয়সে কুমারকে কারাগার হইতে আনিয়া এই সম্রাট-সৃষ্টিকারক সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয় তাঁহাকে দিল্লীশ্বরের আসনে বসাইয়াছিলেন। কোতব-উল্‌-মোলক্‌ সৈয়দ আবদুল্লাহ্‌, এই নবীন সম্রাটের চতুর্দ্দিকে তাঁহার নিজ অনুচরগণকে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। রাজ প্রাসাদ অন্তঃপুরের মধ্যেও সৈয়দগণের দলস্থ লোক পাহারায় রহিল।

এই সৈয়দ হস্তে ক্রীড়নক সম্রাটের মাত্র ছয় মাস ও দশদিন সিংহাসনে বসার পর, ক্ষয়রোগে মৃত্যু হইল।

এইবার সৈয়দদ্বয় ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে মে তারিখে মৃত সম্রাটের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রফি-উদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইলেন। সৈয়দদ্বয়ের

অনুমতি ব্যতীত সম্রাটের কোন স্থানে, এমন কি শুক্রবারে জুম্‌আ নামাজের জন্ত মস্‌জিদে যাইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না।

এই অবসরে মহারাজা অজিৎ সিং তাঁহার কন্তা, নিহত সম্রাট ফোরুরোখ্‌ সিয়ারের মহিষীকে, প্রায় এক ক্রোর টাকা মূল্যের অলঙ্কার ও মূল্যবান দ্রব্যসহ, প্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া, তাহার মোসলমান সম্রাজ্ঞীর পোষাক পরিবর্ত্তিত করিয়া রাজধানী যোধপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

সিংহাসনে আরোহণকালে এই নবীন সম্রাটের নাম দ্বিতীয় শাহ্‌জাহান হইল। মাত্র তিন মাস দুইদিন কাল রাজত্বের পর, দুরারোগ্য গ্রহণী রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

এই সময় সৈয়দ হোসেন আলি আগ্রার দুর্গে প্রবেশ করিয়া, তিন শত বৎসরের সংগৃহীত, বাদশাহ্‌ বাবর ও তৎপূর্ব্বের সেকেন্দার লোদীর কালের পর্য্যন্ত, অন্যূন সেই সময়ের তিন ক্রোর টাকা মূল্যের ধনরত্ন আত্মসাৎ করিয়াছিল।

এই রত্নরাজির মধ্যে নূরজাহান বেগমের বহুমূল্য অলঙ্কার সমূহ, শাহ্‌জাহানপ্রিয়া মোমতাজ মহলের সমাধির মুক্তানির্ম্মিত আবরণ, (যাহা তাঁহার বাৎসরিক বিবাহ উৎসবের দিনে মহাসমারোহের সহিত, এবং প্রতি শুক্রবার রাত্রে, তাজমহলের অভ্যন্তরস্থ তাঁহার জগৎবিখ্যাত রত্ন-মণ্ডিত সমাধির উপর বিস্তারিত করিয়া দেওয়া হইত) এবং নূরজাহানের বহুমূল্য রত্নরাজি-খচিত জল-পাত্র, (আফ্‌তাবা) ও মুক্তা ও পান্নার ঝালর দেওয়া সুবর্ণতারে বোনা বিছানার চাদর প্রভৃতি ছিল।

অতঃপর সৈয়দ আবদুল্লাহ্‌ ফতেহ্‌পুর (রাজধানী দিল্লীর একটী প্রধান পল্লী) হইতে জাঁহান শাহের অষ্টাদশ বর্ষীয় পরম রূপবান প্রখর-বুদ্ধি পুত্র কুমার মোহাম্মদ রৌশন-আখ্‌তারকে আনিয়া ১১৩১ হিজরীর

১৫ই জিল্‌কদ তারিখে (১৭১৯ খৃঃ), তাঁহাকে আবুল মোজাফ্‌ফার নাসেরউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ্‌ বাদশাহ্‌ নাম দিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করাইলেন।

সম্রাট-জননী একজন প্রখর বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন ও রাজকার্য্যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। পুত্রের সিংহাসন আরোহণের পর সম্রাট-মাতার জন্য মাসিক ১৫,০০০ সহস্র টাকা বৃত্তি ধার্য্য হইল।

মোহাম্মদ শাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর হইতেই, নওয়াব মুরশিদ কুলি খান, বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার রাজস্ব ও তৎসহ পূর্ব্ব প্রথামত উপঢৌকন দিল্লীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন; এবং নব সম্রাট কর্ত্তৃক নওয়াব, তাঁহার অধীনস্থ তিনটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তার নির্দ্ধার্য্য পত্র পাইলেন।

সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্‌ ও তাঁহার মাতা মরিয়ম্‌ মাকানী, বেগম, সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয়ের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, উহাদিগকে কোন প্রকারে সরাইবার জন্য, মাল্‌ওয়ার শাসনকর্ত্তা নেজাম-উল্‌-মুল্‌কের নিকট পত্র লিখিয়া, বিশ্বাসী এত্‌মাদ-উদ-দ্দৌলা মোহাম্মদ আমিন খানের দ্বারা ঐ সকল পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। নেজাম-উল্‌-মুল্‌ক্‌ বহু অশ্বারোহী সেনা সংগ্রহ করিয়া উজ্জয়িনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রথমতঃ 'আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরে আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গিয়া বারহানপুরে পৌছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই হোসেন আলি (সৈয়দ) গুপ্ত হন্তার হস্তে নিহত হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লাহ্‌ ভ্রাতার অপমৃত্যুর সংবাদে রাগান্ধ হইয়া, ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রায় নবতিতম সহস্র ৯০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময় বিশ্বাসঘাতক চূড়ামন্‌ জাঠ ও মাখন সিং প্রভৃতি

কয়েকজন হিন্দু তাহার সঙ্গে যোগ দিল। এইরূপে সৈয়দ আবদুল্লার পতাকাধীনে লক্ষাধিক অশ্বারোহী সৈন্য সমবেত হইল। অপর পক্ষে সম্রাট সেনাপতি হায়দার কুলি খান বাহাদুর নাসেরজঙ্গ, সর্ব্বপ্রকারে ইহার অৰ্দ্ধেক সৈন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিতে সক্ষম হইলেন না।

সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্‌ হস্তী আরোহণে রণক্ষেত্রে তাঁহার জাতীয় বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নিশাগমনে হায়দার কুলি খান, শত্রুপক্ষের উপর অজস্র গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। সম্রাটের কামানের মুখে, সৈয়দ আবদুল্লার এক লক্ষ সেনার মধ্যে মাত্র সাত আট সহস্র রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিয়াছিল। প্রাতেঃ আবার সম্রাটকে হস্তীপৃষ্ঠ হইতে সৈন্য চালনার আজ্ঞা দিতে দেখা গেল। বিপক্ষ সেনাপতি সৈয়দ নাজমুদ্দীন আলি শরীরের তিন স্থানে গুলির আঘাত পাইবার পর, একটী তীর লাগিয়া তাঁহার একটী চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল ও তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। এই সময় ভারতেশ্বর মোহাম্মদ শাহ্‌, নিজ হস্তে বিপক্ষীয় চূড়ামন্‌ জাঠকে আহত করিয়াছিলেন।

সৈয়দ আবদুল্লাহ্‌, হস্তে তরবারির আঘাত ও ললাটে শরাহত হওয়ার পর যখন, সম্রাট সেনাপতি হায়দার কুলি খান বাহাদুর উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, সেই সময় আবদুল্লাহ্‌ কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে, স্বীয় বংশের পরিচয় দিয়া সেনাপতির নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। হায়দার কুলি খান তাঁহার প্রাণের হানি না করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন।

সম্রাটও সৈয়দ আবদুল্লার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পরিবর্ত্তে, তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিবার অনুমতি দিলেন, এই বৎসর ১৭২২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে বন্দী অবস্থায় সৈয়দ আবদুল্লার মৃত্যু হইল। (১১৩৪ হিজরী)।

১১৩৫ হিজরীতে মুরশিদ কুলি খান, সৈয়দ ভ্রাতাদ্বয়ের অবসান ও সম্রাটের যুদ্ধ জয়ের সংবাদ পাইয়া, তাঁহার নিকট মাঙ্গল্য পত্র প্রেরণ করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব বৎসরের সমুদয় রাজস্ব, মন্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময় মাহ্‌মুদাবাদের দুইজন আফ্‌গান জমিদার, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন ও তৎসহ মুরশিদাবাদে আনিতে থাকা রাজস্ব ৬০,০০০ সহস্র টাকা লুঠ করিয়া লইবার সংবাদ পাইয়া নওয়াব, হুগলীর ফৌজদার আহ্‌সান আলি খানের প্রতি জমিদারদ্বয়কে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। আহ্‌সান আলি অচিরে আফগান জমিদারদ্বয়কে গ্রেফতার করিয়া নওয়াবের দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। নওয়াব দুই জনের প্রতি যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিয়া, তাহাদের জমিদারী রামজীবন নামক জনৈক হিন্দুকে প্রদান করিলেন।

দস্যু দমনে নওয়াব মুরশিদ কুলি খান প্রাণপণে চেষ্টা ও ধৃত তাহাদিগের প্রতি কঠিন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়া রাজ্য মধ্যে বিপ্লব নিবারণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার আমলে লোকে নির্ভয়ে পথ চলিয়া দূরে দূরে মালামাল লইয়া যাইতে পারিত।

নওয়াব শায়েস্তা খান ব্যতীত মুরশিদ কুলি খানের ন্যায় ন্যায়বিচারক, জ্ঞানী, সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক সুবাদার বঙ্গের সিংহাসনে কখনও উপবিষ্ট হন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি একজন যথার্থ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, পাঁচ অক্ত নমাজের প্রতি ইঁহার প্রখর দৃষ্টি ও প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। নিজ হস্তে পবিত্র কোরআন লিখিয়া মুরশিদ কুলি খান, প্রতি বৎসর মক্কা ও মদিনায় পাঠাইয়া দিতেন। অষ্ট-প্রহর কোরআন পাঠের জন্য নওয়াব, তাঁহার প্রাসাদে দুই শতাধিক ধার্ম্মিক কারী ও হাফেজ্‌ নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর রবিয়ল্‌-আউয়াল্‌ মাসের প্রথম দ্বাদশ

দিন নওয়াব, ধনী-নির্ধন নির্ব্বিশেষে, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বহু লোককে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতেন ; এবং ঐ কয় দিবস প্রত্যেক রাত্রে মাহী নগর হইতে লালবাগ পর্য্যন্ত, তিন মাইল রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ মস্‌জেদ ও বৃক্ষ সকল আলোকমালা দ্বারা বিভূষিত করিতেন। আবার এই আলোকমালা দ্বারা অক্ষরাকারে অধিকাংশ স্থলে কোরআনের পবিত্র শ্লোক সকল লিখিত হইত।

নওয়াব তাঁহার রাজত্বের মধ্য হইতে বিদেশে খাদ্যদ্রব্য রফ্‌তানির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। হুগলীর ফৌজদারের উপর তাঁহার কঠোর আদেশ ছিল যেন, কোন ইউরোপীয় জাহাজে নাবিকগণের আহারের আবশ্যকীয় খরচের উপযুক্ত ব্যতীত, অধিক শস্য না উঠিতে পারে। কোন বিদেশী বণিককে তাঁহার রাজ্য মধ্যে শস্য সংগ্রহ করিতে দেওয়া হইত না।

মুরশিদ কুলি খানের আমলে সচরাচর টাকায় চারি মণ চাউল বিক্রয় হইত। তাঁহার হেরেমে তাঁহার একমাত্র বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। অপর কোন স্ত্রীলোক বা খোজা, তাঁহার অন্দরে স্থান পাইত না। নওয়াব বিলাসিতার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ বা খাদ্যদ্রব্য, কিছুতেই তাঁহার বিলাসিতার চিহ্নমাত্র প্রকাশ পাইত না। মুরশিদ কুলি নিজে একজন সুলেখক, বিদ্যোৎসাহী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল। বিচারের সময় নওয়াবের নিকট ধনী ও নির্ধনের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য থাকিত না।

মুরশিদ কুলি খানের রাজত্বের প্রারম্ভে হুগলীর নগরাধ্যক্ষ একজন দরিদ্র মোগলের গৃহ হইতে, তাঁহার সুন্দরী যুবতী কন্যাকে বল পূর্ব্বক লইয়া গিয়াছিলেন। ফৌজদারের নিকট ঐ দরিদ্র এই অত্যাচারের বিচার প্রার্থী হওয়ায়, ফৌজদার আহ্‌সানউল্লাহ নগরাধ্যক্ষের খাতিরে ঐ ব্যাপারের কোনই প্রতিকার করেন নাই। কন্যার পিতা শেষে

বাধ্য হইয়া নওয়াবের দরবারে এই অত্যাচার কাহিনী বিবৃতি করিয়া বিচার-প্রার্থী হইল। এদিকে ফৌজদারও তাঁহার প্রিয়পাত্র নগরপালকে রক্ষা করিবার জন্য, অন্ততঃ তাঁহার দৈহিক শাস্তি আর্থিকে পরিণত করিবার জন্য, নওয়াব মুরশিদ কুলি খানকে সাধ্যমত অনুরোধ-উপরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মগত-প্রাণ ন্যায় বিচারক শাসনকর্ত্তা সকল অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া, কোরআনের পবিত্র বিধান মতে, অপরাধীর প্রতি চরম দণ্ডাজ্ঞা, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপদ্বারা (সঙ্গসার) তাহার মৃত্যুর আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

১১৩৮ হিঃ ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে নওয়াব মুরশিদ কুলি খান, তাঁহার পরমায়ুঃ শেষ হইয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার স্থলে তদীয় দৌহিত্র সর্-আফরাজ খানকে সুবাদার নিযুক্ত করিবার জন্য সম্রাটের নিকট মিনতি সহকারে আবেদন করিয়া পাঠাইলেন। এদিকে সর-আফাজের পিতা উড়িষ্যার সহকারী-সুবাদার সুজাউদ্দীন খান, নওয়াবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, সৈয়দ হোসেন আলীর পদে নিযুক্ত দিল্লীশ্বরের প্রধান অমাত্য প্রবল ক্ষমতাশালী খান-দৌরাণের নিকট বাঙ্গালার নওয়াবী পদ পাইবার প্রার্থনা করিয়া লোক পাঠাইয়া দিলেন। শেষে দিল্লীর দরবার হইতে এই সাব্যস্ত হইল যে—খান-দৌরাণ স্বয়ং বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নওয়াব-শাসনকর্ত্তা হইবেন, এবং সুজাউদ্দীন তাঁহার সাহায্যের জন্য আপাততঃ ঐ প্রদেশদ্বয়ের সহকারী শাসনকর্ত্তা হইয়া থাকিবেন।

সুজাউদ্দীন, তাঁহার অধীন কার্য্যদক্ষ ও সাহসী কর্ম্মচারীগণকে পূর্ব্বেই মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিয়া, স্বয়ং নৌকাযোগে কটক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসৈন্যে রাজধানীতে আসিয়া পৌছিলেন।

মুরশিদাবাদ নগরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সুজাআ, পথে নওয়াবের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। তৎপরে তিনি চেহেল্-সতুন (চত্বারিংশ স্তম্ভ) নামক

প্রাসাদে পৌঁছিয়া, সমস্ত রাজকর্ম্মচারীকে তথায় আহ্বান করিলেন; এবং তাঁহাদের সম্মুখে স্বীয় নিয়োগের সনন্দ পাঠ করিয়া ও উপস্থিত জনগণের নিকট হইতে উপযুক্ত সম্মান গ্রহণে সিংহাসনারূঢ় হইলেন।

সুজাউদ্দীনের পুত্র সর্‌-আফরাজ খান, ইতিপূর্ব্বে মাতামহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (১৭২৫ খৃষ্টাব্দে) তৎপরিত্যক্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি নিজ বাড়ীতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পিতার রাজ্য প্রাপ্তির পর সর্‌-আফ্‌রাজ, তাঁহার শুভধ্যায়ীগণের পরামর্শে বরাবর পিতার নিকট গিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন, পরে উঠিয়া পিতার এই উন্নত পদপ্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন; তৎপর প্রাসাদ পরিত্যাগে নৌকা-খানিতে স্বীয় গৃহে চলিয়া গেলেন।

সেই দিবস হইতে সর্‌-আফ্‌রাজ প্রত্যহ আসিয়া পিতাকে তাঁহার পদোচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

—(সিয়ারল্‌ মোতাখ্‌ক্ষরীণ)

একবিংশ সর্গ

নওয়াব সুজাউদ্দীন মোহাম্মদ খান সুজাউদ্দৌলা আসাদজঙ্গ বাহাদুর

সুজাউদ্দীন পারস্যের পূর্ব্বাংশে খোরাসান প্রদেশের ভদ্র বীর বংশোদ্ভব একজন প্রধানের পুত্র। ইঁহার পিতা সম্রাট সরকারে চাকুরী লইয়া, দাক্ষিণাত্যে দিল্লীশ্বরের কার্য্যে বারহানপুরে নিযুক্ত ছিলেন। এই স্থানেই সুজাউদ্দীনের জন্ম হয়। এই সময় মুরশিদ কুলি খান হায়দ্রাবাদের দেওয়ান ছিলেন। ক্রমে সুজাউদ্দীনের সহিত পরিচয় ও আলাপ হওয়ায় মুরশিদ কুলি খান, তদীয় একমাত্র কন্যা জেন্নাতুন্নেসা বেগমের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই জেন্নাতুন্নেসার গর্ভে মির্জ্জা আসাদ-উল্লাহ্‌ জন্ম গ্রহণ করেন। ইতিহাসে ইনিই সর্‌-আফরাজ খান নামে অভিহিত হইয়াছেন।

মুরশিদ কুলি বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া আসিলে তাঁহার কন্যা-জামাতাও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তৎপরে মুরশিদ যখন বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নওয়াবী পদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি জামাতা সুজাকে উড়িষ্যার নায়েব শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। সুজাউদ্দীন সরকারি কার্য্য বিশেষ যোগ্যতার সহিত চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি অতিরিক্ত সমুদাচার দোষে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া, একমাত্র পুত্র আসাদ উল্লাহ্‌ সহ রাজস্বামী ও রাজধানী কটক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতার নিকট মুরশিদাবাদে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

নওয়াব সুজাউদ্দীন বাঙ্গালায় প্রথম শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত শাসনকর্ত্তা হইলেন। তাঁহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত মুরশিদাবাদের সমুদয় স্বাধীন বা ইংরাজ অনুগ্রহ-পালিত নওয়াবই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া আসিতেছেন। দিল্লীর আভ্যন্ত বাদশাহগণের মধ্যে কেহই শিয়া ছিলেন না। তাঁহারা সকলেই সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা বিভাগে নায়েব শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত থাকা কালে সুজাউদ্দীন, তাঁহার সম্পর্কীয় ভগ্নীর পুত্র হাজী আহ্‌মদ ও মির্জ্জা মোহাম্মদ আলিকে (পরে আলিওয়ার্দ্দী খান) দিল্লী হইতে কটকে আনাইয়াছিলেন। এই উভয় ভ্রাতা তাঁহাদের অসাধারণ সেবা ও কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শনে সুবাদারকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্রমে তাঁহার অধীনে দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের জন্যই সুজাউদ্দীন উড়িষ্যা বিভাগে এতদূর জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন।

নওয়াব সুজাউদ্দীন সিংহাসনারূঢ় হইয়া, প্রথমতঃ তাঁহার স্ত্রী জেন্নাতুন্নেসা বেগমকে সন্তুষ্টকরণকল্পে, পুত্র সর্‌-আফ্‌রাজ খানকে তাঁহার অধীনে বাঙ্গালার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন, এবং রায় আলম্‌চাঁদকে তাঁহার সহকারী দেওয়ান করিয়া দিলেন। তৎপরে নওয়াব সুজা, হাজী আহ্‌মদ, আলিওয়ার্দ্দী খান, রায় আলম্‌চাঁদ (যাহাকে নওয়াব, রায়-রেঁই-য়ান উপাধিতে ভূষিত করেন) ও জগৎ শেঠকে লইয়া রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য, একটী মন্ত্রণাসভা গঠিত করিলেন। এই হিন্দু সভাসদদ্বয়ের রাজস্ব বিভাগের জটিলতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল।

এইরূপে দায়যুক্ত ন্যায়-বিচার দ্বারা নওয়াব সুজাউদ্দীন, অচিরে রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্র সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও সর্ব্বপ্রিয়তার অধিকারী হইয়া দাঁড়াইলেন।

অপরপক্ষে সম্রাটকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য নওয়াব, তাঁহার শ্বশুরের রাজকোষ হইতে দিল্লীশ্বরের প্রাপ্য কর ৪০,০০০০০ চল্লিশ লক্ষ টাকা,

তৎসহ কতকগুলি হস্তী ও বঙ্গদেশজাত মূল্যবান দ্রব্য সম্রাট মোহাম্মদ শাহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় মন্ত্রী খান-দৌরাণ আমীরুল ওমরাহের জন্যও পৃথক করিয়া কতকগুলি মূল্যবান উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

অচিরে বাদশাহ্ দরবার হইতে তাঁহার জন্য বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদ নির্দ্ধারিত হইয়া আসিল, এবং সম্রাট তাঁহাকে মতীমুনাল্ মুল্ক সুজাউদ্দৌলা আসাদজঙ্গ বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

বেহার প্রদেশ সম্রাট, নাসরৎ ইয়ার খানকে দিলেন ও তাঁহার পর ফখর্-উদ্দৌলা তথাকার শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

নওয়াব সুজাউদ্দীন তাঁহার রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন—

পূর্ব্বেই পুত্র সর্-আফ্রাজ খানকে বাঙ্গালার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার অপর স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মোহাম্মদ তকি খানকে, উড়িষ্যা বিভাগের কর্ত্তা করিয়া দিলেন। অতঃপর স্বীয় জামাতা মুরশিদকুলি খান্কে ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা ও প্রধান মন্ত্রী হাজী আহ্মদের তিন পুত্র, নওয়াজেশ্ মোহাম্মদ, সৈয়দ আহ্মদ এবং জয়েনল আবদীনকে যথাক্রমে বেতন বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মে ও রংপুরের এবং রাজমহলের ফৌজদারী পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার দরবারের বহু পুরাতন ভৃত্য সুজাকুলিকে হুগলীর ফৌজদারী কার্য্য দিলেন।

আলিওয়ার্দ্দী খান অপুত্রক ছিলেন। তিনি তাঁহার তিন কন্যার বিবাহ, ভ্রাতা হাজী আহ্মদের উপযুক্ত তিনটি পুত্রের সহিত দিয়াছিলেন।

নূতন নওয়াব তাঁহার শ্বশুরের অনুকরণে, জমিদারগণকে নির্য্যাতন দ্বারা রাজস্ব আদায়ের উপায় অবলম্বন না করিয়া, বরং জমিদারগণের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শনে, রাজস্বের হার বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মুরশিদ কুলি খানের সময়ে যে রাজস্ব বার্ষিক এক কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকার উপরে উঠে নাই, সেই রাজস্ব হিঃ ১১৪১ সালে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব সচীব জগৎ শেঠের তত্ত্বাবধানে এক ক্রোর আট চল্লিশ লক্ষ টাকা মুরশিদাবাদের ধনাগারে সংগৃহীত হইতে লাগিল।

নওয়াব পুরাতন প্রাসাদ ভগ্ন করিয়া, অতীব মনোহর জাঁক-জমকীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন। দাতব্য ও নিরপেক্ষ বিচারের জন্য, নওয়াব সুজাউদ্দীন সকল সম্প্রদায়ের নিকট প্রিয় হইয়া উঠিলেন। শ্বশুরের নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারী নজির আহমদ ও মোরাদের অসম্ভব নিষ্ঠুর ব্যবহারে বার বার ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া, বিচারে তিনি উভয়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী নওয়াবের আমলে অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা অতিশয় অল্প থাকায়, তিনি উহা বৃদ্ধি করিয়া ২৫,০০০ করিয়াছিলেন।

এই নব শাসনকর্ত্তা তাঁহার রাজত্বের প্রথমাবস্থায় সকল কার্য্যে বিচক্ষণতা প্রদর্শন দ্বারা সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর মধ্যেই এই মহা চটুল শাসনকর্ত্তা অসম্ভব অলস প্রকৃতির হইয়া, বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। এই সময় সমুদয় রাজকার্য্য পূর্ব্ব-বর্ণিত পাঁচজন সভাসদ দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর, বেহারের শাসনকর্ত্তা ফখরউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিলেন ও খান দৌরাণের পরামর্শ মতে বেহার প্রদেশ বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন।

নওয়াব সুজাউদ্দীন বেহার প্রদেশ নিজ করায়ত্ত করিয়া, আলীওয়ার্দ্দী খানকে ঐ নূতন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন; এবং ৫,০০০ সেনা সহ তাঁহাকে পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন।

আলিওয়ার্দ্দী খান বেহারে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে—বেথিয়া, ফুল্‌ওয়ারা, চাক্‌ওয়ার ও ভোজপুরের জমিদারগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং

বান্‌জারা নামক একদল প্রবল দস্যুর উপদ্রবে লোকের ধন-সম্পত্তি লইয়া বাস করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে।

নব শাসনকর্ত্তা আলিওয়ার্দ্দী খান, পরাক্রান্ত আফ্‌গান সেনাপতি আবদুল করিম খানের অধীনে একদল পাঠান সেনা পোষণ করিতে লাগিলেন। এই আফগান সেনা ও বঙ্গীয় সেনার সাহায্যে আলিওয়ার্দ্দী বান্‌জারা দস্যুদলকে নির্ম্মূল করিয়া, বিদ্রোহী জমিদারগণের উপর পড়িলেন।

অচিরে আলিওয়ার্দ্দী খান, বেহার বিভাগের সমস্ত জমিদারগণকে শাসনে আনয়ন করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে বাকী রাজস্ব ও তৎসহ নিজের নজরানা ও পেশকাশ্‌ আদায় করিতে লাগিলেন। এই উপায় দ্বারা তিনি বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন ও দিল্লীর সমুদয় বাকীপড়া রাজস্ব অল্পদিন মধ্যেই পরিশোধ করিয়া দিলেন। এই ব্যাপারে দিল্লীশ্বর তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার সামরিক পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া, তাঁহাকে মোহাব্বৎ-জঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

এই বৎসর মধ্যেই আলিওয়ার্দ্দী খানের অসময়ের প্রকৃত সুহৃদ আফগান সেনাপতি আবদুল করিমের গর্ব্ব, রূঢ়তা এবং নৃশংসতা, এত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সুবাদারকে বাধ্য হইয়া বন্ধু-হত্যার অপরাধে স্বীয় বিমল যশঃ ও সুখ্যাতি অনুজ্জ্বল করিতে হইল।

এই সময় জার্ম্মানেরা কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল দূরে বাঁকিবাজার নামক স্থানে কুঠি ও গড় নির্ম্মাণ করিয়া, ইংরাজ ও দিনেমারগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যবসায় চালাইতেছিলেন। তাঁহাদের ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতি ইংরাজগণের চক্ষুশূল হইয়া পড়িল। তখন ইংরাজ দিনেমারের সহিত মিলিত হইয়া, নওয়াবের নিকট জার্ম্মাণগণের বিরুদ্ধে নানা কথা লাগাইতে লাগিল। এই উভয় কোম্পানি হুগলীর ফৌজদারকে অর্থে বশীভূত করিয়া,

তাঁহার দ্বারা নওয়াবের নিকট—"জার্ম্মাণগণের এই গড় ও ক্রমোন্নতি, রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিপদ অবসম্ভাবী" ইত্যাদি নানা ঈর্ষামূলক বর্ণনা করাইল।

১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে নওয়াব সুজাউদ্দীন জার্ম্মাণদিগের এই বাঁকিবাজারের গড় ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য ফৌজদারের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। হুগলী হইতে ফৌজদার সেনাধ্যক্ষ মীর জাফর, কতকগুলি সেনা লইয়া বাঁকিবাজারে পৌছিলেন। এই সময় চন্দননগর হইতে ফরাসীরা জার্ম্মাণগণকে বন্দুক, বারুদ ও গোলা দিয়া সাহায্য করিয়াছিল।

কয়েক দিবস অবরোধের পর হুগলীর তৎকালীন প্রসিদ্ধ সওদাগর খাজা ফজল্ কাশ্মীরী সন্ধির প্রস্তাব করিতে স্বীয় পুত্রকে জার্ম্মাণদিগের নিকট প্রেরণ করায়, জার্ম্মাণেরা তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ফৌজদার এই ব্যাপারে অধিকতর রাগান্বিত হইয়া, জল ও স্থল উভয় দিক হইতে জার্ম্মাণ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ভারতবাসী প্রজাগণ এই অবস্থা দেখিয়া জার্ম্মাণ গড়বন্দী নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। জার্ম্মাণেরা শেষ পর্য্যন্ত কামানের সাহায্যে ফৌজদারের সেনাগণকে কোন মতে তাহাদের গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। অবশেষে শত্রু-কামান-নিক্ষিপ্ত একটী গোলায় জার্ম্মাণ সামরিক প্রতিনিধির দক্ষিণ হস্ত উড়িয়া যাওয়ায়, তিনি সেই অবস্থায় রাত্রিযোগে সৈন্যসহ পলাইয়া ভাগীরথীর মোহানায় জার্ম্মাণ জাহাজে উঠিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

সেনাপতি মীর জাফর, বাঁকিবাজারের কুটী সকল ভূমিসাৎ করিয়া ও নিকটবর্ত্তী জনৈক জমিদারকে ঐ স্থান তাঁহার জমিদারীর অঙ্গভূক্ত করিয়া দিয়া, হুগলী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নওয়াব জামাতা মুরশিদ কুলি, এই সময় ঢাকার নায়েব-নাজিম পদে অভিষিক্ত ছিলেন ও তিনি পারস্য দেশবাসী জনৈক মীর হবিব

শিয়াজীকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আকা সাদেক্ নামে ঐ দেশীয় একজন জমিদার, দেওয়ানের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে ত্রিপুরার হিন্দুরাজা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন; এবং সেই যুবক আকা সাদেকের নিকট আসিয়া তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হয়। মীর হবিব এই সুযোগে তাঁহার বন্ধু আকা সাদেকের নিকট গিয়া, ঐ যুবককে ডাকিয়া মুরশিদ কুলি খানের নিকট লইয়া গেলেন। পরে তাঁহার অনুমতিক্রমে ঢাকার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে মোগল সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ত্রিপুরারাজ হঠাৎ মোগলের আক্রমণে ভীত হইয়া, পলায়ন করিয়া অরণ্য-সমাকীর্ণ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোগল সেনাপতি মীর হবিব রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালার নওয়াবের করদ রাজা নিযুক্ত করিয়া, এবং তাঁহার রাজ্যরক্ষার্থে আকা সাদেকের অধীনে একদল মোগল সেনা রাখিয়া, ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মুরশিদাবাদ রাজধানীতে এই বিজয় সংবাদ পাইয়া নওয়াব, মোস্লেম অধিকৃত ত্রিপুরার নাম রৌশন-আবাদ রাখিলেন; এবং নাজিম মুরশিদ কুলিকে খান বাহাদুর ও মীর হবীব্‌কে খান উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ তকী খানের উড়িষ্যায় মৃত্যু হওয়ায়, নওয়াব তাঁহার জামাতা মুরশিদ কুলি খানকে ঢাকা হইতে ডাকাইয়া, রোস্তম্ জঙ্গ উপাধি দিয়া, উড়িষ্যা বিভাগের সহকারী শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। মুরশিদ কুলি দেওয়ান মীর হবিব খানকে সঙ্গে করিয়া উড়িষ্যায় গেলেন। দেওয়ান হবিব খানের বিচক্ষণতা ও কার্য্য-নিপুণতায় উড়িষ্যা বিভাগের রাজস্ব যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনি রাজ্যের ব্যয়ও ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল।

এই সময় পুরুষোত্তমের রাজা, মন্দির হইতে জগন্নাথের মূর্ত্তি উঠাইয়া লইয়া, চিল্কা হ্রদের পরপারে উড়িষ্যার সীমার বাহিরে একটী পর্ব্বতের উপর স্থাপন করায়, দূর-দূরান্তরের যাত্রীগণের গমনাগমন বন্ধ হয় ও তদ্ধেতু উড়িষ্যা বিভাগের রাজস্ব পূর্ব্বাপূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বাৎসরিক নয় লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছিল। এই কারণে শাসনকর্ত্তা মুরশিদ কুলি খান ও তাঁহার দেওয়ান উভয়েই যথার্থরূপে সনাতন এস্‌লাম ধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, পুরীর রাজাকে পুরাতন মন্দিরে জগন্নাথ ফিরাইয়া আনিবার জন্য বাধ্য করিলেন।

মুরশিদ কুলিকে উড়িষ্যায় প্রেরণ করিয়া নওয়াব সুজাউদ্দীন, স্বীয় পুত্র সর্-আফ্‌রাজ খানের হস্তে ঢাকার শাসনভার ন্যস্ত করিলেন এবং সৈয়দ গালেব আলি খানকে পুত্রের সহকারী করিয়া, সর-অফ্‌রাজের শিক্ষক জশোবন্ত রায়কে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই সঙ্গে নওয়াব, সর্-আফ্‌রাজের জামাতা মোরাদ আলি খানকে রাজা রাজবল্লভের সহায়তায় নৌবিভাগের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন।

জশোবন্ত রায়, ভূতপূর্ব্ব নওয়াব মুরশিদ কুলি খানের নিকট সমস্ত রাজকার্য্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত স্বর্গীয় নওয়াবের অনুকরণে, সাধুতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় বৃদ্ধির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন।

বহুপূর্ব্বে সুবাদার শায়েস্তা খান, ঢাকার পশ্চিম দ্বার বন্ধ করিয়া তদুপরি টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় করাইতে অপারগ কোন সুবাদারকে ঐ বন্ধ দ্বার খুলিতে নিষেধ করিয়া আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। এতদিন পরে দেওয়ান জশোবন্ত রায়, বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য তণ্ডুলের মূল্য সেই মত টাকায় আট মণ নামাইয়া, সগর্ব্বে সুবাদার সর্-আফ্‌রাজ খান কর্ত্তৃক সেই আবদ্ধ পশ্চিম দ্বার উন্মোচন করাইলেন।

এইরূপে গালেব আলি খান ও জশোবন্ত রায়, তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা ঢাকা অঞ্চলের সর্ব্বপ্রকারে আশাতিরিক্ত উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে সর্-আফ্রাজের ভগ্নী নফিসা বেগম, পিতাকে অনুরোধ করিয়া গালেব আলি খানের পদে স্বীয় ভ্রাতৃ-জামাতা মোরাদ আলিকে পাঠাইয়া দিলেন। মোরাদ আলি এবার ঢাকায় পৌছিয়া রাজবল্লভকে তাঁহার অধীনে পেশ্কার নিযুক্ত করিলেন। রাজবল্লভ প্রজাগণের উপর তাহার স্বভাবসিদ্ধ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। রাজ্যের এই অবস্থা দর্শনে দেওয়ান জশোবন্ত রায় পদত্যাগপূর্ব্বক মুরশিদাবাদে চলিয়া আসিলেন। রাজ্যের অবস্থা তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল।

এই বৎসরে হাজী আহ্মদের পুত্র সৈয়দ আহ্মদ রাজধানী হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া, দিনাজপুর ও পরে কুচবেহার আক্রমণ করিয়া, উভয় স্থান করায়ত্ত করিয়া লইলেন।

এই সময় পারস্যাধিপতি নাদের শাহ ভারতে প্রবেশ করিয়া, দিল্লী ও অন্যান্য বহু নগর লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলেন।

সম্রাট আবুল ফতেহ্ নাসের উদ্দীন মোহাম্মদ শাহের একবিংশতি বৎসর রাজত্বকালে, পশ্চিমদেশীয় এই মহা উপদ্রব তাঁহার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। নাদের শাহ্ কাবুল অধিকার করিয়া, তথাকার শাসনকর্ত্তা নাসির খানকে সঙ্গে লইয়া ভারতে প্রবেশ করিলেন। ভারত সম্রাট দুই লক্ষ অশ্বারোহী, অসংখ্য পদাতিক সেনা, পনের শত হস্তী ও অগণ্য কামান লইয়া পারস্যরাজাকে বিতাড়িত করিবার জন্য, তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। বাদশাহ্ কর্ণালের নিকট শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক পারস্যরাজের প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নাদের শাহ্ তাঁহার সহিত তিন লক্ষ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সেনা আনিয়াছিলেন।

বাদশাহের পক্ষ হইতে বোরহান উল্-মুলক্ প্রথমতঃ বিপক্ষগণকে আক্রমণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিরুল্ ওমরাহ্ খানদৌরাণ বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সহ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

যুদ্ধারম্ভেই বোরহান উল্-মুলক্ বন্দি হইয়া পারস্যাধীপের সম্মুখে নীত হইলেন। তৎপরে নাদের শাহের সেনাগণ চতুর্দ্দিক হইতে খান দৌরাণকে আক্রমণ করিয়া, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভারতীয় সেনা—সৈয়দ, শেখ, পাঠান ও রাজপুতগণ, অসিযুদ্ধে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, দিবাবসানে ঈরাণীগণকে হটাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মহাসেনাপতি আমিরুল-ওমরাহের তখন প্রায় পাঁচ সহস্র সেনা ধরাশায়ী হইয়াছে। তন্মধ্যে তাঁহার সহোদর মোজাফ্ফর্ খান ও মীর কাল্লু, আলি হামিদ খান, ইয়াদগার খান, লোদি খান প্রভৃতি রণনিপুণ সেনাপতিও ছিলেন। সন্ধ্যার পর আমিরুল্-ওমরাহ্ খান-দৌরাণ আহত অবস্থায় বস্ত্রাবাসে ফিরিয়া গেলেন।

পর দিবস মহাসেনাপতি পুনরায় নূতন সেনা লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন ও অল্পক্ষণ মধ্যে ঈরাণী সেনাগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া স্বয়ং রণক্ষেত্রে দেহ রক্ষা করিলেন।

এই সময় নাদের শাহ, ভারতীয় সেনাগণের সাহস ও যুদ্ধ কৌশল দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, বন্দি বোরহান-উল্-মুল্ককে সম্রাটের সেনাগণের অবস্থা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

"খান-দৌরাণের ন্যায় অনেক মোসলেম বীর-সেনাধ্যক্ষ ও হিন্দু রাজা, বাদশাহের সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; এবং তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ পারস্যপতির সমকক্ষ হইতে পারিবে।"

প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্দ্ধর্ষ ঈরাণী নাদের শাহ্‌ বোর্‌হান-উল্‌-মুল্‌কের উত্তরে ভগ্নোৎসাহ হইয়া, বাদশাহের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইলেন ও এই মোগল সেনাপতির মধ্যস্থতায় অল্পকাল মধ্যেই সন্ধি হইয়া গেল।

বাদশাহ্‌ মোহাম্মদ শাহ্‌ নেজাম্‌-উল্‌মুল্‌কের উপদেশ ক্রমে, পারস্য সম্রাট নাদের শাহের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। নাদের প্রথমতঃ সম্রাটের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচার প্রদর্শনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া, পরে কৌশলে সম্রাটকে অবরোধ করিলেন। এই অবস্থায় সম্রাটকে লইয়া নাদের শাহ্‌, দিল্লীর দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ও জগৎপ্রসিদ্ধ দেওয়ানেখাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পরবর্ত্তী শুক্রবারে নাদের শাহের নামে মস্‌জেদে খোৎবা পাঠ হইল। কিন্তু কি মনে করিয়া তৎপরবর্ত্তী শুক্রবার হইতে তিনি নিজেই বাদশাহের নামে পূর্ব্ববৎ খোৎবা পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন।

এই খোৎবা পাঠ উপলক্ষ করিয়া দুর্গের বাহিরে নগরের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল যে—দুর্গ মধ্যে পারস্য সম্রাট নাদের শাহ্‌ বধ হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসিগণ উত্তেজিত হইয়া প্রায় পাঁচ সহস্র নিরস্ত্র ঈরাণী সেনা নিহত করিল। অচিরে নাদের শাহ্‌ সংহার মূর্ত্তিতে দুর্গের বাহিরে আসিলেন ও কিছুদূর পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইয়া চাঁদনী চকের সম্মুখস্থ রওশন-উদ্দৌলার প্রস্তুত সোনহেরী মস্‌জেদের চাতালে (স্বর্ণ মস্‌জেদ) উপবেশন করিলেন। অল্পক্ষণ চিন্তার পর নাদের শাহ্‌, ঐ ধর্ম্মাগারে বসিয়াই তথা হইতে তাঁহার ঈরাণী সেনাগনের প্রতি কাত্‌লে আমের (রমণী-বালক-বালিকা নির্ব্বিশেষে সাধারণ নরহত্যার) হুকুম দিলেন। নয় ঘণ্টা কাল মধ্যে দিল্লীর রাস্তায় রক্তের স্রোত বহিয়া গেল। শেষে নগররক্ষকের তালিকা মিলাইয়া দেখা গেল যে

নিষ্ঠুর পারশ্যপতির এই অমানুষিক, নৃশংস অত্যাচারে দিল্লীর নগরবাসী বিংশতি সহস্র নর-নারীকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল।

এই লোমহর্ষণ অত্যাচারের পর, পারশ্য সম্রাট ভারতের বহু ধনরত্ন বলপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া উষ্ট্র ও হস্তী-পৃষ্ঠে স্বীয় রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। ভারতবর্ষ পরিত্যাগের সময় নাদের শাহ্ বাদশাহকে সাতটী পারশ্য দেশীয় ঘোটক ও কয়েকটি মণিমুক্তা-পূর্ণ থলি উপহার দিয়াছিলেন। এবং মন্ত্রীবর্গকে খেল্‌আত্ উপহার দিয়া হিঃ ১১৫২ সালের ৭ই সফর ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিদায়কালে পারশ্য সম্রাট ভারতের অন্যূন ৫০ ক্রোর টাকা মূল্যের দুঃস্প্রাপ্য রত্নরাজীর সহিত, বাদশাহ্ শাহ্‌জাহানের প্রস্তুত এক ক্রোর টাকার অধিক মূল্যের তখত্‌তাউস (ময়ূর সিংহাসন) লইয়া গেলেন। (রোস্তম আলি লিখিত তওয়ারিখে হিন্দী ও খোশালচাঁদ লিখিত তাজ্‌কেরা)।

নাদের শাহের বিদায়ের পূর্ব্বেই বঙ্গেশ্বর সুজাউদ্দৌলা, সম্রাট দরবারে বাঙ্গালার রাজস্ব স্বরূপ দুই ক্রোর টাকা ও তিনশত হস্তী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

আলা-আ-দৌলা সর্-আফ্‌রাজ খান।

এই ভীরু স্বভাবাপন্ন নওয়াব পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুরশিদাবাদের সিংহাসনে বসিলেন বটে, কিন্তু ভয়ে তিনি দুর্গের বাহিরে আসিয়া, পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। পিতৃ আদেশ পালন করিয়া তিনি হাজী আহ্‌মদ, রায় রেইয়ান এবং জগৎ শেঠকে রাজ সভায় তাঁহার প্রধান প্রধান তিনজন সহকারী নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নওয়াবী পদ নির্দ্ধার্য্যকরণ জন্য দিল্লীর দরবারে রাজদূত সহ বহু অর্থ প্রেরণ করিলেন।

মাতামহ মুরশিদ কুলির উদাহরণে নওয়াব সর্ আফ্‌রাজ, ধর্ম্মার্থে অকাতরে অর্থ বিতরণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ও কোরআন পাঠার্থে রাজকীয় ব্যয়ে অনেক কারী (পাঠক) নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। নওয়াবের দেহরক্ষী স্বরূপ দুই সহস্র অশ্বারোহী সর্ব্বক্ষণ তাঁহার অধীনে প্রস্তুত থাকিত। নবীন নওয়াব অতিমাত্রায় আমোদ প্রিয় হইলেও, পানদোষ ও নিষ্ঠুরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনাই।

সর্-আফ্‌রাজ, পারশ্যাধিপতি নাদের শাহ্‌ কর্ত্তৃক দিল্লীর দুরাবস্থার বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন ও মস্‌জেদে ঈরাণ সম্রাটের নামে খোৎবা পর্য্যন্ত পড়িতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে শত্রুপক্ষ সম্রাট মোহাম্মদ শাহের সমীপে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া, নওয়াবের বিরুদ্ধে দিল্লীশ্বরের মত বিগড়াইয়া দিয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে নওয়াবের সদ্ব্যবহারগুলি অবসর মত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল ও তাঁহার অসদ্ব্যবহারের জন্য জগৎ শেঠ এবং হাজী আহ্‌মদও তাঁহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করিয়া, নওয়াবের স্থলে সুযোগ্য আলিওয়ার্দ্দী খানকে বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবার জন্য দিল্লীর দরবারে প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। হাজী ও জগৎ শেঠ, এই সুযোগে সর্‌-আফ্‌রাজ কর্ত্তৃক নাদের শাহের নামে মুদ্রা প্রচলন ও মস্‌জেদে খোৎবা পাঠের বিষয় উল্লেখ করিতেও ভুলেন নাই।

অমার্জ্জিত বুদ্ধি নওয়াব এই সময় তাঁহার উক্ত শত্রুদ্বয়ের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া, স্বীয় সেনাদলের মধ্য হইতে কিয়দংশ লোককে অনাবশ্যক বিবেচনায় কর্ম্মচ্যুত করিলেন। উহারা সকলেই পাটনায় গিয়া সুবাদার আলিওয়ার্দ্দী খানের সেনার তালিকায় নাম লিখাইল।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ, পররাষ্ট্র-সচিব এসহাক্‌ খানের যুক্তি মতে, আলিওয়ার্দ্দী খানকে বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া সনন্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আলিওয়ার্দ্দী স্বীয় জামাতা জয়েন্‌ আবদীনকে তাঁহার অনুপস্থিতি কালের জন্য, পাটনায় তাঁহার নায়েব নিযুক্ত করিয়া, সসৈন্যে মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন (১১৫২ হিঃ জিল্‌কদ)। এইরূপে তেলিয়াগড়ি ও সিক্‌রি গলির পথ অধিকার করিয়া আলিওয়ার্দ্দী খান, তদীয় ভ্রাতা হাজী আহ্‌মদকে সপরিবারে তাঁহার নিকট আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন।

পত্র নওয়াবের হস্তে পড়ায় তিনি, হাজীর উপর সন্দিহান হইয়া হাজী আহ্‌মদকে ডাকিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে, হাজীকে প্রাণদণ্ডের ভয় প্রদর্শন করিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি হাজী আহ্‌মদ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতার আশ্রয় লইয়া, এই গুরুতর বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শনে উত্তর দিলেন যে,—

২৩

"এই পত্রে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলিওয়ার্দ্দীর কোনই কুঅভিসন্ধি প্রকাশ পাইতেছে না। যদ্যপি নওয়াব তাঁহাকে অনুমতি দেন, তাহা হইলে হাজী স্বয়ং গিয়া আলিওয়ার্দ্দী খানকে পাটনায় পাঠাইবার বিধিমত চেষ্টা করিতে পারে।"

হাজী আহমদের এই প্রস্তাবে সভায় মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। শেষে হাজীকে তাঁহার ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করাই নওয়াব সর-আফরাজ খান প্রশস্ত বিবেচনা করিলেন।

রাজমহলে হাজী আহ্মদ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলেন; এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞা মত তিনি কনিষ্ঠ আলিওয়ার্দ্দী খানকে পাটনার দিকে কিয়দ্দূর যাইতে উপদেশ দিলেন।

এদিকে নওয়াব সন্দেহ পরবশ হইয়া অধিনস্থ ফৌজদারগণকে ডাকাইয়া, তাহাদের সহিত সসৈন্যে মুরশিদাবাদের ২২ মাইল উত্তরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অশ্বারোহী ও পদাতিক লইয়া ত্রিংশ সহস্র হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন যথেষ্ট কামানও ছিল। এই সময় নওয়াবের গোলন্দাজ সেনার নেতা হাজী আহ্মদের জনৈক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় সাহ্রিয়ার থাকায়, নওয়াব সর-আফরাজ খানের তাহার উপরও সন্দেহ হইয়াছিল। সুবাদার, সাহ্রিয়ারকে পদচ্যুত করিয়া পঙ্কু নামক একজন ভারতবাসী পর্ত্তুগীজকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন।

১১৫৩ হিজরীর ২২ মোহাররম তারিখে বঙ্গেশ্বর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া অবতীর্ণ হইলেন। নওয়াব তথা হইতে দুইজন দূত প্রেরণে আলিওয়ার্দ্দী খানের অভিলাষ জানিতে পাঠাইলেন। উত্তরে দূতসহ আলিওয়ার্দ্দী খানের লোক মোহাম্মদ আলি আসিয়া অবগত করাইল যে—

"নওয়াবের দরবার হইতে আলিওয়ার্দ্দীনের কয়েকজন শত্রুকে সরাইয়া দিলে, তিনি স্বয়ং নওয়াবের সমীপে উপস্থিত হইবেন।"

এইরূপ সন্ধির প্রস্তাব চলিতে থাকা কালে সন্ধ্যার সময় আলিওয়র্দ্দী খান, তাঁহার সেনাদলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, বঙ্গেশ্বরের সৈন্যগণকে তিন দিক হইতে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত করিলেন। ভোর রাত্রে আলিওয়ার্দ্দীর কামানের গোলা নওয়াবের শিবিরে পতিত হইয়া সর্-আফরাজ খানের নিদ্রাভঙ্গ করিল। নওয়াব উঠিয়া হস্তী আরোহণে তখন স্বীয় সেনাগণকে অহ্বান করিয়া, আলিওয়ার্দ্দী খানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময় একটি বন্দুকের গুলি ললাট দেশে লাগিয়া, নওয়াব আলা-আ-দ্দৌলা সর-আফ্‌রাজ খানের ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল।

হস্তীচালক নওয়াবের মৃতদেহ বহন করিয়া, নওয়াব-পুত্র মির্জ্জা আমানির নিকট আনিয়া দিল। সেই রাত্রেই নওয়াবের দেহ নোক্তাখানিতে সমাধিস্থ হইল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ

নওয়াব সুজা-উল্-মুল্‌ক হেশামদ্দৌলা মোহাম্মদ আলিওয়ার্দ্দী খান বাহাদুর মোহাব্বৎ জঙ্গ

মির্জ্জা আমানি ও ফৌজদার ইয়াসিন্ খান উভয়ে নগর রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া, শেষে অকৃতকার্য্য হইয়া, বিজেতার শরণাগত হইলেন।

যুদ্ধ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধি আলিওয়ার্দ্দী খান, লুণ্ঠন ভয়ে সসৈন্যে নগর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, রণজয়ী সেনাগণের অস্বাভাবিক উৎসাহ ও লুণ্ঠন পিপাসা কিয়ৎপরিমাণে দমিত হইবার আশায়, দুই দিবস রণক্ষেত্রে অবস্থানের পর হিঃ ১১৫৩ সালের ১৫ সফর তারিখে (১৭৪০ খৃঃ) জাঁক-জমকের সহিত নগরে প্রবেশ করিলেন।

আলিওয়ার্দ্দী সর্ব্বপ্রথমে নওয়াব মুরশিদ কুলি খানের দুহিতা দুর্ভাগা সর্‌-আফরাজ-মাতা জেন্নাতুন্নেছা বেগমের ভবনে উপস্থিত হইয়া, একজন খোজা দ্বারা মিনতি সহকারে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

আলিওয়ার্দ্দী খান এই সময়ে মৃত নওয়াবের মাতার নিকট যেরূপ নম্রতার সহিত, তাঁহার সকল অপরাধ স্বীকার করিয়া গুরুতর অপরাধীর ন্যায়, তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন, ততদূর বিনীত হইবার উদাহরণ রণ-বিজয়ী বীরের নিকট হইতে পাওয়া দূরের কথা, অনুগত ও পদানত ভৃত্যও নিজ দোষ স্খালনের জন্য, প্রভুর প্রতি প্রদর্শন করিতে পারে কিনা সন্দেহ।

গর্ব্বিতা মুরশিদ-দুহিতা আলিওয়ার্দ্দীর এই প্রার্থনার কোনই উত্তর

দিলেন না। আলিওয়ার্দ্দী তখন অনন্যোপায় হইয়া তথা হইতে হস্তী আরোহণে, নওয়াব সুজাউদ্দীনের প্রস্তুত চেহেল্-সতুন প্রাসাদে গিয়া, বঙ্গের মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। এই সময় ভাগীরথী তীরস্থ দুর্গ প্রাকার হইতে কামান গর্জ্জনে এবং তৎসহ উচ্চনাদে রণবাদ্য বাজিয়া, নব নওয়াবের অভিষেকবার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল।

এইরূপে দুর্ভাগা সর্-আফরাজ খানের পিতা ও মাতামহ-সঞ্চিত রাশিকৃত ধনরত্ন সম্বলিত ধনাগার হস্তগত করিয়া আলিওয়ার্দ্দী খান, দিল্লীশ্বর মোহাম্মদ শাহের নিকট এক ক্রোর টাকা নগদ এবং তৎসহ ৭০ লক্ষ টাকার রত্ন ও নানাপ্রকার বঙ্গদেশজাত রেশমী বস্ত্র ও মসলিন আদি প্রেরণ করিলেন। সম্রাট তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে সুজা-উল্-মুল্ক হেশাম্-দ্দৌলা উপাধিতে ভূষিত করিয়া, বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার নওয়াব সাব্যস্ত করিয়া লইলেন। দিল্লীশ্বর এই সঙ্গে নওয়াবের জ্যেষ্ঠ জামাতা নওয়াজেশ মোহাম্মদকে শেহামৎ জঙ্গ, মধ্যম সৈয়দ আহ্মদকে সওলাত-জঙ্গ ও কনিষ্ঠ জায়েনউদ্দীনকে শওকাত জঙ্গ (যুদ্ধে অজেয়) উপাধি দান করিয়াছিলেন।

অতঃপর বাদশাহের নিকট হইতে নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খান, তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র, নওয়াবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র, মির্জ্জা মাহ্মুদের জন্য "সেরাজ-দ্দৌলা সাহ্-কুলি-খান বাহাদুর" উপাধি আনয়ন করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত মর্য্যাদার উপযুক্ত পদোন্নতি আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নওয়াব, তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা নওয়াজেশ মোহাম্মদকে, ঢাকার সহিত শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলাত্রয় মিলিত করিয়া, এই যুক্ত-রাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। মধ্যম সৈয়দ আহমদের জন্য উড়িষ্যা বিভাগের শাসনকর্ত্তৃত্ব দিতে স্বীকৃত হইয়া রহিলেন।

সর্-আফরাজের স্ত্রী ও দুই পুত্রের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া,

তাঁহাদিগকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন। মৃত নওয়াবের বিধবা ভগ্নী নফিসা বেগম, সর্‌-আফরাজের মৃত্যুর পর ভূমিষ্ঠ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আকা বাবাকে লইয়া নওয়াজেশ্‌ মোহাম্মদের সংসারে থাকিতে স্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহাকে ঐ অল্পবয়স্ক কুমারসহ ঢাকায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খান, সুজাউদ্দীন-জামাতা মোরশেদ কুলিকে উড়িষ্যা হইতে সরাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। মোরশেদ কুলি এই অবস্থা অবগত হইয়া, দূত প্রেরণে নওয়াবের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু নওয়াব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতার সহিত মোরশেদ কুলি খানকে উড়িষ্যার মসনদ পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে রাজধানী মুরশিদাবাদে চলিয়া আসিতে অনুমতি করিলেন।

নওয়াবের পত্র পাইয়া উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী দওরদানা বেগম এবং তাঁহার সভাসদগণ কোন মতে সম্মত না হইয়া, মোরশেদ কুলি খাঁনের দ্বারা বঙ্গেশ্বরের নামে একখানি দাম্ভিকতাপূর্ণ পত্র লেখাইলেন। অতঃপর নওয়াবের সহিত যুদ্ধই স্থিরীকৃত হইল।

এই যুদ্ধাহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে নওয়াব, তদীয় ভ্রাতা হাজী আহমদের উপর বঙ্গ সিংহাসনের ভারার্পণ করিয়া, দ্বাদশ সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সেনা সহ স্বয়ং উড়িষ্যা বিজয়ে বাহির হইলেন।

নওয়াবের আগমন সংবাদে মোরশেদ কুলি, তাঁহার পরিবারবর্গকে যাবতীয় ধনরত্ন সহ বারাবুট্টি দুর্গে (এই দুর্গ পরে ইংরাজ সৈন্য ১৮০৩ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে অধিকার করে) পাঠাইয়া দিয়া, সমস্ত সেনাগণের সহিত কটক পরিত্যাগে ক্রমে বালেশ্বর পার হইলেন। তৎপরে

পশ্চাতে নিবিড় অরণ্যসঙ্কুল নদীসৈকত রক্ষা করিয়া, একটী উৎকৃষ্ট উচ্চ স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন; এবং বস্ত্রাবাসের সম্মুখে প্রায় তিন সহস্র কামান রক্ষা করিলেন।

আলিওয়ার্দ্দী খান দ্রুতগতিতে নদীকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও বিপক্ষ শিবির হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় উড়িষ্যা বিভাগের জমিদারগণ সুবাদার মোরশেদ কুলি খানের বাধ্য থাকায়, নওয়াব-সেনাগণের জন্য রসদ সংগ্রহে বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। এই স্থানে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের জন্য বঙ্গেশ্বরকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। ক্রমে যখন এই অবস্থা সুবাদারের সেনাগণ অবগত হইতে পারিল; তখন তাঁহার সেনাপতি মির্জ্জা বাকের খান, উৎকলপতির আদেশ প্রাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া সসৈন্যে নওয়াবের শিবির আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলিবার পর, শেষে বিজয়লক্ষ্মী বঙ্গেশ্বরের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন।

মোরশেদ কুলি খান ও তাঁহার জামাতা দলবল সহ বালেশ্বরের দিকে সরিয়া পড়িছেন, এবং তথা হইতে অর্ণবপোতারোহণে করমণ্ডল উপকূলে মছলিপাটামে গিয়া তথাকার ফৌজদার আনওয়ারউদ্দীন খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে রাঁয়স্তেনপুরের রাজা কটকে সৈন্য প্রেরণ করিয়া, উৎকলেশ্বরের পরিবারবর্গকে নিজ আশ্রয়ে লইয়া মহানুভবতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে বাকের খান, দুর্ভাগা সুবাদারের পরিবারবর্গকে লইয়া, তাঁহাদিগকে মোরশেদ কুলি খানের নিকট মছলিপাটামে পৌঁছাইয়া দিলেন।

আলিওয়ার্দ্দী খান, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সৈয়দ আহ্‌মদকে কটকের সিংহাসনে বসাইলেন। তৎপরে মুরশিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া

বাঙ্গালার উন্নতিকল্পে, সভাসদগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সৈয়দ আহ্‌মদ আদৌ শাসনকর্ত্তার উপযুক্ত লোক ছিলেন না। তিনি অতিশয় আমোদপ্রিয় ছিলেন, এবং সর্ব্বক্ষণ স্ত্রীলোক লইয়া আমোদ-আহ্লাদে রাজ-অন্তঃপুরে কালাতিপাত করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার শ্বশুর প্রদত্ত সেনাগণের সুখ-সমৃদ্ধি ও তাহাদের নিয়মিত বেতন প্রদানের দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি না থাকায়, তাহারা ক্রমশঃ তাঁহার যুদ্ধ বিভাগের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল উৎকৃষ্ট সেনার স্থান তিনি অল্প বেতনে সন্তুষ্ট সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য বিশ্বাসঘাতক উৎকলবাসীদের দ্বারা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। পরে ইহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ হইল।

সৈয়দ আহ্‌মদের আচরণ ক্রমে সর্ব্ববিষয়ে অতিরিক্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠায়, প্রজাবর্গ পুরাতন শাসনকর্ত্তা মোরশেদ কুলি খানকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তিনি কটকের সিংহাসনে পুনরারূঢ় হইয়া, প্রবল পরাক্রান্ত বঙ্গেশ্বরের সহিত বিবাদ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। শেষে সকলে বাকের খানের নিকট গিয়া উপস্থিত হওয়ায়, উক্ত সেনাপতি মির্জ্জা বাকের, আনন্দের সহিত তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, সসৈন্যে কটকে আসিয়া পৌঁছিলেন ও অল্পকাল মধ্যে শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আহ্‌মদকে তাঁহার প্রসাদ মধ্যে বন্দি করিয়া, কটকের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

এই সংবাদ শুনিয়া বঙ্গেশ্বরের ভ্রাতা হাজী আহ্‌মদ ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্রের জীবনের আশঙ্কা করিয়া, নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খানকে মির্জ্জা বাকেরের সহিত সন্ধি করিয়া, পুত্র সৈয়দ আহ্‌মদকে উদ্ধার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই সঙ্গে হাজী আহ্‌মদ নওয়াবকে ইহাও বুঝাইবার

চেষ্টা করিলেন যে,—এই ব্যাপারের ভিতর দাক্ষিণাত্যের পরাক্রান্ত হায়দ্রাবাদের নেজাম বাহাদুরও আছেন; এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে, বঙ্গের সিংহাসন পর্য্যন্ত টলিবার সম্ভাবনা।

বীর শার্দ্দুল আলিওয়ার্দ্দী খান ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার উপদেশ বা অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি অচিরে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক জামাতা নওয়াজেশ্‌কে মুরশিদাবাদের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা সহ কটকের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আলিওয়ার্দ্দী খান তাঁহার সেনাগণের উৎসাহ বর্দ্ধনকল্পে এই বিষয় প্রচার করিয়া দিলেন যে—তাঁহার জামাতা সৈয়দ আহ্‌মদকে যে ব্যক্তি অবরুদ্ধাবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিবে, তিনি তাহাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন; এবং কোন সেনানী তাহার সেনা সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন করিলে, তিনি তাঁহার অধীনস্থ প্রত্যেক সেনাকে দুই মাসের বেতন উপহার দিবেন।

বাকের খান, বঙ্গেশ্বরের আগমন সংবাদ পাইয়া, মহানদীর কূলে শিবির সংস্থাপন করিলেন। তিনি এই যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া, স্বীয় পরিবারবর্গকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এবং সেই সঙ্গে রুদ্ধ গাড়ীতে অবরুদ্ধ করিয়া দুইজন মোগল সেনার তত্ত্বাবধানে সৈয়দ আহ্‌মদকেও পাঠাইয়াছিলেন। রক্ষিদ্বয় সৈয়দের সহিত ঐ অবরুদ্ধ গাড়ীর মধ্যেই অবস্থান করিতে থাকিল।

বাকের খান রুদ্ধের প্রহরীগণের প্রতি গোপনে আদেশ দিয়াছিলেন যে—শত্রুর আগমন যদ্যপি ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া আইসে, তখন তাহারা বাহির হইতে সঙ্গীনের খোঁচায় সৈয়দ আহ্‌মদকে বধ করিবে; তাহাতে রুদ্ধ মধ্যস্থ রক্ষিদ্বয়ের প্রাণের হানির দিকে তাহারা যেন ভ্রূপেক্ষও না করে।

নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খান, বাকের খানের পরিখা মধ্যে প্রবেশ করিলে, দুর্ব্বল মির্জ্জা বাকের, সমস্ত ফেলিয়া পলায়ন করিল। বিজয়ী সেনাগণ এত দ্রুত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল যে, অত্যল্প কাল মধ্যে তাহারা সৈয়দ আহ্‌মদের গাড়ীর নিকট গিয়া পৌঁছিল। এই অবস্থা দর্শনে রুস্তের অনুগামী সৈন্যগণ, এক সঙ্গে বহু সঙ্গীন সৈয়দ বধার্থে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন মোগল প্রহরী হত হইয়া সৈয়দের গাত্রের উপর চাপিয়া পড়ায়, তিনি সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইলেন। অপর প্রহরী আহত অবস্থায় কোন মতে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। দেখিতে দেখিতে নওয়াবের সেনাগণ আসিয়া পড়িয়া সৈয়দ আহ্‌মদকে উদ্ধার করিল।

আলিওয়ার্দ্দী খান তাঁহার জামাতাকে পাইয়া খোদাতাআলাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন ও জামাতাকে সত্বর তাঁহার পিতা মাতার নিকট মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন।

নওয়াব তৎপরে পুনঃপ্রাপ্ত রাজ্যাংশের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, জনৈক বহু-জ্ঞানলব্ধ কর্ম্মচারী মোহাম্মদ মাসুম্ খানকে উৎকল দেশের সিংহাসনে বসাইয়া, তথায় মাত্র পাঁচ সহস্র সেনা রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট সৈন্য বিদায় দিলেন। তৎপরে কিয়দ্দিবস কটকে অবস্থান করার পর নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খান, পথে শিকারের আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের সন্নিকটে বস্ত্রাবাসে অবস্থান করিতে থাকা কালে নওয়াব সংবাদ পাইলেন যে—

মোগল শাসনের দুর্ব্বলতা দর্শনে, হায়দ্রাবাদের নেজাম কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া, বেরারের রাজা রঘুজী ভোঁসলা, তাঁহার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে বাঙ্গালার রাজস্বের চৌথ আদায় করিবার চেষ্টায় প্রেরণ করেন। ভাস্কর

পণ্ডিত সদলবলে দ্রুত গতিতে তাঁহার রাজত্বের দিকে অগ্রসর হন। এই সময় নওয়াব যখন গুপ্তচর মুখে সঠিক সংবাদ পাইলেন যে—ভাস্কর বেহারের দিক হইতে আগমন করিতেছে, তখন তাঁহার ততদূর উৎকণ্ঠার কারণ রহিল না।

কিন্তু হঠাৎ শত্রুগণ আলিওয়ার্দ্দী খানের শিবিরের মাত্র ২০ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সংবাদ পাইয়া নওয়াব, বর্দ্ধমানে আসিয়া মারহাট্টাগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই মহারাষ্ট্র দেশীয় সেনাগণ দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয় নাই। ইহাদিগকে চলিত কথায় বর্গী বলিত : এবং লুণ্ঠনই এই বর্গীদিগের উদ্দেশ্য ও ব্যবসায় ছিল।

নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খান উড়িষ্যা পুনঃ বিজয়ের পর, মাত্র পাঁচ সহস্র সেনা নিজের সঙ্গে রাখিয়া, অবশিষ্ট রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই সুযোগে ভাস্কর রাও, তাঁহার এই অল্প সংখ্যক সেনাগণকে ঘেরিয়া ফেলিয়া নওয়াবের এরূপ দুর্দ্দশা করিল যে—শেষে নওয়াব, এই মারহাট্টা দস্যুগণকে দশ সহস্র মুদ্রা দানে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাস্কর সুযোগ বুঝিয়া এক ক্রোর টাকা চাহিয়া বসিল ও নওয়াব শিবিরের চতুর্দ্দিকের গ্রামসমূহ অগ্নিদগ্ধ করিতে লাগিল।

আলিওয়ার্দ্দী খান ভাস্করের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া, তাঁহার এই সামান্য সেনাসহ কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিশাল মারহাট্টা বাহিনী সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে নওয়াবকে উত্যক্ত করিতে লাগিল মাত্র ; কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে এই মারহাট্টা দস্যুগণ কস্মিন্‌কালে অভ্যস্ত না থাকায়, এত অধিক সেনা লইয়াও ভাস্কর, এই অত্যল্প সংখ্যক মোস্‌লেম সেনাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না।

শেষে চতুর্থ দিবসে নওয়াব কাটোয়ায় পৌছিলেন। বর্গী দস্যুগণ ইতিপূর্ব্বেই অগ্নিসংযোগে কাটোয়া নগর ধ্বংস করিয়াছিল। তাহারা কাটোয়ার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধান্য ও চাউলের গোলা অগ্নিদগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। কাটোয়ায় পৌঁছিয়া নওয়াব, ভাগীরথী তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। নওয়াবের আগমন সংবাদ পাইয়া, নওয়াজেস্ মোহাম্মদ ভাগীরথীর পর পার হইতে অনেক সৈন্য ও রসদ লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

এই অবস্থা দর্শনে ভাস্কর, বেরারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এমন সময় উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার সেনাপতি মীর হবিব্, ভাস্কর রাওয়ের সহিত সসৈন্যে মিলিত হইয়া, তাহাকে নওয়াবের রাজধানী মুরশিদাবাদ লুণ্ঠন করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল।

মীর হবিব্ ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে, নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খানের মুরশিদাবাদে পৌছিবার পূর্ব্ব দিনেই, রাজধানীর প্রান্তদেশে, তাহার অধীনস্থ মারহাট্টা সেনার দ্বারা লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। মীর হবিবের অধিনস্থ মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ, এই সময় প্রসিদ্ধ ধনী জগৎ শেঠের ধনাগার লুণ্ঠন দ্বারা তিন লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করিল।

নওয়াবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হবিব্ সরিয়া পড়িল। নওয়াব নগর রক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করাইতে ও পুরাতন নগর প্রাকার সুদৃঢ় করাইতে লাগিলেন। এই সময় শত্রু পক্ষ সুযোগ বুঝিয়া, সময় সময় কাটোয়া হইতে ভাগীরথী পার হইয়া আসিয়া, পালাশী, দাউদপুর প্রভৃতি গ্রাম সকল লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

বর্ষাকালে ভাস্কর পণ্ডিত, মীর হবিবের সাহায্যে, হুগলী, হিজলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, রাজমহল এবং মেদিনীপুর ও বালেশ্বর পর্য্যন্ত জেলা সমূহে

লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া দিল। এই সময় ভাগীরথীর দক্ষিণ পার্শ্বের লোকের দুরবস্থার অবধি ছিল না। ইংরাজেরা নওয়াবের অনুমতি লইয়া, কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে যে প্রশস্ত গড় কাটাইয়াছিলেন, তাহার নাম মারহাট্টা ডিচ্ বলিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত লোকের মনে ভীতি উৎপাদন করিত। অদ্যাবধি তাহার চিহ্ন স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হয় নাই।

ভাগীরথীর পশ্চিম-দক্ষিণ পার হইতে দলে দলে লোক ঐ সময় কলিকাতায় গিয়া, ইংরাজ কোম্পানীর নিকট পরিখা বেষ্টিত স্থানের মধ্যে আশ্রয় লইতে লাগিল।

নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খান বর্ষার শেষ হইতে না হইতে অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে স্বীয় সেনাপতি মীর জাফর খান ও মোস্তফা খানকে লইয়া, নৌসেতু সাহায্যে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, কাটোয়ায় ভাস্করের অধীনস্থ মারহাট্টা সেনাগণকে আক্রমণ করিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে অনভিজ্ঞ তস্কর প্রকৃতির ভাস্কর রাও, এই উগ্রমূর্ত্তি সুশিক্ষিত মোগল সেনাগণের আগমনের সাড়া পাইয়া, সেনাগণের বস্ত্রাগার ও তৎসহ তাহার নিজ ও সেনাগণের যাবতীয় আবশ্যকীয় দ্রব্য ফেলিয়া পলায়ন করিল। নওয়াবের কতকগুলি সেনা ভাস্কর রাওয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিল। এই সময় মীর হবিবের পরামর্শে ভাস্কর, বিষ্ণুপুরের অরণ্য মধ্যে আত্মগোপন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

অতঃপর গোপনে থাকিয়া ভাস্কর, স্বীয় ছত্রভঙ্গ সেনাগণকে মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার নিকট পুনঃ সংগ্রহ করিয়া, কটকের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার কালে, তথাকার শাসনকর্ত্তা মাসুম খান, তাঁহার অত্যল্প সংখ্যক সেনা লইয়া, অমিততেজে এই মারহাট্টা বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন ও তাহাদিগকে প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলিবার সময়ে, দৈব-নির্ব্বন্ধ বশতঃ স্বয়ং নিহত হইলেন।

বঙ্গেশ্বর এই সংবাদ পাইয়া, পুনরায় মেদিনীপুরের অভ্যন্তর দিয়া আসিয়া ভাস্কর রাওকে আক্রমণ করিলেন ও তাহার বিস্তর সৈন্য ধ্বংস করিলেন। ভাস্কর পূর্ণ বেগে নিজের দেশের দিকে পলায়ন করিল। অনন্তর আলিওয়ার্দ্দী খান আব্‌দুর রসুল খানকে কটকের সিংহাসনে বসাইয়া, বিজয়ী সৈন্যগণ সহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পর বৎসর ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁস্‌লা নূতন সেনাবলে বলীয়ান্‌ হইয়া, বাঙ্গলায় প্রবেশ করিলেন। অপর দিকে পুনা হইতে বালাজী রাও, অধীনস্থ মারহাট্টা সেনা লইয়া, সম্রাটের তরফ হইয়া, আলিওয়ার্দ্দী খানকে বেরারের মহারাষ্ট্রীয়গণের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবার ভাণে, বেহারের মধ্য দিয়া আসিয়া ভাগীরথীর তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রঘুজী ভোঁস্‌লা বীরভূম ঘুরিয়া আসিয়া, বর্দ্ধমানের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন।

নওয়াব, বালাজী রাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরে উভয় সেনাসহ একযোগে রঘুজীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন এইরূপ মনস্থ করিলেন। কিন্তু বালাজী রাও নওয়াবের অপেক্ষা না করিয়া, নিজ সেনা লইয়া বেরার সেনাগণকে আক্রমণ করায়, বেরার রাজা রঘুজী তাঁহার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের পথ প্রদর্শনে, সটান সেনাসহ স্বরাজ্যাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিলেন। এই সময় এই উভয় দলের মহারাষ্ট্রীয় দস্যু সেনাগণের উপদ্রবে বাঙ্গালার শান্তিপ্রিয় প্রজাবর্গকে বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িতে হইয়াছিল!

পর বৎসর ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রঘুজী ভোঁস্‌লা, সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে বেরার হইতে বিংশতি সহস্র মারহাট্টা অশ্বারোহী সহ বাঙ্গালা জয়ে প্রেরণ করিলেন। নওয়াব এই মারহাট্টা দলপতির পুনরাগমনের সংবাদ পাইয়া, রাজধানী হইতে দশ মাইল দূরে গোন্‌কিয়া নামক

স্থানে সৈন্য সহ অবস্থান করিতে লাগিলেন। নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খাঁন এইবার এই মহারাষ্ট্রীয় তস্করগণের উপর এতদূর রাগিয়া গিয়াছিলেন যে—তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহমদ্ ও জাফর খান এবং ফকির উল্লা বেগ দ্বারা, অন্যায় যুদ্ধে ভাস্কর পণ্ডিত ও তাহার সহচর উনবিংশতি জন সর্দ্দারকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

শেষে ভাগীরথী পার হইয়া মোস্লেম সৈন্যগণ, সেনাপতি রঘুজী গায়কোয়ারের অধীনস্থ বেরারে, মারহাট্টা অশ্বারোহীগণকে কাটোয়ার নিকট আক্রমণ করিল। গায়কোয়ার, প্রধান সেনাপতির মৃত্যু সংবাদে ভগ্ন হৃদয় হইয়া, নওয়াবের সেনাগণের ভাবি আক্রমণের ভয়ে, এই সময় হইতে ডেরাডাণ্ডা তুলিয়া পলাইবার উৎ-যোগ করিতেছিলেন। হঠাৎ দূর হইতে মোস্লেম সেনাগণের দর্শন পাইয়া মারহাট্টাগণ ভয়ে সমস্ত রণ-সম্ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

এই সময় নওয়াবের ভ্রাতা হাজী আহমদ্, স্থানীয় ফৌজদারের পদপ্রার্থী হইয়া উহা না পাওয়ায়, আলিওয়ার্দ্দী খানের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া পাটনায় চলিয়া গেলেন। হাজী আহমদের পুত্র সৈয়দ আহ্মদ, কটক হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া আসা পর্য্যন্ত হুগলীর ফৌজদারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্বীয় আবাস স্থান সুরক্ষিত করিবার জন্য, ভাগীরথী তীরে আনুমানিক যে একশত একর জমি, গভীর বিস্তৃত পরিখা বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; উক্ত সুপ্রশস্ত গড়ের চিহ্ন অদ্যাবধি হুগলী জেলখানার উত্তরে ও পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে দৃষ্ট হয়; এবং গড়ের পর যে ইষ্টক নির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল, তাহা ভগ্নাবস্থায় এখনও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে।

নওয়াব বৈদেশিক শত্রু নিপাত ও বিতাড়িত করিয়া, এক্ষণে বর্গিগণ কৃত গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বস্থিত উচ্ছিন্ন ভূভাগগুলির উদ্ধারের চেষ্টায়

মননিবেশ করিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার নিজ রাজত্ব মধ্যে এক প্রবল ঝঞ্ঝানিলের অভ্যুত্থান হইয়া, তাঁহার এই সদভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিল।

নওয়াবের প্রধান সেনাপতি মোস্তফা খান, দুর্দ্ধর্ষ বর্গীসর্দ্দার ভাস্কর হত্যার একজন প্রধান সহায় ছিল; এবং এই দুঃসাহসিক কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়ায়, নওয়াব সেই সময় মোস্তফা খানকে, তাঁহার অধীনে বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সেই সময় বেহার প্রদেশ, তাঁহার জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র জয়েন-আবদীনের হস্তে ছিল।

সেনাপতি মোস্তফা, প্রভুত্বব্যঞ্জক ভাব প্রদর্শনে বঙ্গেশ্বরের নিকট তাঁহার অঙ্গীকৃত সুবাদারের পদ প্রার্থী হওয়ায় নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খান, অধীনস্থ সেনাপতির ব্যবহারে স্বীয় মর্য্যাদার লাঘব হইল বিবেচনা করিয়া, দৃঢ়তার সহিত তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। এই হইতেই উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ও শত্রুতার সুত্রপাত হইল।

শেষে সেনাপতি মোস্তফা, নওয়াবের চাকুরি এস্তেফা দিবার, আবেদন করিয়া, তৎসহ নওয়াবের সরকার হইতে, তাঁহার নিজের ও অধীনস্থ সেনাগণের প্রাপ্য বেতন ১৭ সত্তর লক্ষ টাকার এক ফর্দ্দ দাখিল করিলেন। বঙ্গেশ্বর আলিওয়ার্দ্দী খান কাল বিলম্ব না করিয়া সেনাপতির দাবিকৃত সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়া, মোস্তফা খানকে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজত্ব পরিত্যাগ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

মোস্তফা খান আট সহস্র অশ্বারোহী ও বহু পদাতিক সেনা সঙ্গে লইয়া বেহারের দিকে যাত্রা করিল। নওয়াব স্বীয় জামাতা জয়েন-আবদীনকে বিদ্রোহী মোস্তফার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। অচিরে বঙ্গেশ্বর তাঁহার অপর ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেসকে মুরশিদাবাদে রাখিয়া, স্বয়ং সেনাপতি সরদার খান, রহিম খান ও শমশের খান সমভিব্যাহারে বেহারের রাজধানী পাটনা অভিমুখে গমন করিলেন।

মোস্তফা রাজমহল ও মুঙ্গের হইয়া, সহজে পাটনা অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পাটনার শাসনকর্ত্তা জয়েন-আবদীন এই সংবাদ পাইয়া মোস্তফা খানকে এই মর্ম্মে, একখানি পত্র লিখিলেন—

"যদ্যপি সেনাপতি সিংহাসন অধিকার করিতে আসিয়া থাকেন. তাহা হইলে নওয়াবের বা দিল্লীশ্বরের সনন্দ প্রদর্শন করুন। আর যদি বেনারস বা অযোধ্যার দিকে যাওয়া তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তিনি রাজধানির মধ্যবর্ত্তী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ভিন্ন অপর পথ দিয়া বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে পারেন।"

দাম্ভিক বিদ্রোহী মোস্তফা, পত্র পাইয়া রূঢ়স্বরে উত্তর দিল যে—"বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা। সনন্দের কোনই আবশ্যকতা নাই। এবং প্রশ্নকর্ত্তার খুল্লতাত আলিওয়ার্দ্দী খান, কোন সনন্দবলে নওয়াব সর্‌ফ্‌রাজ খানকে বধ করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া ছিলেন?"

জয়েন-আবদীনের অশ্বারোহী সেনা সংখ্যায় পাঁচ সহস্রের অধিক না থাকা সত্ত্বেও, তিনি এই প্রগল্‌ভ প্রত্যুত্তরে ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। ইতি মধ্যে শত্রু সেনা দ্রুতগতিতে আসিয়া তাঁহার শিবির আক্রমণ করিল। হঠাৎ এই আক্রমণে জয়েন-আবদীনের দেহরক্ষী সেনা মাত্র পাঁচ ছয় শত ব্যতীত, তাঁহার অপর সমুদয় সৈন্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

মোস্তফা খান এই অত্যল্প সংখ্যক সেনাগণকে, তাহার বাহিনী লইয়া ভীষণ বেগে আক্রমণ করিলেন। এই সময় জয়েন-আবদীনের দেহরক্ষী সেনা-নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলিতে মোস্তফার হস্তীর মাহুত নিহত হওয়ায় ও তৎসঙ্গে তাহার অধীনস্থ দুইজন পদস্থ সেনানী সাঙ্ঘাতিক আহত হওয়ায়, সেনাপতি হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন

এদিকে তাঁহার সেনাগণ হাওদা শূন্য দেখিয়া সেনাপতির মৃত্যু কল্পনা করিয়া, ভয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল ও ক্রমে সকলেই বস্ত্রাবাসের দিকে পলাইতে লাগিল।

সুবাদার জয়েন-আবদীন, তাঁহার সামান্য সেনা লইয়া শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা অযৌক্তিক বিবেচনায়, স্বীয় সরহদ্দের বাহিরে গেলেন না। এদিকে সুবাদারের পলায়িত সেনাগণ শত্রু সৈন্যের অবস্থা দর্শনে, ক্রমে পুরাতন মুনিবের পতাকাধীনে সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। অতঃপর সাতদিন ধরিয়া দূর হইতে কামানের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অষ্টম দিনে সেনাপতি মোস্তফা খান, বেহার রাজকে পূর্ণ উৎসাহে পুনরায় আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এই দিন যুদ্ধের প্রারম্ভেই মোস্তফার একটী চক্ষে তীর বিদ্ধ হওয়ায়, তিনি পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন।

এই সময় বঙ্গেশ্বর আলিওয়ার্দ্দী খান, সসৈন্যে গিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত মিলিত হইলেন। তৎপরে উভয় সেনা একত্রে মিলিয়া মোস্তফা খানকে আক্রমণ করায় মোস্তফা পলাইয়া গিয়া, অযোধ্যার নওয়াব সফ্‌দার জঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময় অযোধ্যাধিপতি, সেনাপতি মোস্তফা খানকে, তাঁহার অধিকৃত সুরক্ষিত চুনার দুর্গে স্থান দান করিয়াছিলেন।

আলিওয়ার্দ্দী খান পুনরায় সফ্‌দার জঙ্গের কোপানল প্রজ্জ্বলিত করিবার ভয়ে, আর বিদ্রোহীর পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পাটনায় পৌঁছিবার পর নওয়াব সংবাদ পাইলেন যে—মারহাট্টা রঘুজী ভোঁসলা, মোস্তফার আশায় উৎসাহিত হইয়া, ভাস্কর পণ্ডিত ও তাহার সহকারীগণের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য, বহু সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্রুত গতিতে বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া নওয়াব কাল বিলম্ব না করিয়া পাটনা পরিত্যাগে মুরশিদা-

বাদে গিয়া পৌঁছিলেন। তথা হইতে বেরার রাজকে কালক্ষয় করাইবার উদ্দেশ্যে, আলিওয়ার্দ্দী নানা ছলের উদ্ভাবন করিয়া, তাঁহার নিকট দূত প্রেরণে তাঁহাকে দুই মাস কাল বর্দ্ধমানে অবস্থান করাইতে কৃতকার্য্য হইলেন। এই সময়ে নওয়াব সংবাদ পাইলেন যে—জগদ্দীশপুরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়েন-আবদীনের সহিত যুদ্ধে মোস্তফা খান, বন্দুকের গুলিতে নিহত হইয়াছেন।

১১৫৮ হিজরীর শীত ঋতুর প্রারম্ভে নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খান, বর্গী শত্রুগণের সহিত যুদ্ধালিঙ্গনে মিলিত হইবার জন্য আবার অগ্রসর হইলেন। রঘুজী, বঙ্গেশ্বরের আগমনে ভীত হইয়া বেহারে পলায়ন করিয়া, মৃত মোস্তফা খানের পুত্র মোর্ত্তজা খানের অধীনস্থ বিদ্রোহী সেনাগণের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টায়, তাঁহাদের অন্বেষণে বেহারের পার্ব্বত্য দেশে লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এদিকে আলিওয়ার্দ্দী খান বাঁকিপুরে আসিয়া, তথায় সসৈন্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়া শত্রুর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু এই সময় মারহাট্টাগণ আবার শোন নদী পার হইয়া মীর হবিবের অধীনস্থ পাঠানগণের সহিত মিশিয়াছে অবগত হওয়ায়, বঙ্গরাজ মোহেব্বল পুরে চলিয়া গেলেন।

এই স্থানে বিদ্রোহী পাঠান ও রঘুজীর সম্মিলিত শক্তির সহিত নওয়াবের কয়েকটী খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সকল যুদ্ধেই শত্রুপক্ষ পরাজিত হইল। শেষ যুদ্ধে বর্গী সেনাপতি ও রাজা রঘুজী ভোঁসলা, বঙ্গীয় সেনা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রায় বন্দি হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই সময় নওয়াবের বিশ্বাসঘাতক পাঠান সেনানী শমশের খান ও সর্দ্দার খান, বেরার রাজকে বাঁচাইয়া দিল।

এইবার রঘুজী, মীর হবিবের পরামর্শে দ্রুতগতিতে ফিরিয়া আসিয়া, মুরশিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু আলিওয়ার্দ্দী খান

তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাঁহাকে আর ভাগীরথী পার হইতে দিলেন না। পরে কাটোয়ার নিকট যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় গণকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া ও বিপক্ষের বহু সেনা ধ্বংস করিয়া, অবশিষ্ট সেনাগণকে মেদিনীপুর অঞ্চলে বিতাড়িত করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে—বিশ্বাসঘাতক সর্দ্দার খান ও শমশের খান নামক নওয়াবের দুইজন পাঠান সেনানীর সাহায্য ব্যতীত, মোহেব্বলপুরের যুদ্ধে রঘুজী কিছুতেই রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে কৃতকার্য্য হইতেন না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আলিওয়ার্দ্দী খান সেনানীদ্বয়ের চাতুর্য্য সেই সময়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বর্গী শত্রুগণকে বিতাড়িত না করা পর্য্যন্ত তিনি, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়া, উহাদিগকে আর যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত না রাখিয়া, ভগবান গোলা ও মুরশিদাবাদের মধ্যবর্ত্তী যে পথ দিয়া পদ্মার পূর্ব্ব-উত্তর দিকে অবস্থিত ভূভাগ হইতে রাজধানীতে খাদ্যদ্রব্য ও ফসল আমদানী হইত, সেই পথে লুণ্ঠন নিবারণার্থে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তৎপরে যখন নওয়াব দেখিলেন যে—উক্ত সেনানীদ্বয়ের অসাবধানতা বা দুরভিসন্ধিতে কয়েক বার ঐ পথে সরকারি রসদ লুণ্ঠিত হইল, তখন তিনি প্রকাশ্যে তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া, ঐ কার্য্যে ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহ্‌মদকে নিযুক্ত করিলেন। অচিরে সৈয়দ আহ্‌মদ রঘুজীর লিখিত, উক্ত পাঠান সেনানীদ্বয়ের নামের পত্র ধরিয়া ফেলিয়া নওয়াবকে দেখাইতে কৃতকার্য্য হইলেন। নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খান, তাঁহার মহান্ হৃদয়ের পরিচয় দিয়া, বিশ্বাসঘাতকদ্বয়ের প্রতি অন্য কোন কঠোরতর শাস্তির বিধান না করিয়া, তাহাদিগকে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ বাসস্থান দারভাঙ্গায় সত্বর প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে নওয়াব, মহা সমারোহের সহিত জয়েন-আবদীনের পুত্র, তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মির্জ্জা মাহ্‌মুদের বিবাহ

দিলেন। এই বিবাহে জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে রাজধানীর সমস্ত লোককে এক মাস কালাবধি সরকারি খরচায় পরিতুষ্ট করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান অন্যূন দুই সহস্র রাজকর্ম্মচারীকে নওয়াব, বহুমূল্য খেল্‌আৎ দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই বিবাহের সমারোহ, শোভাযাত্রা ও আলোকমালার জাঁকজমকের বিষয় বাঙ্গালায় লোকমুখে অনেকদিন পর্য্যন্ত শ্রুত হইত।

মারহাট্টাগণকে মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য নওয়াব, বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে ঐ অঞ্চলের সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন; এবং ঐ সঙ্গে তাহাকে হিজলী ও মেদিনীপুরের সামরিক শাসনকর্ত্তা ও ফৌজদারী পদের সনন্দ দিলেন। মীর জাফর মেদিনীপুরে গিয়া বিলাসীতায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, বসিয়া রহিল। ইত্যবসরে বেরার রাজপুত্র জানোজী ভোঁসলা, নূতন সেনা লইয়া কটকে উপস্থিত হইল। এই সময় মীর জাফর উহাদিগকে আক্রমণ করা দূরের কথা, নিজে বর্দ্ধমানে পলাইয়া আত্মগোপন করিল। শত্রুপক্ষ সেনাপতির এ হেন বীরত্ব দর্শনে, পশ্চাৎ হইতে দ্রুতবেগে আসিয়া জাফরের সেনাগণকে আক্রমণ করিয়া, তাহার অনেকগুলি হস্তী ও যুদ্ধ সম্ভার হস্তগত করিয়া লইয়াছিল।

এই অবস্থা নওয়াবের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি, অকর্ম্মণ্য সেনাপতি মীর জাফরের স্থানে জনৈক আতাউল্লাহ্‌কে পাঠাইয়া দিয়া, স্বয়ং আবশ্যক মতে তাঁহার সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আতাউল্লাহ্ বর্দ্ধমানে পৌঁছিয়া বর্গিগণকে দেখিতে পাইলেন ও সম্মুখ যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু এই সময় তাঁহার অধীনস্থ মীর আলি আসগর নামক একজন সেনানী, ভবিষ্যতের সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এইরূপ ছল করিয়া, সেনাপতির নিকট আসিয়া—তিনিই

অতঃপর বাঙ্গালার স্বাধীন নওয়াব হইবেন—বলিয়া আতাউল্লার মস্তক বিগ্‌ড়াইয়া দিল।

সেনাপতি, আলি আস্‌গরের ভবিষ্যৎ বাণীতে উৎসাহিত হইয়া, মীর-জাফরকে বেহার খণ্ড দান করিবেন প্রলোভন দেখাইয়া, তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং উপযাচক হইয়া তাহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

এই গুপ্ত সংবাদ নওয়াবের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি, সেনাপতিদ্বয়ের নিকটে আগমন করিলেন। আতাউল্লাহ্ তাহার অধীনস্থ মীর আলি আস্‌গরের জন্য, এক সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়কের পদপ্রার্থী হওয়ায়, নওয়াব অবজ্ঞার সহিত তাহার প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। তৎপরে নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী; মীর জাফরকে সেনাপতির পদ হইতে অপসারিত করিয়া, তাহাকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি করিলেন; এবং আতাউল্লার অধীনস্থ সেনা লইয়া, স্বয়ং মারহাট্টা দস্যুগণকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করিয়া দিলেন।

জানোজী, বঙ্গীয় সেনাগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া, স্বীয় পিতার লুণ্ঠনবৃত্তির পদ্ধতি অবলম্বনে রাজধানী লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে, গোপনে মুরশিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু যখন জানিতে পারিল যে বঙ্গেশ্বর তাহার কুঅভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, তাহার অনুসরণ করিতেছেন; তখন দস্যু সর্দ্দার জানোজী ভোঁস্‌লা পলাইয়া গেল।

বর্ষার শেষে নওয়াব বর্গিগণকে তাঁহার রাজত্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে তাড়াইয়া দিবার কল্পনা করিতেছেন, এমন সময় আমিন গঞ্জে অবস্থিতি করিতে থাকা অবস্থায়, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়েন-আবদীনের ও ভ্রাতা হাজী আহ্‌মদের হত্যা, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠান সর্দ্দার শম্‌শের খান ও সর্দ্দার খান কর্ত্তৃক বেহারে রাজদ্রোহের সংবাদ পাইলেন।

ইতিপূর্ব্বে জয়েন আবদীন দারভাঙ্গায় উক্ত বিদ্রোহীদ্বয়ের ক্রমোন্নতির অবস্থা দর্শনে ভীত হইয়া, তাহাদিগকে স্বীয় সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করিয়া রাখিবার জন্য বঙ্গেশ্বরের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নওয়াবও সকল দিক দেখিয়া, এবং এই কঠিন সময়ের অবস্থা বিবেচনা, করিয়া অনিচ্ছায় সহিত বেহারের শাসনকর্ত্তার এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ১১৬১ হিজরীর জিলকদ মাসে বিশ্বাসঘাতকদ্বয়, দারভাঙ্গা পরিত্যাগ করিয়া সুবাদারের নিকট গিয়া, নরহন্তা মোরাদ খাঁর দ্বারা জয়েন আবদীনকে হত্যা করে। তৎপরে হাজী আহ্‌ম্মদকে বন্দি করিয়া, তাঁহার ধনরত্ন অপহরণ-কল্পে, এক সপ্তাহ যাবৎ অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার প্রাণ বধ করে। শেষে বিদ্রোহীদ্বয় বঙ্গেশ্বরের কন্যা, জয়েন আবদীনের স্ত্রী আমেনা বেগমকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে।

চতুর্দ্দিকের এই মহা বিপদ-জালও তেজস্বী বৃদ্ধ নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খানের মানসিক বল খর্ব্ব করিতে পারে নাই। নওয়াব অসীম সাহসিকতা এবং তৎসহ পুরুষোচিত দৃঢ়তা ও মনস্বিতায় সহিত একদিকে বর্গীর হাঙ্গামা, অপর দিকে ভ্রাতা-ভ্রাতুষ্পুত্রের নিদারুণ হত্যা ও তৎসহ কন্যার অবমানাহ কারাবাসের সংবাদ, অবিচলিত হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া, এই সীমাহীন বিপদ ও দুর্ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় মারহাট্টা দস্যুগণ বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু নওয়াব দেখিলেন যে সম্মুখ-যুদ্ধাতঙ্কগ্রস্ত মহারাষ্ট্রীয় তস্করগণকে তাড়াইতে গেলে, বেহারের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিবে। এ কারণ তিনি ভগবান গোলায় খাদ্যদ্রব্য আমদানীর পথ পরিষ্কার রাখিবার জন্য, তথায় পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সহ সৈয়দ আহ্‌ম্মদকে নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও কয়েক সহস্র পদাতিকের অধিনায়কত্বে, আমিনগঞ্জ হইতে বেহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গঙ্গা বহিয়া খাদ্য-

দ্রব্য পরিপূর্ণ বহু সংখ্যক নৌকা নওয়াবের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল। নওয়াব এই যাত্রাকালে মীর জাফরকে ডাকিয়া, তাঁহার সহকারী সেনানী স্বরূপ তাহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন।

বঙ্গেশ্বর মুঙ্গের পর্য্যন্ত পথ বিনা বাধায় অতিক্রম করিলেন। কেবল মাত্র ভাগলপুরে বর্গিগণের সহিত তাঁহার একবার সামান্য সংঘর্ষ হইয়াছিল। মুঙ্গেরে নওয়াব অনেকগুলি বেহারী জমিদারের সাহায্য পাইলেন। এই স্থানে তাঁহার জামাতা মৃত জয়েন আবদীনের একান্ত অনুগত কতকগুলি প্রতিপত্তিশালী লোকে, নওয়াবের অধীনতা স্বীকার করিয়া, তাঁহাকে শত্রু সেনা সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ প্রদান করিল।

এই সময় বিদ্রোহী পাঠানদ্বয় প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা সংগ্রহ করিয়া, মারহাট্টা দস্যুদলসহ মিলিত হইবার আশায়, অপেক্ষা করিতেছিল।

জানোজী ও মীর হবিব, বিদ্রোহীগণের শিবিরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করিল। পরে উহারা শম্শের খানকে বেহারের সুবাদার পদে নিয়োগ করিয়া, তাঁহাকে তদুপযুক্ত খেল্আত্ উপহার দিল।

পর দিবস মীর হবিব দেখিল যে—তাহাদের নিযুক্ত নব সুবাদারের চক্রান্তে, তিনি নিজে পাঠান সেনাগণ কর্ত্তৃক এক প্রকার বন্দী হইয়াছেন।

এই অবস্থা অনুভব করিয়া চতুর চূড়ামণি মীর হবিব—নওয়াব সেনাগণ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে—এই অযথা সংবাদ প্রচার করিয়া দিল। হবিব, এই নওয়াব ভীতি চতুর্দ্দিকে প্রচার দ্বারা তাহার আশানুরূপ ফল পাইল। বিদ্রোহীগণের মধ্যে চতুর্দ্দিকে গোলযোগ উপস্থিত হইল, এবং পরদিন সত্য সত্যই বঙ্গেশ্বর আলিভরার্দ্দী খান সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া যুগপৎ বিদ্রোহীগণকে আক্রমণ করিলেন।

যুদ্ধারম্ভেই সরদার খান একটী গোলার আঘাতে নিহত হইল। এই অবস্থা দেখিয়া শম্‌শেরের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। যুদ্ধের সময় মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু সেনাগণ তাহাদের চিরবাঞ্ছিত লুণ্ঠন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, পশ্চাদ্দিক হইতে কাপুরুষের ন্যায় বঙ্গীয় সেনাগণকে আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই; এবং নওয়াব, সৈন্যসহ রণস্থলে উপস্থিত থাকা কালে তস্করগণ, মোসলেম সেনাগণের বস্ত্রাবাস গুলি লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে রহিল।

এই অবস্থা দর্শনে তেজস্বী যুবক সেরাজউদ্দোলা, সেই সময় একদল সেনা লইয়া মারহাট্টা দস্যুগণকে তাড়াইয়া দিবার জন্য, মাতামহের অনুমতি প্রার্থনা করায়, নওয়াব উত্তর করিয়াছিলেন—

"সম্মুখস্থ শত্রুগণকে খোদার কৃপায় পরাজিত করিয়া, ভীরু বর্গী তস্কর বিনা আয়াসে তাড়াইয়া দিতে পারিব।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ নওয়াব, সিংহ বিক্রমে শত্রু সেনা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শম্‌শেরের অধীনস্থ পাঠানগণ তাঁহার বিক্রম দর্শনে আতঙ্কে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় হবিব বেগ, বিদ্রোহী শম্‌শের খানকে তাহার হস্তীর পৃষ্ঠে আক্রমণ করিয়া, তরবারির আঘাতে বিদ্রোহীর শিরশ্ছেদ করিয়া, ছিন্ন শির নওয়াবের নিকট উপস্থিত করিলেন। মারহাট্টা সেনাগণ পশ্চাৎ হইতে এই অবস্থা দর্শনে আর এক পাও অগ্রসর না হইয়া, তাহাদের জাতিগত স্বভাব-সূচক পলায়ন বৃত্তি অবলম্বন করিল।

অতঃপর নওয়াব তাঁহার কন্যা ও জয়েন আবদীনের পরিবারবর্গকে পাটনা হইতে উদ্ধার করিয়া, সেই বিপদভঞ্জন আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন; এবং সেই করুণা-নিদানের উদ্দেশ্যে পাটনায় ধার্ম্মিক মোসলমান এবং গরীব দুঃখিগণের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত ধন বিতরণ করিলেন। তৎপরে এই মহোন্নত হৃদয়বান নওয়াব, দারভাঙ্গা

হইতে বিদ্রোহী পাঠানদ্বয়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে আনয়ন করিয়া, তাহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শনে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিয়া, পরে তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন।

মীর হবিবের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণ, যাহারা যুদ্ধারম্ভে নওয়াব সেনা কর্তৃক বন্দি হইয়াছিলেন; নওয়াব তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ ও ভ্রমনোপযোগী যান-বাহনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, দেহরক্ষী সেনাসহ তাহাদিগকে শত্রু শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন।

তৎপরে বঙ্গেশ্বর স্বীয় দৌহিত্র সেরাজ উদ্দৌলার নামে বেহারের সুবাদারী পদ প্রতিষ্ঠা করিয়া, এবং রাজা জানকী রামকে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার সহকারী সুবাদার নিযুক্ত করিয়া ও জামাতা সৈয়দ আহ্‌মদকে পুর্ণিয়ার ফৌজদার পদে অভিষিক্ত করিয়া, রাজধানী মুরশিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাজধানীতে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নওয়াব, স্বীয় ভ্রাতা হাজী আহ্‌মদের জামাতা, রাজবিদ্রোহী আতাউল্লাহ্‌ খানকে (যে ইতিপুর্ব্বে মেদিনীপুরে গিয়া বঙ্গেশ্বরের জীবন ও রাজত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল) তাহার পরিবারবর্গ ও ধন-রত্নাদি সহ অচিরে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ দিলেন।

আতাউল্লাহ্‌ অযোধ্যায় গিয়া সফ্‌দার জঙ্গের সেনাদলে নিযুক্ত হইলেন ও অল্পদিন মধ্যেই ফরাক্কাবাদে পাঠানগণের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন।

মারহাট্টা সর্দ্দার জানোজী, নওয়াবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সাধ্যাতীত বিবেচনায়, মেদিনীপুরে সরিয়া পড়িল ও তথা হইতে অল্পদিন মধ্যে মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, মীর হবিবকে যুক্ত সেনাসহ কটকে রাখিয়া নাগপুরে চলিয়া গেল।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে নওয়াব পুনরায় বর্গী দমনের জন্য মেদিনীপুরে গমন

করিলেন। মারহাট্টা সেনাধ্যক্ষ মীর হবিব, নওয়াবের আগমনে পূর্ব্বপূর্ব্ব বারের ন্যায় পলায়ন করিল।

এমন সময় বঙ্গেশ্বর সংবাদ পাইলেন যে—তাঁহার অত স্নেহাদরের সেরাজউদ্দৌলা, স্বাধীনভাবে পাটনা অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে ও তথায় স্বাধীন নরপতি স্বরূপ ঘোষিত হইবার জন্য, নওয়াবের নিযুক্ত অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা জানকীরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করিতেছেন।

নওয়াব এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া, দৌহিত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কাতরতার সহিত পত্র লিখিলেন। কিন্তু চির-আদরে প্রতিপালিত উদ্ধত-প্রকৃতি-যুবক সেরাজ, বৃদ্ধ মাতামহের কাতরোক্তির মর্ম্ম বুঝিলেন না। শেষে মাতামহের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, তিনি পাটনায় গিয়া জানকী রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

রাজা জানকী রাম মহা সমস্যায় পড়িলেন। একদিকে তিনি নওয়াবের বিনানুমতিতে সেরাজকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে পারেন না; অপর পক্ষে তাঁহার ভয় হইল পাছে যুদ্ধ করিতে গেলে নওয়াব-দৌহিত্র আহত হয়েন।

যাহা হউক প্রথম আক্রমণের ফলেই, সেরাজের প্রধান কুপরামর্শদাতা মেহ্দী নেসার খান হত হওয়ায়, মুষ্টিমেয় সেরাজ-সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সেরাজ পাটনার বাহিরে একটী সামান্য গৃহে আশ্রয় লইলেন। ইত্যবসরে নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খান, পাটনায় আসিয়া পৌছিয়া, দৌহিত্রকে ভৎর্সনা করিবার পরিবর্ত্তে সাদরে গ্রহণ করায়, সেরাজ কয়েক দিনের মধ্যেই মাতামহ সহ মুরশিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ১১৬৪ হিঃ নওয়াব পুনরায় মারহাট্টাগণকে কটক হইতে তাড়াইবার জন্য উড়িষ্যা যাত্রা করিলেন ও তথায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া, উড়িষ্যা দেশ মহারাষ্ট্রীয়গণের সর্দ্দার মীর হবিবকে ছাড়িয়া দিয়া, তাহার

সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন—সুবর্ণরেখা নদী উভয় রাজ্যের সীমা ধার্য্য রহিল। বর্গীগণ ভবিষ্যতে কখনও সুবর্ণরেখা নদীর পর পারে, এমন কি নদীর জলে পর্য্যন্ত পদার্পণ করিবে না।—সন্ধিপত্রে মীর হবিবের স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া, নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খান মুরশিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

মারহাট্টা-দস্যু-সর্দ্দার মীর হবিবকে, কিন্তু তাহার এই পরিশ্রমের ফল বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না। বেরার রাজপুত্র জানোজী ভোঁস্‌লা, অল্পদিন মধ্যেই ক্ষাত্রশক্তি প্রদর্শনে তাহাকে গুপ্ত ভাবে হত্যা করিল।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সেরাজদ্দৌলা ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া, অন্যায় মতে আমীর হোসায়েন কুলি খানকে হত্যা করিয়া, সর্ব্বসাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে হাজী আহ্‌মদের পুত্র নওয়াজেস্‌ মোহাম্মদের অপুত্রক মৃত্যু হয়, এবং অল্পদিন মধ্যেই তদীয় ভ্রাতা পূর্ণিয়ার ফৌজদার সৈয়দ আহ্‌মদ, একমাত্র পুত্র শওকাৎজঙ্গকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

এই সময় অশীতি বৎসর বয়সে, নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খানের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা নওয়াজেস্‌ পত্নী ঘসেটী বেগম, স্বামীর আনন্দ নিকেতন মতীঝিলে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় ঘাসেটী বেগম, স্বামীত্যক্ত অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকাংশ মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া, সাধারণের অতিশয় প্রিয়পাত্রী হইয়া পড়িলেন।

মতীঝিল প্রাসাদ একটী সুদৃশ্য কৃত্রিম হ্রদের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মৃত নওয়াজেস্‌ মোহাম্মদ, লক্ষ্মণাবতী নগর হইতে বহু সংখ্যক কৃষ্ণ বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরের স্তম্ভ আনাইয়া, অতি সুন্দর রূপে এই সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। এই হ্রদ ও প্রাসাদের ভগ্ন অংশ এখনও ইঃ বিঃ রেলওয়ের মুরশিদাবাদ ষ্টেশনের নিকট, ট্রেনে বসিয়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

হিজরী ১১৬৯ সনের ৯ই রজব ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশ ত্রয়ের উপর ১৬ বৎসর সুশাসন করিবার পর, নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খান শোথ ও উদরী রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পর দিবস রাত্রে খোষবাগে তাঁহার মাতার কবরের পার্শ্বে, নওয়াবের মৃত দেহ সমাধিস্থ করা হইল।

বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত আজীবন নওয়াব আলিওয়র্দ্দী খানের সহিত বিলাসীতার কোন সম্পর্ক ছিল না। নিয়মিত উপাসনা করা ও পবিত্র কোরআনের সামান্ত আদেশ পর্য্যন্ত লঙ্ঘন না করা, তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে নওয়াব শয্যাত্যাগ করিতেন ; তৎপরে অজু করিয়া প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপনান্তে কাফি পান করিতেন। সূর্য্যোদয়ের পর শাসন ও সেনা বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীবৃন্দের সহিত সকল প্রকার রাজনৈতিক পরামর্শ করিতেন,; এবং তাহাদিগকে ঐ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। দুই ঘণ্টা পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, আবশ্যক মত ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজেস্ মোহাম্মদ, সৈয়দ আহ্‌মদ, দৌহিত্র সেরাজদ্দৌলা প্রভৃতি আত্মীয় গণের সহিত সাংসারিক পরামর্শ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতেন। এই স্থানে বসিয়া অবসর মত নওয়াব, কখনও কখনও সুকবিগণের লিখিত পদ্য সকল বা ইতিহাস পাঠ শ্রবণ করিতেন এবং রন্ধন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। তৎপরে আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত বসিয়া আহারাদি সমাপনান্তে খোষ গল্প বা গল্পের পুস্তক পাঠ শুনিতে শুনিতে সামান্ত ক্ষণের জন্ত নিদ্রা যাইতেন।

দুই প্রহরের এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই নওয়াব, শয্যা ত্যাগ করিতেন। তৎপরে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা সমাপন করিয়া প্রত্যহ বেলা চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত কোরআন পাঠ করিতেন। পরে বৈকালিক নামাজ

শেষ করিয়া কেবল মাত্র কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিতেন। তৎপরে পুনরায় বসিয়া আইনজ্ঞ ও ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞগণের যুক্তিপুর্ণ তর্ক-বিতর্ক শ্রবণে চরিতার্থ হইতেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। অতঃপর সান্ধ্য নমাজান্তে, রাজস্ব সচিব জগৎ শেঠ ও অপরাপর মন্ত্রীকে ডাকাইয়া, তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার বিশাল রাজত্বের প্রত্যেক জেলা সম্বন্ধীয় ও অপরাপর সর্ব্ববিষয়ক সংবাদ প্রত্যহ সংগ্রহ করিতেন। ইহার পর মন্ত্রীগণের সহিত প্রাত্যহিক নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়া, যেরূপ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন, অমাত্যবর্গের প্রতি সেই মত কার্য্য করিতে অনুমতি দিতেন।

এই সকল কার্য্যে অনেক রাত্রি হইয়া পড়িত; তখন নওয়াব অল্পক্ষণ বিদূষক ও পরিহাসকগণের রহস্যময় কথাবার্ত্তা শুনিয়া, নৈশিক উপাসনায় নিমগ্ন হইতেন। তৎপরে রাত্রি ৯ টার মধ্যে স্বীয় বেগমের সহিত সাংসারিক কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া ও অপরাপর স্ত্রীলোকগণের আবেদন-নিবেদন শ্রবণান্তে উহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, আর কোন রাজকর্ম্মচারীর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিনা বলিয়া পাঠাইতেন। এই সমস্ত কার্য্য সমাপনান্তে রাত্রে যৎসামান্য আহার করিয়া বঙ্গেশ্বর শয্যা গ্রহণ করিতেন।

আলিওয়ার্দ্দী খান, যাহার দ্বারা কখনও সামান্য উপকারও পাইয়াছিলেন, জীবনে তাহা ভুলেন নাই। উপকারীকে না পাইলে নওয়াব, তাহার পুত্র পৌত্র বা তাহার বংশের কাহারও নিকট সেই উপকারের প্রতিদান দিয়া গিয়াছেন। নওয়াবের নম্রতায় তাঁহার রাজত্ব মধ্যে সকলেই তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, এবং সকলেই তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল।

এই যুদ্ধ দুর্দ্ধর্ষ নওয়াবের, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা সমভাবে

বিচক্ষণ ছিল। তাঁহার রাজত্বের মধ্যাবস্থায় নওয়াবের প্রধান সেনাপতি মোস্তফা খান, কলিকাতা হইতে ইংরাজগণকে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে স্বয়ং, এবং শেষে নওয়াজেশ্ মোহাম্মদ ও সৈয়দ আহ্মদের দ্বারা বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। অবশেষে দুরদর্শী নওয়াব একদিন সেনাপতিকে ডাকিয়া বলিলেন—

"এক্ষণে ভূমির অগ্নি নির্ব্বাণ করাই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে; অতঃপর সাগরে অগ্নি সংযোগ হইলে কে তাহা নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইবে? তখন পরিণাম নিঃসন্দেহ অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িবে!" *

আলিওয়ার্দ্দী খানের রাজত্বে, ইংরাজ কোম্পানিকে এক দিনের জন্যও বিরক্তি সহ্য করিতে হয় নাই। জমিদারেরা নওয়াবের ব্যবহারে এতদুর সন্তুষ্ট ছিলেন যে—বর্গী তস্করগণের সহিত যুদ্ধ কালে তাঁহারা স্বেচ্ছায় বঙ্গেশ্বরকে দেড় ক্রোর টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

*১৭৪৬ সালে কাবুলের পরাক্রান্ত নরপতি আহ্মদ শাহ আবদালি ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং পর বৎসর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের মৃত্যু হয়। তাহার পর হইতে বাঙ্গালা আর দিল্লীর অধীনতা-পাশে বদ্ধ ছিল না।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

নওয়াব মনসুরল্-মুল্‌ক্ সেরাজ-উদ্দৌলা সাহ্ কুলি খান, মির্জ্জা মাহ্‌মুদ হায়বৎ-জঙ্গ বাহাদুর

জয়েন আবদীন পুত্র মির্জ্জা মাহ্‌মুদ, মুরশিদাবাদের স্বাধীন নওয়াবের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, স্বীয় যৌবন-সুলভ স্বাভাবিক চপলতা, দাম্ভিকতা ও বাল্যকাল হইতে মাতামহের অত্যাদরে প্রতি-পালিত হওয়া হেতু নৃশংসতা নিবন্ধন, অল্পদিন মধ্যে মৃত নওয়াবের সুদক্ষ প্রবীণ সভাসদগণের প্রায় সকলেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন্।

নওয়াবের দৈহিক সৌন্দর্য্য, তাঁহার চরিত্র গঠনের পক্ষে এই সময় অনেকটা অন্তরায় হইয়াছিল। সে সময় সেরাজ-উদ্দৌলার ন্যায় সুপুরুষ রাজধানীতে দৃষ্টিগোচর হইত না বলিলেও অত্যুক্তি হয়না।

সেরাজ প্রথমতঃই স্বীয় মাতৃস্বসা নওয়াজেশ্ মোহাম্মদের বিধবা পত্নী ঘসেটী বেগমের যত ধন-রত্ন তাঁহার মতীঝিল প্রাসাদ হইতে বল প্রয়োগে বাহির করিয়া লইয়া আসিয়া, উক্ত আত্মীয়াকে তাঁহার প্রধান শত্রু মধ্যে পরিগণিত করিলেন। তৎপরে ঢাকার শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভকে নানপ্রকারে উত্যক্ত করায়, তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহার পরিবারবর্গ ও সমুদয় ধন-রত্ন, কলিকাতায় ইংরাজগণের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মাহ্‌মুদ পুরাতন রাজকর্ম্মচারিগণকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাঁহাদের

স্থানে অদূরদর্শী যুবকগণকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংসারিক খরচ পত্রের তত্ত্বাবধায়ক মোহনলাল, এই সময় স্বীয় সুন্দরী ভগ্নীকে যুবক নওয়াবের হস্তে তুলিয়া দিয়া, সামান্য বাজার সরকারের পদ হইতে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়া, নওয়াবের দেওয়ানের (প্রধান মন্ত্রীর) পদে উন্নীত হইলেন। নওয়াব, মীর মদন্‌কে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করিয়া, প্রবল সেনাধ্যক্ষ মীর জাফরের আন্তরিক বিরাগ ভাজন হইয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময় কলিকাতায় ইংরাজগণ, রাজা রাজবল্লভের পুত্র কিষণ বল্লভকে নওয়াবের হস্তে সমর্পণ না করায় ও তৎসঙ্গে ফোর্ট উইলিয়াম্ দুর্গ নওয়াবের বিনানুমতিতে সুরক্ষিত করিতে থাকায় নওয়াব, কাসেম বাজারের কুঠির অধ্যক্ষ মিষ্টার ওয়াইটস্‌কে বন্দি করিয়া, সসৈন্যে ১১৬৯ হিঃ ১০ই রমজান, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুন তারিখে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া ১৬ই রমজান তারিখে কলিকাতার উত্তর সীমায় আসিয়া পৌছিলেন।

নওয়াবের আগমন সংবাদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলিকাতাস্থ প্রধান কর্ম্মচারি মিঃ ড্রেক, দুর্গের পশ্চিম দিক দিয়া বাহির হইয়া, গোপনে নৌকারোহণে পলাইয়া গিয়া পরে জাহাজে চড়িয়া অব্যাহতি পাইলেন।

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে চঞ্চলচিত্ত নওয়াব, পুরাতন সেনাপতি মীর জাফরকে তাঁহার পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

২২শে রমজান ২১শে জুন তারিখে বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় নওয়াব, ফোর্ট উইলিয়মের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উমিচাঁদ ও কিষণ বল্লভকে তথায় তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইল। সেরাজ এই সময় তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ভদ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

তৎপরে নওয়াব তাঁহার এই প্রথম বিজয় চিরস্মরণীয় করনার্থে

কলিকাতার নাম আলীনগর রক্ষা করিয়া, হুগলীর ফৌজদার মানিকচাঁদের অধীনে তিন সহস্র সেনা রাখিয়া দিয়া, ২রা জুলাই তারিখে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১১ই জুলাই তারিখে তাঁহার মাতামহী, মৃত নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খানের বৃদ্ধা মহিষীর মধ্যস্থতায় সেরাজ, মিঃ হল্‌ওয়েল্‌ ও তৎসঙ্গীগণকে মুক্তি দান করিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারি মিঃ ড্রেক পলাইয়া গিয়া এতদিন মান্দ্রাজ হইতে অনুমতির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ও জনৈক মিঃ ম্যানিংহাম্‌কে মান্দ্রাজ ফোর্ট সেণ্টজর্জ্জের অধ্যক্ষের নিকট, এই সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেণ্টজর্জ্জ দুর্গে ইংরাজ প্রধানগণের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর, এ্যাড্‌মিরাল (নৌসেনাপতি, আমিরল্‌-বাহার) ওয়াট্‌সনের পরামর্শ মতে, নওয়াবের সহিত যুদ্ধ করাই স্থিরীকৃত হইল।

দুর্গাধ্যক্ষ পিগট্‌ ও এ্যাড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন বহু চেষ্টা সত্ত্বেও, অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে কোন মতে সেনা প্রেরণ করিতে কৃতকার্য্য হইলেন না। তৎপরে ইংরাজের দুইখানি বৃহদায়তন যুদ্ধ জাহাজ ৫০টী ও ২০টী কামান লইয়া ও অপর একখানি ক্ষুদ্র রণতরী, কোম্পানির তিনটী বাণিজ্য পোত, এবং দুইটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন জাহাজ সহ, ১৬ই অক্টোবর তারিখে মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিল।

কর্ণেল ক্লাইভের অধীনে ৯০০ শত ইউরোপীয় ও ১৫০০ শত দেশীয় সৈন্য ছিল। ক্লাইভ, সেরাজ-উদ্দৌলার নামে, দক্ষিণাপথের সুবাদার সালাবৎজঙ্গ, আর্‌কটের নওয়াব মোহাম্মদ আলি ও মিঃ পিগটের নিকট হইতে কলিকাতা সম্বন্ধে ক্ষতিপূরণ আদায়কারী পত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ২০শে ডিসেম্বর ইংরাজের জাহাজগুলি সৈন্য লইয়া ফল্‌তায় উপস্থিত হইল।

পথের গোলযোগে ও অনুকুল বায়ু অভাবে এই ৭০টী কামানবাহী "কাম্বারল্যাণ্ড" ও "মারল্‌বরো" জাহাজ দ্বয়ের পৌছিতে বিলম্ব হইয়া পড়িল।

২৭ ডিসেম্বর সমস্ত জাহাজগুলি শেষে বজবজ্‌ হইতে দশ মাইল দক্ষিণে মায়াপুরে আসিয়া নঙ্গর করিল। কর্ণেল ক্লাইভ, টানা ও আলিগড়ের দুর্গাধিকার মানসে, নিশাযোগে তাঁহার সৈন্য লইয়া অবতরণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নওয়াবের ফৌজদার মানিকচাঁদ এই সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, যুদ্ধে প্রায় সমুদয় ইংরেজ সেনা, নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; এমন সময় ইংরাজ-আগ্নেয়-অস্ত্রের একটী গোলা, হস্তী আরূঢ় মাণিক চাঁদের মস্তক ঘেঁশিয়া শন্‌ শন্‌ শব্দে চলিয়া যাওয়ায়, তিনি ভীত হইয়া সৈন্যগণের প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। এই সময়ে ৬৪টী কামানবাহী রণতরী "কেন্ট" হইতে কামান দাগিতে আরম্ভ হওয়ায়, মানিক চাঁদের সেনাগণ দ্রুতবেগে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। ৩০ ডিসেম্বর তারিখে ইংরাজগণ বিনা বাধায় আলিগড় ও টানার দুর্গ অধিকার করিল।

ফৌজদার মানিক চাঁদ বজবজের যুদ্ধ-ব্যাপারে ভীত হইয়া, কলিকাতা রক্ষণাবেক্ষণার্থে মাত্র ৫০০ শত সেনা দুর্গ মধ্যে রক্ষা করিয়া, নওয়াবের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে কর্ণেল ক্লাইভ সসৈন্যে আলিগড় দুর্গ হইতে, কলিকাতার রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পৌছিবার পূর্ব্বেই জাহাজগুলি কলিকাতার দুর্গের নিকট আসিয়া পড়িল ও কাপ্তেন কুট, অল্পক্ষণ মধ্যে দুর্গ মধ্যস্থ ফৌজদার সেনাগণকে বিতাড়িত করিয়া, মিঃ ড্রেক্‌কে তাঁহার পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

৪ঠা জানুয়ারি ১৫০ জন ইংরাজ ও ২০০ শত সিপাই লইয়া, ২০টী

কামানবাহী এক খানি রণতরী, আরও তিন খানি ক্ষুদ্র রণ-পোত সহ হুগলীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে গিয়া, বিংশতি কামানবাহী জাহাজখানি চড়ায় আটকাইয়া গেল। যাহা হউক ১০ই জানুয়ারিতে উহারা কোন মতে হুগলী পৌঁছিয়া, রণতরীস্থ কামানের সাহায্যে ফৌজদার সেনাগণকে অনায়াসে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইল।

এই সময় ইউরোপ খণ্ডে ইংরাজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায়, কোম্পানির কলিকাতার ইংরাজ কৌনসিলগণ নির্দ্ধারণ করিলেন যে—চন্দন নগরের ফরাসীগণ তাহাদের সৈন্য ও কামান শ্রেণী লইয়া নওয়াবের সহিত মিলিত হইলে, ইংরাজদের বিপদের খুবই সম্ভাবনা।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া চতুর চূড়ামণি কর্ণেল ক্লাইভ, মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের নিকট এবং কলিকাতায় উমিচাঁদের নিকট, নওয়াবের সহিত সন্ধি করিবার জন্য মধ্যস্থ হইবার প্রার্থনায় পত্র লিখিলেন।

হুগলী অধিকারের পূর্ব্বে এই প্রস্তাব হইলে সম্ভবতঃ নওয়াব সেরাজ-উদ্দৌলা ইহাতে সম্মত হইতেন। কিন্তু হুগলী ব্যাপারের পর নওয়াব ইহার প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায়, তিনি ঘৃণার সহিত ইংরাজ দিগের সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

নওয়াবের শত্রুপক্ষ, তাঁহার নিজ "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" সভাসদগণও নওয়াবের উৎখাত সাধনাভিপ্রায়ে, তাঁহাকে এই সময় উত্তেজক কুপরামর্শই দান করিয়াছিল।

নওয়াব মাহমুদ, প্রথমতঃ গয়ংগচ্ছ করিয়া শেষে সসৈন্যে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং ৩০শে জানুয়ারী তারিখে হুগলীর দশ মাইল উত্তরে একস্থানে ভাগীরথী পার হইলেন। ইংরাজেরা এই সময় মধ্যে হুগলী হইতে কলিকাতায় সৈন্য সরাইয়া লইয়া, ভাগীরথীর কিয়দ্দূরে, তৎকালের ক্ষুদ্র কলিকাতা নগরীর উত্তরে, এক মাইল ব্যবধানে সৈন্য

সমাবেশ করিলেন ও ছাউনী করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

২রা ফেব্রুয়ারী নওয়াব সৈন্য ক্লাইভের শিবিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ক্লাইভ তাহাদিগকে কলিকাতার ভিতরে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তাহাদের প্রতি অগ্নি-বৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিল;—নওয়াবও দস্তুর মত ইহার উত্তর দিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষের কামান বন্ধ হইয়া গেল, তৎপরে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া উভয় পক্ষের দূত দ্বারা সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

৯ই ফেব্রুয়ারী সন্ধির সমস্ত শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গেল, এবং ১১ই উভয় পক্ষ দ্বারা সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হইল।

এই সময় দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীগণের মধ্যে সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজ জয়ী হইয়া এ্যাডমিরাল ওয়াকার জঙ্গ, বাহাদুরের অধীনে, চন্দননগর জয়ের অভিপ্রায়ে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিলেন। উহারা অচিরে ২২ মার্চ্চ তারিখে ফরাসডাঙ্গা (চন্দননগর) অধিকার করিয়া, পরে কাসিম বাজারের নিকটস্থ ফরাসীগণের কুঠি সকল হস্তগত করিল। চন্দন নগরের ফরাসী দুর্গ সম্মুখে ভাগীরথী বক্ষে ইংরাজের ৬৪ ও ৬০টী কামানবাহী 'কেন্ট' ও 'টাইগার' রণতরীদ্বয় রক্ষিত হইল।

মশেঁালাস্, ফরাসী গভর্ণর, এক শত ইউরোপীয়ান ও ৬০ জন শিক্ষিত তৈলঙ্গী সিপাই লইয়া নওয়াবের নিকট আশ্রয় লইলেন। তখন ইংরাজেরা সন্ধির সূত্র ধরিয়া নওয়াবের নিকট ফরাসী মশেঁালাস্‌কে আশ্রয় চ্যুত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সেরাজ-উদ্দৌলা সম্পূর্ণ অনিচ্ছার সহিত অগত্যা মশেঁালাস্‌কে পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। ১৬ই এপ্রেল মশেঁালাস্ মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর খান, স্বদেশদ্রোহী

রাজা দুর্ল্লভ রাম, উমি চাঁদ ও জগৎ শেঠ প্রভৃতি, আলিওয়ার্দ্দী কন্যা ঘেসেটী বেগমের সহিত মতীঝিল্ প্রাসাদে গুপ্ত পরামর্শ করিয়া, যুবক নওয়াব সেরাজউদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতি ও তৎসহ তাঁহার প্রাণনাশের সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। দুর্ব্বৃত্ত মীর জাফর, কলিকাতায় ইংরাজগণের নিকট তাহাদের কুপরামর্শের ফলাফল জ্ঞাপন করিতে লাগিল। মিঃ ওয়াটস্, উমিচাঁদকে এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ ও পত্রবাহক নিযুক্ত করিলেন।

১০ই জুন তারিখে ইংরাজ কোম্পানী, সন্ধি-শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া নওয়াবের সঙ্গে যুদ্ধ করাই সাব্যস্ত করিলেন। ১২ জুন কলিকাতার ইংরেজ সেনাগণ চন্দননগরে গিয়া, তথাকার ইংরাজ সেনাগণের সহিত মিলিত হইল; এবং তথা হইতে মাত্র সামান্য কয়েক জনকে চন্দননগর রক্ষা করিবার জন্য রাখিয়া, সমস্ত ইংরাজ সেনা যাত্রা আরম্ভ করিল।

ইউরোপীয় সেনাগণ কামান সহ প্রায় দুইশত বৃহদায়তন নৌকা-যোগে জলপথে, এবং সেপাহিরা ভাগীরথীর তীর দিয়া হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার, ইংরাজগণকে গমনের বাধা প্রদান করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। (তওয়ারিখে মোজাফ্‌ফরি ও সিয়ারল্ মোতাক্ষরীণ)।

এই সময়ে বঙ্গেশ্বর, একদিকে যেমন ইংরাজ সৈন্যের রাজধানী অভি-মুখে আগমনের সংবাদ অবগত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, অপর পক্ষে প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের কুঅভিসন্ধির বিষয় উপলব্ধি করিয়া তেমনি তাঁহার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল। ইতিমধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন যে—তাঁহার দরবার হইতে ইংরাজ দূত মিঃ ওয়াটস্ গোপনে সরিয়া পড়িয়াছেন।

নওয়াব প্রথমতঃ সেনাপতিকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু মীর জাফর নওয়াবের নিকট যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, অগত্যা বঙ্গেশ্বর পাল্‌কি আরোহণে কয়েকজন অনুচরসহ সেনাপতির বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় শঠ চূড়ামণি অধার্ম্মিক মীর জাফর, পবিত্র কোরআন স্পর্শে, এই আশু যুদ্ধে তিনি ইংরাজগণের সাহায্য করিবেন না, বা তাহাদের সহিত মিলিত হইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

পর দিবস নওয়াব, তাঁহার সমস্ত সেনা পলাশীর নিকটে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৬ই জুন ইংরাজ সেনাগণ কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী পাটুলী গ্রামে গিয়া পৌছিল। কাটোয়ার দুর্গ, যে স্থানে আলিওয়ার্দ্দী খান মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন, তথাকার দুর্গাধিপকে কুচক্রী মীর জাফর পূর্ব্ব হইতেই তাহার ষড়যন্ত্র মধ্যে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। সেই জন্য দুর্গাধিকারী সামান্য বাধা প্রদানের ভান মাত্র করিয়া, শেষে ইংরাজগণকে দুর্গ ছাড়িয়া দিল। মেজর কুট, ১৭ই জুন কাটোয়ার দুর্গে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সে রাত্রে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ায়, ইংরাজ সেনাগণকে বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছিল।

এই স্থানে কর্ণেল ক্লাইভ মীর জাফরের লিখিত ১৬ই জুন তারিখের পত্র পাইলেন। তাহাতেও, উক্ত সেনাপতি যে ইংরাজগণের সহিত পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন, এবং নওয়াবের সহিত মিলন যে সম্পূর্ণ বাহ্যিক তাহা লিখিয়া, তিনি ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পত্রেও কর্ণেল ক্লাইভের, বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের প্রতিজ্ঞার উপর দৃঢ় বিশ্বাস না হওয়ায়, তিনি নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্য্যন্ত ভাগীরথী পার হইতে ক্ষান্ত থাকিয়া, দুই দিবস দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৯শে জুন একজন পত্র বাহক, নওয়াব

সেনাধ্যক্ষের নিকট হইতে দুই খানি পত্র লইয়া গোপনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার একখানি স্বদেশদ্রোহী মীর জাফরের কুকর্ম্মের সহায়তাকারী, ইংরাজ শিবিরে তাঁহার প্রতিভু আমীর বেগের নামে ও অপর খানি কর্ণেল ক্লাইভের নামে লেখা ছিল। দুই খানি পত্রের মর্ম্ম একই। তাহাতে লেখা ছিল—

"নওয়াব সৈন্য সেই দিনই মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিবে। এবং সেনাপতির কেন্দ্র পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে না হইয়া, এক পার্শ্বে থাকিবে ও তথা হইতে তিনি ইংরাজ শিবিরে সকল বিষয়ে সহজে সংবাদ দিতে পারিবেন।"

কিন্তু এই পত্রেও ক্লাইভের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত না হওয়ায় তিনি, তাঁহার বিংশতি জন কর্ম্মচারী লইয়া এই জটিল সমস্যা মীমাংসা করণ জন্য, সেই রাত্রে পরামর্শ করিতে বসিলেন। এই সভায় এই দুইটী আলোচ্য বিষয় রহিল।

১ম—সদ্যই গঙ্গা পার হইয়া নওয়াবের সেনাগণকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করা বিধেয় কিনা?

২য়—মারহাট্টাগণকে ডাকাইয়া বর্ষান্তে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া আক্রমণ করা কর্ত্তব্য কিনা?

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর অধিকাংশ কর্ম্মচারি শেষোক্ত প্রস্তাবই সমর্থন করিল। কেবল মাত্র ৭ জন সদস্য, সদ্য আক্রমণের পক্ষে ভোট দিল।

এই মন্তব্য কিন্তু ক্লাইভের মনঃপুত হইল না। তিনি একটী জঙ্গলের মধ্যে গিয়া, তথায় নির্জ্জনে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তার পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া মহাবীর ক্লাইভ, স্বীয় সৈন্য মধ্যে ভাগীরথী পার হইবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

২২শে জুন প্রাতঃকাল হইতে বৈকাল ৪টার মধ্যে সমস্ত ইংরাজ সেনা

কামান আদি সহ, ভাগীরথীর পর পারে গিয়া পৌছিল। এই সময় আর একজন দূত নওয়াব সেনাধ্যক্ষের নিকট হইতে কর্ণেল ক্লাইভের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অবগত করিল যে—নওয়াব মুন্‌কেরায় (কাসেম বাজার হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে) অবস্থান করিতেছেন, এবং মীর জাফরের ইচ্ছা যে, ইংরাজগণ নওয়াব সেনা প্রদক্ষিণ করিয়া, পশ্চাৎ দিক হইতে ঐ স্থানেই তাহাদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করেন।

ক্লাইভ ঐ দূত হস্তেই এই মর্ম্মে পত্র দিলেন যে—"সত্বর তিনি পলাশীতে উপস্থিত হইতেছেন। পরদিন প্রাতেঃ তিনি সসৈন্যে দাউদপুরে যাইবেন ও তথায় মীর জাফরের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, তিনি নওয়াবের সহিত সন্ধি করিবেন।"

রাত্রি একটার সময় ইংরাজগণ পলাশীর বিখ্যাত আম্র কাননে উপনীত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই লক্ষাবাগের আম্র কানন লম্বায় ৮০০ শত গজ ও প্রস্থে তিন শত গজ ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে অনুতিউচ্চ মৃত্তিকা নির্ম্মিত বাঁধ ও তৎপার্শ্বে পগার খাত।

এইস্থানে উপস্থিত হইয়া ইংরাজগণ, নওয়াব শিবিরের ভেরী বাদন শ্রবণে বুঝিতে পারিল যে—বাঙ্গালার সেনাগণ মুন্‌কেরায় অবস্থানের পরিবর্ত্তে তাহাদের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ক্লাইভের অধীনে ৮০০ শত ব্রিটিশ পদাতিক ১০০ শত গোলন্দাজ ৫০ জন নাবিক সেনা ১০০ শত পর্ত্তুগীজ ও ২১০০ শত সিপাই মাত্র ছিল। এবং আসিবার কালে তাহারা ৮টী ছোট ও দুইটী বৃহৎ কামান সঙ্গে আনিয়াছিল। অপরিণামদর্শী নওয়াব শত্রু-মিত্র বিবেচনা না করিয়া, বা চতুর্দ্দিকে শত্রু বেষ্টিত হইয়া থাকায়, বিবেচনা করিবার অবসর না পাইয়া ৫৪টী কামানসহ ১৮,০০০ সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ও ৫০,০০০ সহস্র পদাতিক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

১১৭০ হিজরীর ৫ই সওয়াল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ সে জুন বৃহস্পতিবার বেলা ৮টার সময় উভয় পক্ষের কামানের শব্দ শ্রুত হইল। এই সময় হঠাৎ এক পশ্‌লা খুব জোর বৃষ্টি হওয়ায়, নওয়াবের বারুদ ভিজিয়া গিয়া, ক্রমে তাহাদের কামানের গর্জ্জন ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মীর জাফরের নিকট হইতে কোন দূত আসিয়া না পৌঁছানয়, ক্লাইভ বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি আমীর বেগকে ডাকিয়া তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মীর জাফরের গুপ্তচর এই সময় কর্ণেল ক্লাইভকে এইরূপ বাক্য দ্বারা অভয় দিল যে—

"যাহারা যুদ্ধ করিতেছে তাহারা মীর মদন ও মোহনলালের অধীনস্থ সেনা মাত্র ও উহারা সংখ্যায় অতিঅল্প। এই কয়েকজন সেনা বধ করিতে পারিলেই, তাহার প্রভু প্রধান সেনাপতি মীর মোহাম্মদ জাফর খান; নিশ্চয় কর্ণেলের সহিত আসিয়া যোগ দিবেন।"

নওয়াব এতক্ষণ ধরিয়া শিবিরে বসিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যুদ্ধের পরিচয় লইতেছিলেন। হঠাৎ দুই প্রহরের সময় একটী কামানের গোলা লাগিয়া, নওয়াব সেনাদলের মধ্যে অমিততেজাঃ অসমসাহসিক বীরভদ্র সেনাপতি মীর মদন, সাঙ্ঘাতিক আহত হইয়া আসন্ন মৃত্যু অবস্থায় নওয়াব সমীপে আনিত হইলেন ও অত্যল্পকাল মধ্যে মাত্র দুই একটী উপদেশমূলক কথা বলিতে থাকা কালে, মীর মদনের পবিত্র প্রাণ-বায়ু তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিল।

একমাত্র আশা ভরসার স্থল মীর মদনীর মৃত্যুতে নওয়াব অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। এবং কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন মীর জাফরকে ডাকিয়া, তাহার নিকট এই বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার স্বাধীন নওয়াব ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও এই মহা বিপদের সময় তাহার আন্তরিক সাহায্য ও উপদেশ চাহিলেন।

ইতিপূর্ব্বে স্বদেশদ্রোহী বিদ্রোহনায়ক পাপিষ্ঠ মীর জাফর ও তাহার অধীনস্থ প্রধান প্রধান বিশ্বাসঘাতক সেনানায়কগণ, আপন আপন সৈন্যসহ রণস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, যুদ্ধের পরিবর্ত্তে "রণপয়োধির লহরী গণনা" করিতেছিল; এবং তৎসঙ্গে কখনও উৎসাহিত ও পরক্ষণেই নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ হইতেছিল। মীর মদনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগা বঙ্গেশ্বর পাষণ্ড-প্রধান মীর জাফরকে ডাকিয়া তাহার পরামর্শ চাহায়, উহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

শঠ-কুল-চূড়ামণি প্রতিহিংসা পরায়ণ মোহাম্মদ জাফর, সর্ব্বতোভাবে বঙ্গেশ্বরের উপকার করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল; তৎসঙ্গে স্বীয় শঠতার জাল-বিস্তার করিয়া বিপন্ন নওয়াবকে সর্ব্বনাশী উপদেশ দিল যে—"আজ প্রাতঃকাল হইতে যুদ্ধ করিয়া আপনার সেনাগণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, অতএব আজিকার মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার অনুমতি দিন, আগামী কাল পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিয়া, পলাশী ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ইংরাজ সেনার চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিব না।"

নওয়াব সেরাজউদ্দৌলা তখন অনন্যোপায় হইয়া, যুদ্ধ-নিরত বঙ্গীয় সেনাগণকে বিরত হইবার আজ্ঞা দিলেন।

সেরাজ, তাঁহার দেওয়ান মোহন লালকে যুদ্ধে স্থগিত হইতে অনুমতি দেওয়ায়, রাজা মোহন লাল প্রথমতঃ বিনম্র-দৃঢ়-স্বরে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন; এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে—এ সময় হঠাৎ যুদ্ধ স্থগিত করিলে নওয়াবের সমুদয় সৈন্য সমূহ বিপদে পতিত হইবে। শেষে নওয়াবের অনুমতির সহিত প্রধান সেনাপতি পাপাত্মা মীর জাফরের বারংবার প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুরোধে বীর-বর দেওয়ান মোহন লাল, সম্পূর্ণ অনিচ্ছার সহিত বেলা দুইটার সময় যুদ্ধভূমি করিয়া পরিত্যাগ শিবিরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

মোহন লালের রণস্থল পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে, সেনাগণের মধ্যে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল ও করাল বদনা পরাজয় রাক্ষসী বিকট দশন বিকাশে বঙ্গেশ্বরের সেনাগণকে গ্রাস করিল।

কপটাচার-পরায়ণ দুষ্টাত্মা মীর জাফর, নওয়াবের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া কর্ণেল ক্লাইভকে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে নওয়াব শিবির আক্রমণের পরামর্শ দিয়া, একখানি পত্র লিখিয়াছিল। কিন্তু পত্রবাহক এই দুরন্ত গুলি বৃষ্টির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে অসমর্থ হওয়ায়, পত্রখানি ক্লাইভের হস্তে পড়ে নাই।

নওয়াব যুদ্ধের অবস্থা দর্শনে ও চতুর্দ্দিকে গৃহ শত্রু বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন বুঝিয়া, অনন্যোপায় হইয়া দুই সহস্র অশ্বারোহী সহ উষ্ট্র আরোহণে রাজধানীর দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পর দিবস ৬ই শওয়াল প্রাতে নওয়াব প্রাসাদে গিয়া পৌছিলেন।

সেরাজের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী এক্ষণে তাঁহার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল। তাঁহার অনুচরবর্গ এই সময় সকলেই একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। ৭ই শওয়াল তারিখের রাত্রে সেরাজ, তাঁহার স্ত্রী লোৎফন্নেসা এবং তাঁহাদের অল্প বয়স্কা কন্যা সমভিব্যাহারে, প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ মুদ্রা ও রত্নাদি লইয়া, মনসুরগঞ্জ পরিত্যাগে গো-যান আরোহণে ভগবান-গোলার দিকে যাত্রা করিলেন। পথে চৌকি হাটায় মীর জাফরের জামাতা মীর কাসেমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বঙ্গেশ্বর এই সময় মীর কাসেমকে স্বীয় স্ত্রীর গহনা পরিপূর্ণ একটী বাক্স দানে সন্তুষ্ট করিয়া, নৌকারোহণে পাটনার দিকে যাইবার ইচ্ছায় রওয়ানা হইলেন।

রাজমহলে পৌছিয়া নওয়াব ও তাঁহার মহিষী অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়ায়, তাঁহারা জনৈক ভণ্ড তপস্বী দানা সাহের আশ্রমে কিছুক্ষণ বিশ্রামের ও আহার কার্য্য সমাপনের জন্য আশ্রয় লইলেন। কিন্তু দুষ্টমতি ভণ্ড

দানা সাহ্ লোভের বশীভূত হইয়া বঙ্গেশ্বর দুর্ভাগা সেরাজউদ্দৌলাকে ধরাইয়া দিল।

১১৭০ হিজরীর ১৫ই শওয়াল তারিখে বাঙ্গালা-বেহার-উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি, প্রবল পরাক্রমশালী সুবাদার, নওয়াব সুজাউল্‌মুল্‌ক হেশাম-দ্দৌলা মোহাম্মদ আলিওয়ার্দ্দী খান মোহাব্বৎ জঙ্গের আদরের দৌহিত্র ও বিশাল রাজ্যের উত্তরাধিকারী, নওয়াব মনসুরলমুল্‌ক্ সেরাজউদ্দৌলা সাহ্ কুলি খান মির্জ্জা মাহ্‌মুদ হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর, রাজ-বিদ্রোহীর ন্যায় বন্দি অবস্থায় তাঁহার নিজ রাজধানীতে, তাঁহারই সেনাধ্যক্ষ মীর জাফরের গৃহে আনীত হইলেন।

সেনাপতি যোদ্ধকুল-কলঙ্ক মীর জাফর খান ঐ সময় গৃহে না থাকায়, তাহার নরাধম পাষণ্ড পুত্র মীরণ, নওয়াবকে লইয়া কারাগারে নিঃক্ষেপ করিল ও বঙ্গেশ্বরের প্রাণনাশ করিবার জন্য অধীনস্থ সকলকেই অর্থের লোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল। জাফর বা মীরণের কর্ম্মচারীগণের মধ্যে কেহই এই পাশবিক হত্যাকার্য্যে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে মৃত নওয়াব আলিওয়ার্দ্দী খানের অন্নে প্রতিপালিত জনৈক পাষণ্ড নিষ্ঠুর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অর্থ পিশাচ মোহাম্মদ বেগ, অর্থের লোভে এই নৃশংস কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইল।

অভাগা নওয়াব কারারুদ্ধ হইবার ৩৪ ঘণ্টা পরেই নরপিশাচ মোহাম্মদী বেগ, উন্মুক্ত তরবারিহস্তে কারামধ্যে প্রবেশ করিয়া, বঙ্গেশ্বরের নিকট আগমন করিল। সেরাজ তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, পরে কহিলেন—

"তুমি কি আমার প্রাণবধ করিতে আসিয়াছ? কেন! তাহারা কি আমাকে কিঞ্চিৎ বৃত্তি দিয়া এই বিশাল বঙ্গদেশের এক নিভৃত প্রান্তেও একটু স্থান দিলে না?"

পরে আবার নিজেই বলিতে লাগিলেন—

"না, তাহা হইতে পারে না! হোসায়েন কুলি খানের হত্যার প্রতিশোধ এই রকমেই আমার উপর দিয়া হইবে! আমাকে মরিতে হইবে!"

এই সময় পাষণ্ড ঘাতকের নির্ম্মম তরবারি প্রচণ্ড বেগে নওয়াবের মস্তকে নিপতিত হইল। নরাধম শয়তান মোহাম্মদীবেগ ঐ ভুবন মোহন সুচারু মুখশ্রীর উপরও কয়েকবার তরবারির আঘাত করিল। সেরাজ— "আর না, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে। হোসায়েন কুলির প্রতিশোধ আজ উঠিল," বলিতে বলিতে মেজের উপর লুটিয়া পড়িলেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। ভাগীরথীর পরপারে খোশবাগে, মাতামহের সমাধি মন্দিরের পার্শ্বে অভাগা সেরাজের নশ্বর দেহ চির-বিশ্রামের জন্য সমাধিস্থ করা হইল। মাত্র এক বৎসর দুই মাস কাল সিংহাসনারোহণের মধ্যে বিংশতি বর্ষ বয়সে নওয়াব সেরাজউদ্দৌলা ঘাতক হস্তে নিহত হইলেন।

দুর্বৃত্ত মীরণ তৎপরে ২।৩ বৎসরের মধ্যে নওয়াবের আত্মীয় বন্ধু ও পরিবারবর্গের মধ্যে পুরুষ স্ত্রী নির্ব্বিশেষে বহু সংখ্যক লোকের প্রাণনাশ করিল। শেষে সেরাজ-মাতা আমেনা বেগম ও আলিওয়ার্দ্দী খানের অপর কন্যা সেরাজদ্রোহী ঘেসেটী বেগমকে ধৃত করিয়া, নৌকাযোগে নদীর মধ্যস্থলে লইয়া গিয়া উভয় ভগ্নীকে ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করায়, পবিত্রচেতা আমেনা বেগম, অজু করিয়া পূতবস্ত্র পরিধানে পরম করুণা নিদান আল্লাহতাআলার নিকট, নিষ্ঠুর মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যুর কামনা করিলেন।

জগৎপিতা এই নিরাশ্রয়া আলিওয়ার্দ্দী দুহিতার কাতর প্রার্থনা যেন তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ১১৭৩ হিঃ ১৯

জিল্‌কদ বৃহস্পতিবার রাত্রে সামান্য বৃষ্টি হইতে থাকা কালে, নীলাকাশপট হইতে অশনিপাতে দুরাত্মা মীরণের পাপময় জীবন শেষ হইয়া গেল।

বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর, একমাত্র পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুতে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িল। (জমিয়াতড্‌ তওয়ারীখ)

স্বাধীন বঙ্গের পতন

শেষ

গ্রন্থকর্ত্রীর লেখা এই ক'খানা বই, গ্রন্থাবলী আকারে একত্রে মাত্র ১৸৹ এক টাকা বার আনা।

"নূরন্নেছা গ্রন্থাবলী"

১। স্বপ্নদ্রষ্টা

২। জানকী বাই বা ভারতে মোসলেম বীরত্ব

৩। আত্মদান

৪। ভাগ্যচক্র

৫। বিধিলিপি

৬। নিয়তি

৭। (কন্যার লেখা) গাঙ্গুলী ম'শায়ের সংসার।